ISSN: 2790-2668

গ্রাফিক ডিজাইন জার্নাল

GRAPHIC DESIGN JOURNAL

বর্ষ ০২ সংখ্যা ০১ ডিসেম্বর ২০২২
Year 02 Issue 01 December 2022

গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ ▪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রাফিক ডিজাইন জার্নাল

Graphic Design Journal

গ্রাফিক ডিজাইন জার্নাল

বর্ষ ০২ . সংখ্যা ০১ . ডিসেম্বর ২০২২
Year 02. Issue 01. December 2022

সম্পাদক
মোঃ মাকসুদুর রহমান

গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রাফিক ডিজাইন জার্নাল
২ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
প্রকাশকাল : ২৯ ডিসেম্বর ২০২২

সম্পাদক
মো: মাকসুদুর রহমান

প্রকাশক
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক
ইছামতি প্রিন্টার্স
৮৯/৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

প্রচ্ছদ : মো: মাকসুদুর রহমান
পেজ মেক আপ : মীর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মামুন আলী

মূল্য : ৩৫০ টাকা
USD : 15.00

ISSN : 2790-2668

Graphic Design Journal edited by Md. Maksudur Rahman. Published by Department of Graphic Design, Faculty of Fine Art, University of Dhaka Dhaka-1000, Bangladesh Ph: PABX No 9661920-73 Extn. 8588, 8589 Email: graphicdesign@du.ac.bd

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক

মোঃ মাকসুদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

মোঃ ইসরাফিল প্রাং
চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. ভদ্রেশু রীটা
সহযোগী অধ্যাপক
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সীমা ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Editorial Committee

Editor

Md. Maksudur Rahman
Associate Professor
Department of Graphic Design
University of Dhaka

Members

Md. Israfil Pk.
Chairman & Associate Professor
Department of Graphic Design
University of Dhaka

Dr. Vadreshu Rita
Associate Professor
Department of Graphic Design
University of Dhaka

Dr. Sima Islam
Associate Professor
Department of Graphic Design
University of Dhaka

এ জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কোনো তথ্য, অভিমত বা মন্তব্যের জন্য সম্পাদনা পরিষদ দায়ী নয়। এ-সংক্রান্ত যাবতীয় দায়দায়িত্ব একান্তই লেখকের।

সূচি

স্বাধীনতার পূর্বাপর বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনী সংস্থা (১৯৪৮-১৯৯৯)
অধ্যাপক ড. সুভাষ চন্দ্র সুতার ০১

গ্রাফিক ডিজাইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্র প্রসঙ্গ লোগো ডিজাইন ও ব্র্যান্ড আইডেনটিটি
রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম ২২

গ্রাফিক ডিজাইনে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে গ্র্যাজুয়েটদের কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনা
মোঃ ইসরাফিল প্রাং ৫৩

স্টেনসিলের নকশা চর্চা
মোঃ আব্দুল মোমেন ৭৬

বাংলাদেশের শিল্পকলায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা
মোঃ আব্দুল আযীয ৯৬

কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলায় ডিজাইনের নানাবিধ অনুষঙ্গ
আব্দুস সাত্তার ১১০

শিল্পী মন্দ্রিয়ানের চিত্রকর্মে বিমূর্ততা : জ্যামিতিক নকশার রূপান্তর
সাবরিনা শাহনাজ ১২৩

বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের চিত্রের বিষয়বৈচিত্র্য, মাধ্যম, উপকরণ ও শৈলী
নিফাত সুলতানা ১৫১

হাতপাখার নকশা উপকরণ, করণকৌশল ও আঞ্চলিক ভিন্নতা
মোসাঃ তাসলিমা বেগম ১৬৯

বাংলাদেশের শোলাশিল্প : নকশা ও ঐতিহ্য সন্ধান
জাকিয়া আহমেদ ঝুমা ১৮৪

Prospects and Challenges of Offset Printing Industry from the Viewpoint of Graphic Designers in Bangladesh
Mohammad Ferdous Khan Shawon ২০৪

স্বাধীনতার পূর্বাপর বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনী সংস্থা (১৯৪৮-১৯৯৯)

অধ্যাপক ড. সুভাষ চন্দ্র সুতার*

সারসংক্ষেপ : *বিজ্ঞাপনের ইতিহাস অনেক পুরোনো। মেসোপটেমিয়া সভ্যতা এর সূতিকাগার বলে ধরে নেওয়া যায়। সময়ের বিবর্তনে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ধরন পালটেছে। কিন্তু উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত থেকেছে। যখন থেকে মানুষ নিজের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেছে, তখন থেকেই সে অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারস্থ হয়েছে বা বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম খুঁজে বেড়িয়েছে। প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুসারে এক পর্যায়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে প্রচার শুরু হয়। এক সময়ে গ্রামগঞ্জের হাটবাজারে এধরনের প্রচার/বিজ্ঞাপন দিতে দেখা যেত এবং এধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য ঐ হাটে বা বাজারে ঐ ব্যক্তিকেই খুঁজতে হতো যে চিৎকার করে বলতে পারে এবং কিছু পয়সার বিনিময়ে এই কাজটি আগ্রহের সাথে করবে।*

ছাপা পদ্ধতি আবিষ্কারের পর থেকে প্রচারের জন্য মুদ্রণশিল্পের ব্যবহার শুরু হয় এবং কোনো বিষয় ছাপাতে হলে যে ব্যক্তি ছাপা পদ্ধতি সম্পর্কে জানে বা ছাপাখানা আছে তার শরণাপন্ন হতে হয়। এক সময়ে ছাপা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তবে ১৭৮৬ সালের দিকে অফিস নিয়ে বিজ্ঞাপনী সংস্থা খুলে ব্যবসা শুরু করেন ২০ বছর বয়সের ছেলে উইলিয়াম টেলর (William Taylor)। ইংল্যান্ডের অধিবাসী এই টেলর ও তার বাবা মিলে এই ব্যবসা পরিচালনা করেন। ১৮৫০ সালে এই আইডিয়া অ্যামেরিকাতে নিয়ে যান ভলিনি বি. পালমার (Volney B. Palmer)[১]। বলা যায় এখান থেকেই বিজ্ঞাপনী সংস্থার আইডিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, যা বর্তমান সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। অত্র গবেষণাপত্রে স্বাধীনতার পূর্বাপর বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের বিজ্ঞাপনী সংস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

*প্রফেসর, গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] *http://parlateam.com/history-of-advertising-agencies/*, তারিখ: ১৪ই মার্চ ২০২১।

বিষয়-বিবরণ

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হলে পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত কোনো বিজ্ঞাপনী সংস্থা থেকে ডিজাইন করা কোনো বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হতো না। কারণ হিসেবে বলা যায় পূর্ব বাংলায় '৪৭-পরবর্তী সময়ে কোনো বিজ্ঞাপনী সংস্থা ছিল না। যা ছিল সব পশ্চিম পাকিস্তানে এবং বিজ্ঞাপন ছাপার জন্য কারিগরি বিষয়াদির জন্য নির্ভর করতে হতো কোলকাতার উপর। ফলে পূর্ব বাংলার ছাপাখানার উন্নতির জন্য বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া শিল্প-কলকারখানা অধিকাংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, যে কারণে বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। তবে পূর্ব বাংলা তথা ঢাকার ইতিহাসে প্রথম বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম 'গ্রীনওয়েজ পাবলিসিটি'। ১৯৪৮ সালে গুলাম মহিউদ্দিন এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৮ সালে এই এজেন্সির বিজ্ঞাপন দেখা যায় আজাদ পত্রিকায়। প্রথম দিকের পত্রিকার বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম থাকত না, যদিও থাকে তা ছিল সাংকেতিক বা সংক্ষেপে। যে কারণে বিজ্ঞাপনচিত্রের নিচের সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে গ্রীনওয়েজের নাম পাওয়া যায় না।

১৯৪৯ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন

গ্রীনওয়েজ পাবলিসিটির প্রতিষ্ঠাতা গুলাম মহিউদ্দিন ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'চ্যাম্পিয়ন নিয়ন সাইন'। এ ছাড়া ১৯৫৪ মতান্তরে ৫৫ সালে সালাম কবির প্রতিষ্ঠা করেন 'ইস্টল্যান্ড অ্যাডভারটাইজিং কোম্পানি'। ইস্টল্যান্ড অ্যাডভারটাইজিং

কোম্পানি তখন অল পাকিস্তান নিউজপেপার সোসাইটি এবং বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের সদস্য ছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালের দিকে যাত্রা শুরু করে 'কোহিনূর' নামের একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা। ষাটের দশকের শুরুতে মরহুম শরফুদ্দিন আহমেদ, শের আলী রামজি ও ইফতেখারুল আলম একত্র হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'স্টার অ্যাডভারটাইজিং'[২]। এ সময় 'লিভার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভারটাইজিং সার্ভিস', 'ডি জে কীমার'ও এ দেশে তাদের যাত্রা শুরু করে। কোলকাতার বিজ্ঞাপনী সংস্থা ডি জে কীমার (D J KEYMER) ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা, যে সংস্থায় ও সি গাঙ্গুলী ও সত্যজিৎ রায়ের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ডিজাইনার হিসেবে চাকুরি করেছেন। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে যেহেতু বিজ্ঞাপনী সংস্থা সে রকম ছিল না ফলে কোলকাতার অনেক নামীদামী বিজ্ঞাপনী সংস্থা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের শাখা অফিস চালু এবং তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ব্রিটিশদের প্রতিষ্ঠিত 'স্ট্রোনাক অ্যাডভারটাইজিং'-এর চেয়ার-টেবিল ক্রয় করে ১৯৪১ সালে যুধাজিৎ চক্রবর্তী ও বারীন ঘোষ মিলে 'সার্ভিস অ্যাডভারটাইজিং' প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ এই সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্য জনতার আন্দোলন-সংগ্রাম দিন দিন বেড়ে চলছিল এবং দেশের মধ্যে অস্থির অবস্থা বিরাজ করছিল বিধায় স্ট্রোনাক অ্যাডভারটাইজিং সংস্থার মালিক এটি বন্ধ করে দেন। যদিও এই সংস্থাটির নামে পরবর্তী সময়ে অনেক বিজ্ঞাপন ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে মরহুম শরফুদ্দিন আহমেদ চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'নবাঙ্কুর অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড' (NABANKUR)। নবাঙ্কুর অ্যাডভারটাইজিং সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন দেখা যায় ১৯৬৭ সালে আজাদ পত্রিকায় এবং এর পূর্বে কোনো বিজ্ঞাপন দেখা যায় না।

পাকিস্তানের করাচিভিত্তিক বিজ্ঞাপনী সংস্থা 'এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড' পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় 'ইস্ট এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড'

---

[২] *https://www.facebook.com/smritiadvertising/posts/614334098700892/ Date 24 june 2022*

নামে তাদের শাখা অফিস চালু করে ১৯৬৬ সালের ১৫ই মার্চ। এনায়েত করিম ১৯৬৬ সালে লন্ডন থেকে মার্কেটিং ও সেলস্ প্রোমোশনের উপর ডিপ্লোমা করে আসেন এবং এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সির শাখা অফিস ইস্ট এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিতে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৮ সালে দেশে অস্থির অবস্থা বিরাজ করলে হেড অফিস থেকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং অফিস খরচ ও কর্মচারীদের বেতনভাতা কীভাবে পরিশোধ করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন। এরকম একটি সময়ে তাদের ক্লায়েন্ট ও বন্ধুবর মি. লুৎফর রহমান মিলে 'ইন্টারস্প্যান'(INTERSPAN) নামে একটি অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে অংশীদারিত্ব পৃথক হলে এনায়েত করিম প্রতিষ্ঠা করনে 'ইন্টারস্পিড' (Interspeed)।

১৯৬৯ সালে সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইস্ট এশিয়াটিক'-এর ডিজাইনে পিপলস্ জুট মিলস্ লিমিটেডের বিজ্ঞাপন এবং ১৯৪৯ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি বিজ্ঞাপন

'ইস্ট এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড' এজেন্সিতে ইংরেজি কপিরাইটার হিসেবে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আলী যাকের চাকুরিতে যোগদান করেন। নানা ধরনের সংকটের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান চালু থাকলেও যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইস্ট এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড সরকার অধিগ্রহণ করে। ১৯৭২ সালে অলী যাকের এই সংস্থাটি ক্রয় করেন এবং এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নেন। প্রতিষ্ঠানটিকে আরও গতিশীল করতে ১৯৮১ সালে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর এই সংস্থায় যোগ দেন।

সংস্থাটি ১৯৯৪ সালে 'ইস্ট এশিয়াটিক' থেকে নাম পরিবর্তন করে 'এশিয়াটিক মার্কেটিং কমিউনিকেশনস লিমিটেড' নামে নতুন করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে এবং ১৯৯৯ সালে 'জে ওয়াল্টার থম্পসন', যা পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোর অন্যতম, তার সাথে যুক্ত হয়ে কর্মপরিধি বিস্তৃত করে। এক বছরের মধ্যে এটি কৌশলগত পরিকল্পনা বিভাগের প্রথম সংস্থা হয়ে ওঠে, যা জে ওয়াল্টার থম্পসনের সাথে যুক্ত হয়ে শুরু করেছিল।[৩]

পূর্ব পকিস্তানের ইস্ট এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড প্রতিষ্ঠার দুই বছর পরে ১৯৬৮ সালে রেজা আলী প্রতিষ্ঠা করেন 'বিটপী'। ১৯৬৮ সালের প্রকাশিত ইত্তেফাক পত্রিকায় বিটপীর বিজ্ঞাপন দেখা যায়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশি উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়তে থাকে। পাকিস্তানের বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো তাদের বাক্সপ্যাটরা গুটিয়ে দেশে চলে যায়। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারও পাকিস্তানের কিছু বিজ্ঞাপনী সংস্থা অধিগ্রহণ করে। এর মধ্যে 'এশিয়াটিক' ও 'কোহিনূর' নামের বিজ্ঞাপনী সংস্থা উল্লেখযোগ্য।[৪]

পঞ্চাশের দশকে যে সব বিজ্ঞাপনী সংস্থার বিজ্ঞাপন তৎকালীন দৈনিক পত্রিকায় দেখা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো হলো ইউনাইটেড (UNITED), খায়েরী (KHAIRI), কন্টাক্ট (KONTAKTS), চাবুক পাবলিসিটি, গ্রান্ড অ্যাডভারটাইজারস, কিসমাত (KISMAT), অ্যাডআর্টস (ADARTS), ক্রিসেন্ট (CRESCENT), ম্যাহাটন (MANHATTN), ওয়াইডআর্টস (WIDEARTS), অ্যাডওয়াটস (ADWATS), অ্যাডওয়েজ (ADWAYS), হ্যারল্ড (HERALD), এলকো (ELACO), স্পটলাইট (SPOTLIT), কামার্ট (KAMART), কোহিনূর (KOHINOOR) ইত্যাদি।

---

[৩] *https://en.everybodywiki.com/Asiatic_Marketing_Communication_Limited. 24-06-22.*
[৪] *kalerkantho.com/print-edition/biggaponbiroti/2015/04/10/208706*

পঞ্চাশের দশকের কয়েকটি বিজ্ঞাপন–

১৯৫০, ১৯৫১ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন, ১৯৫২ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'UNITED' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা ও ও ১৯৫৩ সালে পার্কার কলমের বিজ্ঞাপন

আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯৫৪ সালে 'KONTAKTS' ও ১৯৫৫ সালে 'ADART' ও ১৯৫৫ সালে 'EVERGREEN' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৫৬ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Crescent' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৫৬ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Harald' ও 'Widearts' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৫৭ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম দুটি বিজ্ঞাপন, ১৯৫৮ সালে 'GREENWAYS' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৫৮ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Evergreen' ও 'Elco' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৫৯ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Kohinoor' এবং'Spotlit' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

ষাটের দশকের পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে যেসব বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–'মার্শাল' (MARSHAL), 'প্রেস্টিজ' (PRESTIGE), 'ন্যাশনাল' (NATIONAL), 'আজিজ পাবলিসিটি' (AZIZ PUBLICITY), 'ক্যারাট' (KARAT), 'CRAWFORDS', 'লাইমলাইট' (LIMELIGHT), 'স্টার' (STAR), 'মাকফা' (MAKFA), 'প্রোগ্রেসিভ' (PROGRESSIVE), 'ইস্ট এশিয়াটিক' (EAST ASIATIC), 'বিটপী' (BITOPI) 'অ্যাডভারটাইজিং করপোরেশন' (ADVERTISING CORPORATION), 'নিমা' (NIMA), 'ইউরেকা', 'ওরিয়েন্ট' (ORIENT), 'পাবলিকো' (PUBLICO), 'অ্যাডগ্রুপ' (ADGROUP), 'যুগান্তর' (JUGANTAR), 'নর্থ বেঙ্গল পাবলিসিটি' (NORTH BENGAL PUBLICITY), 'লিনটাস' (LINTAS), 'প্রান্তিক' (PRANTIK), 'ইন্টারস্প্যান' ইত্যাদি।

ষাটের দশকের কয়েকটি বিজ্ঞাপন–

১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'United' এবং 'Aziz Publicity' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Karat' এবং 'Cawfords' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৬৩ সালে ইত্তেফাক ও ১৯৬৪ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'National' ও 'Keymar' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৬৩ সালে ইত্তেফাক 'Asiatic' ও 'Kontakts' বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং ১৯৬৪ সালে 'Elco'র ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়

১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Star' এবং 'Asvtg. Corpn' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Adgroup' এবং 'Nobankur' বিজ্ঞাপনী সংস্থা ও ১৯৬৯ সালে সংবাদ পত্রিকায় 'বিটপী'র ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৬৯ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Interspan' এবং 'North Bengal Publicity' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা ডিজাইন

১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের কয়েকটি বিজ্ঞাপন–

১৯৭০ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় একুশে ফেব্রুয়ারিতে 'Interspan' আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Bond' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৬৮ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'Bitopi'-এর ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন ১৯৭১ সালে সংবাদ পত্রিকায় একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত 'East Asiatic'-এর ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৭০ ও ১৯৭১ সালে প্রকাশিত পত্রিকায় বেশ কয়েকটি নতুন বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম দেখা যায় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-পূর্বাশা (PURBASHA), বন্ড (BOND), ইস্টল্যান্ড (EASTLAND), অ্যাডকো (ADKO), ওসকার (OSKER) ইত্যাদি। এই অ্যাড এজেন্সিগুলোর অধিকাংশ ছিল পাকিস্তান ও কোলকাতাভিত্তিক বিজ্ঞাপনী সংস্থা। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এসব বিজ্ঞাপনী সংস্থা তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে যার যার দেশে চলে যায়। কয়েকটি বিজ্ঞাপনী এজেন্সি বাংলাদেশিদের কাছে হস্তান্তর করে বা বিক্রি করে দেয়। এবং তারা নতুন করে তাদের কার্যক্রম শুরু করে, আবার কিছু কিছু সংস্থা নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনী সংস্থা

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলে পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত এদেশের মালিকানাধীন বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো নতুন করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন, এর মধ্যে–ইস্ট এশিয়াটিক, ইন্টারস্প্যান অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড, বিটপী, ইস্টল্যান্ড, ক্রিসেন্ট ইত্যাদি এবং স্বাধীনতার পর নতুন নতুন কিছু সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নতুন উদ্যমে কাজ করতে থাকে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মফস্বল শহর ফেনীতে ১৯৬৪ সালে এম. এ. মোস্তফা হোসেন ও তার তিনজন সহযোগী মিলে প্রথম বিজ্ঞাপনী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যার নাম ছিল 'দেশ অ্যাডভারটাইজিং'। প্রথম বলার কারণ মফস্বল শহরে মুদ্রণশিল্পের কারিগরি বিষয়াদি থাকলেও বিজ্ঞাপনের জন্য কোনো অফিস ছিল না, এটিই প্রথম। ১৯৬৬ সালে ব্যবসার কলেবর বৃদ্ধির জন্য দেশ অ্যাডভারটাইজিং-এর অফিস চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করেন। এর দুই বছর পর ১৯৬৮ সালে এর একটি শাখা অফিস ঢাকায় চালু করে এবং চট্টগ্রামের সাথে সংযোগ রক্ষা করে কার্য পরিচালনা করে। 'দেশ অ্যাডভারটাইজিং'-এর কর্ণধার জনাব এম. এ. মোস্তফা হোসেন ১৯৬৮ সালে ইস্টল্যান্ড অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেডের চট্টগ্রামের শাখা প্রধান হিসেবে যোগ দেন। কিছুদিন এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে চাকুরি ছেড়ে আবার নিজের পুরোনো দেশ অ্যাডভারটাইজিংয়ের ঢাকার অফিস গোছাতে শুরু করেন। সে সময়ে নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে না পেরে তা বাদ দিয়ে ১৯৭১

সালের ২৮শে ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত 'বর্ণালী অ্যাডভারটাইজার্স'-এ ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেন। এর এক বছরের মাথায় এই অফিসও ছেড়ে দেন এবং জনাব এম. এ. মোস্তফা হোসেন 'এলিট অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেড'-এ যোগদান করেন। ইস্টল্যান্ড তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায় এবং সত্তর ও আশির দশকে ইস্টল্যান্ড ভালো অবস্থানে ছিল। ইষ্টল্যান্ডের অসংখ্য বিজ্ঞাপন দেখা যায় তখনকার পত্রিকার পাতায় পাতায়।

'এলিট অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে ২৬শে নভেম্বর। এলিট কেমিক্যাল ও এলিট ইন্টারন্যাশনালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব সিরাজুদ্দিন আহম্মদ হলেন চেয়ারম্যান, প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন এম. এ. মোস্তফা হোসেন এবং অন্য দুজন ডিরেক্টর হলেন মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ও রমজুল সিরাজ।[৫] শুরু থেকেই 'এলিট অ্যাডভারটাইজার্স' সাহসিকতার সাথে ডিজাইন করে এবং চমক লাগানোর চেষ্টা করে। বলা যায় এই চেষ্টায় তারা সফল হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির ডিজাইনে নতুনত্ব ছিল এবং ভালো অবস্থানে ছিল। ২৬শে নভেম্বর ১৯৭৩ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় এলিটের শুভযাত্রা উপলক্ষ্যে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। সাড়ম্বরে এই যাত্রা এলিটকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে।

১৯৭০ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইস্টল্যান্ড অ্যাডভারটাইজার্স'-এর ডিজাইনে 'দি ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক'-এর বিজ্ঞাপন।

১৯৭৩ সালের বিজয় দিবসে ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত 'এলিট অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেড'-এর ডিজাইনে 'আর আর জুট মিলস্ লি.'-এর একটি বিজ্ঞাপন।

[৫]দৈনিক ইত্তেফাকের ক্রোড়পত্র, এলিট অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেডের বর্ষপূর্তি, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৭৪।

'এলিট অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেড' শুরু থেকে নিত্যনতুন নান্দনিক ডিজাইন উপহার দিয়েছে। এবং প্রতিদিনই পত্রিকার পাতায় এলিটের ডিজাইনকৃত বিজ্ঞাপন ছাপা হতো।

১৯৭৩ সালে 'ইন্টারস্প্যান অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড' দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় সংস্থার পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। এবং এই ক্রোড়পত্র প্রকাশ ছিল কোনো অ্যাড এজেন্সির তৃতীয় উদ্যোগ, এর পূর্বে 'নবারুণ অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেড' ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৩ ইত্তেফাক পত্রিকায়। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে যে কয়টি বিজ্ঞাপনী সংস্থা ছিল সেগুলোর মধ্যে ইন্টারস্প্যানের অবস্থান ভালো ছিল এবং বিজ্ঞাপনচিত্রের ডিজাইনের মধ্যে সৃজনশীলতাও ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৯৬৮ সালে যাত্রা শুরু করে ১৯৬৯ সালে লিমিডেট কোম্পানি হিসেবে রেজিস্ট্রেশন এবং নতুন করে 'ইন্টারস্প্যান লিমিটেড' হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা আরম্ভ করে। প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীকালে পৃথক হলে 'ইন্টারস্পীড' নামে আরেকটি অ্যাড এজেন্সির জন্ম হয়। ঠিক কখন থেকে ইন্টারস্পীডের যাত্রা তা জানা যায় না। তবে ইন্টারস্পীডের ওয়েবসাইটে নিজেদের প্রতিষ্ঠার সাল বলেছে ১৯৬৮। তাহলে ১৯৭৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর রবিবারে প্রকাশিত ইন্টাস্প্যানের ক্রোড়পত্রের কী হবে? আসলে আশির দশকের শুরুতে অথবা সত্তরের দশকের শেষে ইন্টারস্প্যান পৃথক হয়। কারণ ১৯৮৩ সালের পূর্বে 'ইন্টারস্পীড' এজেন্সির ডিজাইন করা কোনো বিজ্ঞাপন চোখে পড়েনি।

১৯৮৩ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইন্টারস্পিড'-এর ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৭২ সালে রশিদ আহমেদ প্রতিষ্ঠা করেন 'কারুকৃত'। ঢাকার বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে গ্রাফিকস ডিজাইনের প্রচলন তিনিই শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকার সরকারি ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্ট থেকে পড়াশোনা শেষ করে পাকিস্তানের করাচিভিত্তিক বিজ্ঞাপনী সংস্থা 'জে ওয়ালটার থমসন'-এ আর্ট ডিরেক্টর পদে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ২০শে এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় 'নবারুণ'। মোহাম্মদ খলিলুর রহমান ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ১৯৭৩ সালের ২০শে এপ্রিল 'নবারুণ অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেড'-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দৈনিক ইত্তেফাকের বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনী সংস্থার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, যা ছিল দ্বিতীয় উদ্যোগ।

১৯৭০ সালে সংবাদ পত্রিকায় 'ইন্টারস্প্যান অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড'-এর ডিজাইনে প্রকাশিত 'ইস্পাহানি মার্শাল লিমিটেড'-এর বিজ্ঞাপন।

১৯৭২ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'কারুকৃত'-এর ডিজাইনে প্রকাশিত 'জনতা ব্যাংক'-এর বিজ্ঞাপন।

১৯৭৪ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'নবারুণ'-এর ডিজাইনে প্রকাশিত সোনালী ব্যাংক'-এর বিজ্ঞাপন।

১৯৭২ সালে তথা তার পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনচিত্রের নিচে অনেক বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম দেখা যায়। এসকল সংস্থার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো মার্কেটে প্রচুর পরিমাণে কাজ করেছে। এরকম কয়েকটি বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান, যেমন-'বর্ণালী' ও 'বিজ্ঞাপনী' অ্যাড এজেন্সি দুটি অনেক নান্দনিক বিজ্ঞাপনের ডিজাইন করেছে। সত্তর ও আশির দশকে প্রতিষ্ঠান দুটি রমরমা ব্যবসা করে, যা পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখেই অনুমান করা যায়। 'রূপসা' নামের আরেকটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা, যে সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৭২ সালে অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'র‍্যাপিড' নামক প্রতিষ্ঠানটি অনেক বড় বড় কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ডিজাইন করে পত্রিকায় মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছে। তারপর 'লোটাস', 'পপুলার' এই দুটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইনে ১৯৭২ সালে অনেক বিজ্ঞাপন পত্রিকায় দেখা যায়। পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত 'পপুলার অ্যাড এজেন্সি' পপুলারই ছিল। কারণ পপুলার অ্যাড এজেন্সির ডিজাইনে ও তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিন প্রকাশ হতো। এবং পরবর্তী দশকে অর্থাৎ আশির দশকেও এই বিজ্ঞাপনী সংস্থার কার্যক্রম দেখা যায়। ১৯৭৩ সালে 'অনুপম' অ্যাড এজেন্সির প্রতিষ্ঠা। জন্মলগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি বেশ সুনামের সাথে কাজ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের ডিজাইনে অনেক বিজ্ঞাপন পত্রিকায় দেখা যায়। প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয় না। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের পত্রিকায় আরও কিছু বিজ্ঞাপনী এজেন্সির নাম পাওয়া যায়। যেমন–'প্রচারণী', 'পাফস্', 'রূপম', 'সিনোরিটা', 'পূরবী ইষ্টার্ণ', 'লোলিটা', 'নেক্সাস', 'নকশা', 'এপোলো', 'ইউনিক' প্রভৃতি। এর প্রতিটি এজেন্সি বিজ্ঞাপন জগতে ভালো কাজ করেছে। হয়তো এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল ছোট আকারে গলির মধ্যে এক রুমের অফিস। তার পরেও তারা যে পারফরম্যান্স দেখিয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়।

১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বর্ণালী' অ্যাড এজেন্সির ডিজাইনে 'নিউ ঢাকা ইন্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড'-এর বিজ্ঞাপন।

১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বিজ্ঞাপনী' অ্যাড এজেন্সির ডিজাইনে 'বাটা' সু'র বিজ্ঞাপন।

১৯৭৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'অনুপম' অ্যাড এজেন্সির ডিজাইনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।

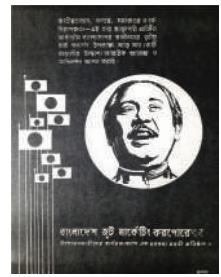

১৯৭৩ সালে 'র‍্যাপিড' ও 'রূপসা' অ্যাড এজেন্সির ডিজাইনে ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত 'লালবাগ কেমিক্যাল' ও বাংলাদেশ জুট মার্কেটিং করপোরেশনের বিজ্ঞাপন।

১৯৭৪ সালের বিজয় দিবসে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'অ্যাডকম' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।

গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরীর 'অ্যাডকম' অ্যাড এজেন্সির যাত্রা শুরু করে ১৯৭৪ সালের ৪ঠা জুলাই। এর পূর্বে গীতি আরা সাফিয়া ইস্টল্যান্ড অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেডে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে বিজ্ঞাপনী সংস্থার কর্মপরিধি ও পরিচালনা সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞানার্জন করেন। এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অ্যাড এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানটি অদ্যাবধি সুনামের সাথে কাজ করে চলেছে। বিজ্ঞাপন জগতে অনেক সৃজনশীল ডিজাইন উপহার দিয়েছে। এবং এই দীর্ঘ সময়ের পথ চলার মাঝে অনেক দৃষ্টিনন্দন বিজ্ঞাপনের ডিজাইন করেছে। ১৯৭৪ সালে আরশাদ আলী 'এলিট প্রিন্টিং প্যাকেজেস লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা করেন। এলিট প্রিন্টিং প্যাকেজের কোনো বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কি না আমার জানা নেই। তবে প্যাকেজিংয়ের জগতে এলিট বাংলাদেশে বেশ সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করছে। ১৯৭৪ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে 'বর্ণক' (BARNAK), 'কাকলী', 'নেপচুন', 'পল্লবী' নামে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম দেখা যায়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সৃজনশীল বিজ্ঞাপন দেখে অনুধাবন করা যায় তারা কত পরিশ্রম করে বিজ্ঞাপনচিত্র সৃষ্টি করেছেন।

বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনশিল্পের ইতিহাসের সঙ্গে যে কয়েকজন ব্যক্তির নাম সব সময় উচ্চারিত হয়, তাঁদের মধ্যে শরফুদ্দিন আহমেদ অন্যতম। তিনি ষাটের দশকের শুরুতে 'স্টার অ্যাডভারটাইজিং' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিজ্ঞাপনশিল্পের সঙ্গে

যুক্ত হন। এর আগে তিনি ছিলেন সাংবাদিকতা পেশায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে তিনি কবি ফজল শাহাবুদ্দিন এবং অভিনেতা হারুন রশিদকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'নান্দনিক অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড'। নান্দনিক বিজ্ঞাপন জগতে নানা ব্যতিক্রমধর্মী কাজ উপহার দিয়েছে। নান্দনিকই সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপনচিত্রকে রাঙিয়ে তুলেছে। ১৯৭৫ সালে 'অরবিট' (Orbit), 'মেঘদূত' ও ১৯৭৬ সালে 'নিমা' 'ইম্প্রেশন' (IMPRESSION), 'সুনিপুণ' (Shunipun), 'কনকর্ড' (Concord), 'Modads' সংস্থাগুলোর নাম পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনচিত্র থেকে পাওয়া যায়। তবে এগুলো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার সালের সাথে সম্পর্ক নেই। এর মধ্যে ইম্প্রেশন ও সুনিপুণ, কনকর্ড এজেন্সিগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করেছে। তবে প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে বেশি কিছু জানা সম্ভব হয় না।

১৯৭৯ সালে জনাব এবিএ ফখরুল কামাল (Mr ABA Fakhrul Kamal) প্রতিষ্ঠা করেন 'ম্যাডোনা লিমিটেড' (Medonna Limited)। এই প্রতিষ্ঠানটি অদ্যাবধি বেশ সুনামের সাথে কর্ম পরিচালনা করে আসছে। সম্ভবত ১৯৮০ সালে 'অ্যাডবেস্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে অভিনেতা আফজাল হোসেন প্রতিষ্ঠা করেন 'মাত্রা'। এই প্রতিষ্ঠান থেকে সৃষ্ট বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এরকম আমার নজরে পড়েনি। তবে প্রতিষ্ঠানটি টেলিভিশনের জন্য অনেক বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করেছে এবং বাংলাদেশের টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। এবং তৎকালীন বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণে আধুনিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। ১৯৮৫ সালে মুনির আহমেদ খান ও জুলফিকার আহমেদ প্রতিষ্ঠা করেন 'ইউনিট্রেন্ড'। প্রতিষ্ঠানটি বেশ সুনামের সাথে শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত অনেক নামকরা কোম্পানির সাথে কাজ করে চলেছে। আশির দশকে বেশ কিছু এজেন্সির নাম দেখা যায় পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনচিত্র থেকে, এর মধ্যে ১৯৮০ সালে 'ইমপ্যাক্ট', ১৯৮১ সালে 'অ্যাডকিং', 'দেশ প্রচারণী', ১৯৮২ সালে 'সাঁকো' (Shako Production), 'অনিন্দ্য' (ANINDA), 'অ্যালিগ্যান্ট', 'শ্যামলী' (SHYAMALI), ১৯৮২ সালে 'ইউনিভার্সেল', 'পেঙ্গুইন', ১৯৮৩ সালে 'কনসেপশন' (CONCEPTION), 'বীকন', 'ইম্পেরিয়াল', 'ত্রয়ী', 'সানবীম', 'দোয়েল', 'ইন্টারঅ্যাড', 'অ্যাবজর্বা', ১৯৮৪ সালে 'সেফ এসোসিয়েট', 'ভিস্অ্যাড', 'পদ্মা অ্যাডভারটাইজিং', 'সেমা

অ্যাডভারটাইজিং', ১৯৮৫ সালে 'দি পাইওনিয়ার ইন অ্যাভারটাইজিং' ১৯৮৭ সালে 'লিফলেট', 'জনতা অ্যাডভারটাইজিং লি.', ১৯৮৮ সালে 'ওরিয়েন্ট অ্যাডভারটাইজিং', 'এনকোড', ১৯৮৯ সালে 'অ্যাড এম্পায়ার' এবং ১৯৯০ সালে 'লিরা এন্টারপ্রাইজ' নামে বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায়। 'পদ্মা অ্যাডভারটাইজিং' ছিল রাজশাহীতে। এর মধ্যে অনেক বিজ্ঞাপনী সংস্থা দাপটের সাথে আশি ও নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাজ করেছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এবং নতুন অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের নামের পাশে উল্লিখিত সালগুলো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। ঐ সালগুলোতে দৈনিক পত্রিকায় তাদের ডিজাইনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন প্রথম আমার নজরে পড়ে।

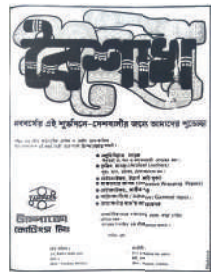

১৯৮০ সালের ইত্তেফাক পত্রিকায় 'ম্যাডোনা' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইনে প্রকাশিত, 'টাম্পাকো কোটিংস লি.'-এর একটি বিজ্ঞাপন।

১৯৮১ সালের ইত্তেফাক পত্রিকায় 'অ্যাডবেস্ট' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইনে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন সংস্থা'-এর একটি বিজ্ঞাপন।

নব্বইয়ের দশক থেকে বিজ্ঞাপন জগতে বড়সড়ো পরিবর্তন আসে। এ সময় বিজ্ঞাপনের ডিজাইন সৃষ্টিতে যোগ হয় আধুনিক নানা প্রযুক্তি। নতুন শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞাপনশিল্পে আমূল পরিবর্তন আসে। অনেক ব্যবসায়ীও এ শিল্পে বিনিয়োগ করতে শুরু করে। ১৯৯৩ সালে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার প্রতিষ্ঠা করেন 'এক্সপ্রেশনস্ লিমিটেড'। শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটি ভালো কাজ করে চলেছে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'Trikaiya Gray' অ্যাড এজেন্সির শাখা অফিস চালু হয় বাংলাদেশে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি 'গ্রে বাংলাদেশ' নামে তাদের

কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ১৯৯৭ সেপ্টেম্বর মাসে স্কয়ার গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে 'মিডিয়াকম লিমিটেড'। অঞ্জন চৌধুরীর নির্দেশে অজয় কুমার কুণ্ডুর নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা। ১৯৯৮ সালের শুরুতে আলাদা অফিস নিয়ে এর কার্যক্রম পুরোদমে চালু করে। বর্তমানে এই এজেন্সি বেশ সুনামের সাথে কাজ করে চলেছে।

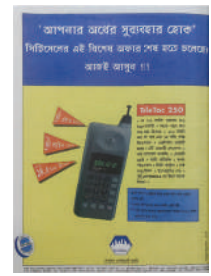

১৯৯৪ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'এক্সপ্রেশনস্' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইনে প্রকাশিত 'অ্যাঙ্কর' দুধের বিজ্ঞাপন।

১৯৯৭ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'Trikaya Gray' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইনে প্রকাশিত 'অ্যাঙ্কর' দুধের বিজ্ঞাপন।

বর্তমানে বাংলাদেশে ২৫০টিরও বেশি বিজ্ঞাপনী সংস্থা আছে।[৬] কিছু বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম পাওয়া গেলেও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। অনেক বিজ্ঞাপনী সংস্থা সত্তর আশির দশকে দাপটের সাথে কাজ করলেও বর্তমানে তারা প্রতিযোগিতার বাজারে নেই-এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়।

উপসংহার

বাংলাদেশে বর্তমানে যেসব বিজ্ঞাপনী সংস্থা রয়েছে সেগুলো বেশ সুনামের সাথে কাজ করছে। তবে একটি বিষয় লক্ষ করা যায়, বর্তমান সময়ে অনেক কর্পোরেট অফিস বা লিমিটেড কোম্পানি বিজ্ঞাপনী সংস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এর

[৬] *https://www.facebook.com/smritiadvertising/posts/614334098700892/, Date: 28-01-2021.*

কারণ হিসেবে বলা যায় তারা বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে আর পুষতে পারছে না। যে কারণে নিজেরাই একটি ডিজাইন সেকশন চালু করে নিচ্ছে, সেখানে কয়েকজন ডিজাইনারসহ লোকবল নিয়োগ দিয়ে অনেক কম খরচে তাদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা অনুসারে ডিজাইন সংক্রান্ত কাজগুলো সম্পাদন করে নিচ্ছে। কাজ কমে যাওয়ার ফলে বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। আবার অনেকে এই প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অন্য ব্যবসা শুরু করেছে। পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো ষাট, সত্তর কিংবা আশির দশকে যে জৌলুস নিয়ে ব্যবসা ও ক্রিয়েটিভ কর্ম প্রদর্শন করেছে-বর্তমানে সেখানে কিছুটা কমতি পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে ডিজাইনগুলো থিমেটিক হলেও তুলির স্পর্শ থাকে না বললেই চলে। পূর্বে এ-দুইয়ের সংমিশ্রণে যে ডিজাইন সৃষ্টি হতো তা ছিল সত্যিই নান্দনিক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই প্রবন্ধে কিছু তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে।

গ্রাফিক ডিজাইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্র প্রসঙ্গ লোগো ডিজাইন ও ব্র্যান্ড আইডেনটিটি

রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম*

সারসংক্ষেপ : *বর্তমান বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ব্যবহারিক সবকিছুর মধ্যেই গ্রাফিক ডিজাইনের বিচরণ অনস্বীকার্য। প্রচার এবং প্রসারের বা কোনো সেবা কিংবা পরিষেবার শিল্পসম্মত উপস্থাপনার জন্য গ্রাফিক ডিজাইনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিদিনের বস্তুগত উপাদান ও সেবার যেসব উৎস রয়েছে, তা গ্রাফিক ডিজাইনের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই দৃশ্যগতভাবে দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয়। বলা যায়, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রেই খুব সাবলীলভাবে মিশে আছে গ্রাফিক ডিজাইনের নানা অনুষঙ্গ। এর মধ্যে 'লোগো ডিজাইন' এবং 'ব্র্যান্ড আইডেনটিটি' আধুনিক গ্রাফিক ডিজাইনে বহুমাত্রিক চর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটি মাধ্যম। এ কারণে পরিচিতিমূলক ভিজুয়াল/প্রতীক ও ইমেজ কমিউনিকেশনের উদাহরণ হিসেবে এই দুটি বিষয়কে বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত বিষয়কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।*

ভূমিকা

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গোষ্ঠী, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিজ্ঞানের মতো গ্রাফিক ডিজাইনেরও শব্দ ও ভাষা রয়েছে। সেই ভাষাটি বুঝতে ও গ্রহণ করতে ডিজাইনের নির্দিষ্ট সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন। ডিজাইন সাধারণত কিছু আকার আকৃতিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক বা নির্ভুলভাবে মিলিয়ে সাজানো, যা একটি

*সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিল্প। শিল্পের প্রভাব ছাড়া বর্তমান সময়ে জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্প আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। শিল্পের মূল উদ্দেশ্য নান্দনিক উপস্থাপনা হলেও এর সৃজনশীল ব্যবহারিক দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনে গ্রাফিক ডিজাইনের ব্যাপকতা অনেক বেশি। বর্তমান বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ব্যবহারিক সবকিছুর মধ্যেই গ্রাফিক ডিজাইনের বিচরণ অনস্বীকার্য। আমরা যা কিছু করি না কেন তার একটা নান্দনিক উপস্থাপনার অবশ্যই প্রয়োজন। প্রচার এবং প্রসারের বা কোনো সেবা কিংবা পরিষেবার শিল্পসম্মত উপস্থাপনার জন্য গ্রাফিক ডিজাইনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বস্তুসামগ্রীর উপরিতলে বা সারফেইসে হাতে বা সরাসরি আঁকা বিভিন্ন প্রাকৃতিক, জ্যামিতিক ও বিমূর্ত আকার আকৃতি দিয়ে সাজানো হচ্ছে নকশা বা ডিজাইন। সেই ডিজাইনকে প্রসেস, টেকনিক, টেকনোলজির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ করার শিল্প প্রক্রিয়া হলো গ্রাফিক ডিজাইন।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারায় ব্যবহারিক ডিজাইন কার্যকর উপাদান হিসেবে চলমান রয়েছে; যার নির্দিষ্ট কোনো নাম ছিল না। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিদিনের বস্তুগত উপাদান ও সেবার একটি উৎস রয়েছে, যা উৎপাদক, বাজারজাতকারী, সরবরাহকারী বা সেবাদানকারীরূপে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। গ্রাফিক ডিজাইনের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দৃশ্যগতভাবে এই পরিচিতি দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয়। যেমন-বিভিন্ন চিহ্ন, প্রতীক, স্টাইল ইত্যাদির মাধ্যমে তৈরি প্রতিনিধিত্বশীল একটি প্রতীক দর্শকের চেতনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা পণ্যকে পরিচিত করে তোলে। আবার সেই প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবার মানকে সুপরিচিত প্রতীকচিহ্নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকের মনে নিজস্ব একটি ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রেই গ্রাফিক ডিজাইনের উপস্থিতি রয়েছে এবং খুব সাবলীলভাবে মিশে আছে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সাথে। গ্রাফিক ডিজাইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্র বলে শেষ করার মতো নয় কিন্তু তবুও কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে তুলে ধরা যায় যেখানে গ্রাফিক ডিজাইনের ছাপ অতি স্পষ্ট। যেমন-লোগো ও ব্র্যান্ডিং।

আধুনিক গ্রাফিক ডিজাইনে বহুমাত্রিক চর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটি মাধ্যম 'লোগো ডিজাইন' এবং 'ব্র্যান্ড আইডেনটিটি'। এ কারণে পরিচিতিমূলক ভিজুয়াল/প্রতীক ও ইমেজ কমিউনিকেশনের উদাহরণ হিসেবে এই দুটি বিষয়কে বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ক) ডিজাইন ও গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে ধারণা লাভ।

খ) দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রেই সাবলীলভাবে মিশে আছে গ্রাফিক ডিজাইন, সে-সম্পর্কে অবগত হওয়া।

গ) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতিমূলক চিহ্ন ও তার ইমেজ গঠনের ধাপগুলোর বিষয়ে ধারণা তুলে ধরা।

ঘ) কোনো প্রতিষ্ঠান, পণ্য, সেবা বা পরিষেবা সম্পর্কে নিজস্ব পরিচিতিমূলক ভাবমূর্তি কীভাবে প্রকাশিত হয় সে বিষয়ে অবগত হওয়া।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধটি তৈরির জন্য মূলত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পুস্তক ও গবেষণাকর্ম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশ থেকে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট পুস্তক ও গবেষণাকর্ম এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (প্রবন্ধে সংপৃক্ত) ওয়েবসাইটের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

মূল আলোচনার পূর্বে ডিজাইন এবং গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা প্রয়োজন।

ডিজাইন (Design)

ঐতিহাসিক তথ্যমতে যে মানুষেরা গুহাগাত্রে শিকারের ছবি এঁকেছে, সেই মানুষই দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র নকশা করে অলংকৃত করেছে। আধুনিক যুগে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে একদিকে যেমন-সমাজে ডিজাইনারদের প্রযুক্তি নির্ভর প্রয়োগগত বিস্তার ঘটে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের দক্ষ কুশলী ডিজাইনারের চাহিদা দেখা দেয়। ফলে যে ডিজাইনের ধারণা কারুশিল্পের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় কিছু কারিগরের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ, আর্থসামাজিক কারণে সে রীতির পরিবর্তন ঘটে। ক্রমশ ডিজাইনের ধারণা, কাজের পরিধি, দায়িত্ব এবং সামাজিক ভূমিকা–এই সবকিছুর ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটে। ডিজাইন প্রসঙ্গে লন্ডনভিত্তিক গ্লোবাল অর্গানাইজেশন International Council of Design তাদের ওয়েব সাইটে উল্লেখ করে :

> Design is a discipline of study and practice focused on the interaction between a person—a 'user'—and the man-made environment, taking into account aesthetic, functional, contextual, cultural and societal considerations. As a formalised discipline, design is a modern construct. (www.theicod.org, 2023)

মানুষের সামাজিক পরিবেশের চারপাশে যা আছে তা একে অপরের সাথে একটি পরিকল্পিত নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ও আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করে। যেমন-পোশাক, ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রী, ডিভাইস, ইন্টারফেইস, চেয়ার-টেবিল, পরিবহন, শহর, ঘরবাড়ি সবই পরিকল্পিত নকশা দ্বারা নির্মিত।

শিল্পবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের প্রণেতা শিল্পী অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার তাঁর প্রণীত শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বইয়ে উল্লেখ করেন :

> "ব্যবহারিক জীবনে তো বটেই, এমনকি শিল্পকলার বিশাল জগতে ডিজাইনের গুরুত্ব অপরিসীম। ডিজাইন কী? সঙ্গত কারণেই এ প্রশ্নটি জাগা স্বাভাবিক। এর উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায় ডিজাইন হচ্ছে যাবতীয় শিল্পের ভাষা। ভাষা

> ছাড়া যেমন-মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না, ডিজাইন ছাড়াও তেমনি শিল্প হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দের (words) নিজস্ব অর্থ থাকলেও বাক্য গঠন ছাড়া যেমন-ব্যাপক অর্থ প্রকাশে অক্ষম, তেমনি ডিজাইন ছাড়া ডিজাইনের বিভিন্ন প্রতীক, বা উপকরণও অসম্পূর্ণ। সুতরাং এই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করাই হচ্ছে ডিজাইনের উদ্দেশ্য।" (আব্দুস সাত্তার, ১৯৮৯ : ১০১)

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী ও শিল্পবিষয়ক লেখক নির্মাল্য নাগ কর্তৃক রচিত শিল্পচেতনা বইয়ের তথ্যমতে–

> .....প্রাচীন যুগ থেকেই শিল্পীরা প্রতিদিনের জীবনের যা কিছু ব্যবহৃত বস্তু তাকে নান্দনিক দিক থেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের নকশা অঙ্কন ও তার প্রয়োগ করতো। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির ফলে প্রেক্ষাপট বদলে যাওয়ায় ডিজাইন শব্দটির অর্থ ও তার কাজের এলাকা বহুলাংশে পালটে যায় ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়। আধুনিক যুগে ডিজাইন বলতে সামগ্রিক পরিকল্পনা বোঝানো হয়ে থাকে। এটি একটি সচেতন ও সুপরিকল্পিত ক্রিয়া, যা সু-নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে করা হয়ে থাকে। ডিজাইন শুধু পরিকল্পনাই করে না, সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়ণের যাবতীয় সমস্যা যেমন-সময়, পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা, উপকরণ ও মূল্য নির্ধারণ সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়। এজন্য ডিজাইনকে আনুষ্ঠানিক সৃষ্টিশীল কর্মতৎপরতা বলা হয়। (নির্মাল্য নাগ, ১৯৯২ : ১৯৫)

গ্রাফিক ডিজাইন

উদ্ভাবন ও পরিবর্তনের চেতনা থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আধুনিক গ্রাফিক ডিজাইনের সৃষ্টি। Graphic design in the modern sense was born in the early decades of this century, out of the spirit of innovation and change (Liz Maquiston & Barry kitts, Graphic Design Source Book, 1987 : Page 12)। প্রচার এবং প্রসারের জন্য কোনো কিছুর শিল্পসম্মত উপস্থাপনার জন্য যে বিষয়টির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো গ্রাফিক ডিজাইন। ইংরেজি Graphic শব্দটির আভিধানিক অর্থ–চিত্র, প্রতিচিত্র, অক্ষর চিত্রণ, নকশা ইত্যাদি। আর Graphically অর্থে–লেখার বা নকশার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জীবন্তরূপে চিত্রময় করে

তোলা (English-Bangla Dictionary, Bangla Academy)। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাকসুদুর রহমান বলেন :

> গ্রাফিক ডিজাইন নকশা, প্রতীক ও উপস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সুপ্রাচীন নন্দনশিল্পের আধুনিক পরিভাষা। এ পরিভাষার আওতাভুক্ত হয়েছে টেলিভিশন থেকে পত্রপত্রিকা, গ্রন্থাদি ও যাবতীয় প্রকাশনা প্রভৃতি শিল্প মাধ্যম। জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাহায্য সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তথ্য-নির্দেশনা, প্রচার প্রকাশনা প্রভৃতি কাজে গ্রাফিক ডিজাইনের ব্যবহার ব্যাপক। বর্তমান সময়ে গ্রাফিক ডিজাইনকে বলা হয় Visual Communication বা দৃষ্টিনির্ভর ভাষায় যোগাযোগ সৃষ্টির নন্দনশিল্প। (মাকসুদুর রহমান, ২০১৪, বাংলাপিডিয়া অনলাইন ভার্সন)

গ্রাফিক ডিজাইন কী এবং কেন এ সম্পর্কে কানাডিয়ান মাল্টিডিসিপ্লিনারি আর্টিস্ট ও ডিজিটাল আর্ট ডিরেক্টর Mila Jones Cann বলেন :

> Graphic design is the creation of visual compositions to solve problems and communicate ideas through typography, imagery, color and form. There's no one way to do that, and that's why there are several types of graphic design, each with their own area of specialization. (Mila Jones Cann, 2022, 99designs.com)

গ্রাফিক ডিজাইন টেক্সট ও ইমেজ-এর সমন্বয়ে একটি দৃশ্যগত তথ্যবহুল নকশার উপস্থাপন। হরফ ও নকশার উপাদানসমূহ ব্যবহার করে নির্দিষ্ট বিষয়ের দৃশ্যগত চিত্রকল্প প্রস্তুত করা। অর্থাৎ নিজের উদ্দেশ্য ঠিক রেখে মনোরম একটি নকশার বিন্যাস সৃষ্টি করা, যা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূলত দৃশ্যগত যোগাযোগ ব্যবস্থা, যা দৃষ্টিনির্ভর যে কোনো যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে শৈল্পিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আরও সহজভাবে বললে, কোনো কিছু তথ্যসহ অবগত করার উদ্দেশে শিল্প ও প্রক্রিয়ার মাধ্যম ব্যবহার করে যে দৃশ্যগত যোগাযোগ সৃষ্টি করা হয় তাকে গ্রাফিক ডিজাইন বলে।

গ্রাফিক ডিজাইনের কাজে আকার, ইমেজ, স্পেস, লিপি, টাইপোগ্রাফি এবং রঙের সমন্বয় ঘটিয়ে, আবার কখনো আলাদা আলাদাভাবে সেসব উপাদান ব্যবহার করে নির্দিষ্ট বার্তা আদানপ্রদান করা হয়। মূল বিষয়টি হলো একটি নির্দিষ্ট ধারণা স্থাপন এবং সেই অনুসারে উপাদান নির্বাচন ও পরিকল্পনা উপস্থাপন। নির্দিষ্ট ধারণা স্থাপনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি নির্ধারণ করা আবশ্যক যে, মূলত কার জন্য ও কাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য পরিকল্পনাটি করা হচ্ছে। ডিজাইন বা পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে দর্শকের প্রয়োজন অনুযায়ী ইমেজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং ইমেজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে টাইপোগ্রাফির প্রয়োগ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু রঙের সাথে টাইপোগ্রাফির ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

গ্রাফিক ডিজাইন একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া, যা শিল্প ও প্রযুক্তিকে মিলিত করে ভাব, চিন্তা ও ধারণা অন্যকে প্রদান করে। ডিজাইনার কোনো বার্তা (Message) নানারকম যোগাযোগের Tools ব্যবহার করে সুশৃঙ্খলভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দেয় কার্যকর দৃষ্টিনির্ভর আদানপ্রদানের মাধ্যমে বিশেষ গ্রাহক ও দর্শকের কাছে। গ্রাফিক ডিজাইনের প্রধান Tools ছবি (Image) এবং অক্ষর বা হরফ লিপি শিল্প (Typography)।

ইমেজভিত্তিক ডিজাইন (Image-Based Design) : ডিজাইনার কোনো ইমেজ বা চিত্রকল্প অথবা প্রতিচ্ছবির সমৃদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধি করে তার চিন্তা বা ধারণা ক্লায়েন্টের চাওয়া অনুযায়ী তুলে ধরে। ডিজাইনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গ্রাহকের নিকট তথ্য প্রদানের জন্য ইমেজ একটি বলিষ্ঠ উপাদান। শুধু তথ্য পৌঁছে দেয় না, মেজাজ এবং আবেগ, অনুভূতিও পৌঁছে দেয়। একটি ইমেজ মানুষের মনকে সহজে নাড়া দেয়, মানুষ তার প্রতিক্রিয়া দেখায়। এই ইমেজ হতে পারে কোনো আলোকচিত্র, পেইন্টিং অথবা চিত্রময় উপস্থাপন। ইমেজসংবলিত ডিজাইনে একটি ছবি বা চিত্রকল্প হাজার কথ ামালার (লিখিত তথ্যের) চেয়েও মূল্যবান।

অক্ষরভিত্তিক ডিজাইন (Type-Based Design) : এক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। কপিরাইটার একটি শব্দ বা বাক্য ভিন্নতরভাবে প্রস্তুত করে দেয়। ডিজাইনার সেই বার্তা প্রেরণের জন্য এই শব্দ বা বাক্যের ওপর নির্ভর করে। এখানে ডিজাইনার গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ শব্দ বা বাক্যের অক্ষর বিন্যাসের মাধ্যমে অথবা হাতে

লিখে বা অক্ষরের বিভিন্ন আকার আকৃতি তৈরি করে ডিজাইন প্রস্তুত করেন, যা পোস্টারে, মোড়কের গায়ে, পণ্যের গুণাগুণ বা স্লোগানে, বিজ্ঞাপন, নাটক ও সিনেমার টাইটেলে, বিভিন্ন সাইনবোর্ড এবং লোগো ডিজাইনে প্রয়োগ হয়ে থাকে। বিশেষভাবে অক্ষরভিত্তিক ডিজাইনের প্রয়োগ দেখা যায় বইয়ের প্রচ্ছদে, যা লেখক বা প্রকাশকের চাহিদা অনুযায়ী নকশা প্রস্তুত করে তৈরি করা হয়ে থাকে। আবার বিভিন্ন সংস্থার আউটডোর ও ইনডোর পোস্টারের মূল তথ্য বা স্লোগান এবং অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত দিয়েও ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

আলোচ্য প্রবন্ধটির মূল বিষয় যেহেতু গ্রাফিক ডিজাইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্র, সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সামগ্রিকতার সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

প্রায়োগিক ক্ষেত্র

মৌখিক যোগাযোগের পর যে কোনো দৃশ্যগত বা চাক্ষুষ যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রাফিক ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত, যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের একটি অংশ। মনে করি, কোনো সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কিংবা একটি কোম্পানি তার পরিষেবা অথবা পণ্য প্রচার বা বিক্রয় করতে চাচ্ছে, অথবা কোনো বার্তা প্রদান করতে চাচ্ছে, তাহলে সেই বিষয়কে একটি নিয়মের মধ্যে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রদর্শন করে থাকে উক্ত কোম্পানি। কীভাবে এটি করে থাকে? নিশ্চয় তাঁদের নির্দিষ্ট গ্রাহকদেরকে একজন একজন করে বলে না। সেই প্রতিষ্ঠান তাঁদের নির্দিষ্ট গ্রাহকের জন্য কোনো দৃষ্টিনির্ভর মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে, যেমন-পোস্টার ডিজাইন, হরফ তৈরি, লোগো ডিজাইন, পত্রিকার বিজ্ঞাপন বা ব্রোসিওর-এর কভার; এমনকি কম্পিউটারে প্রিন্টও নিতে পারে। এক্ষেত্রে তারা দৃশ্যগত যোগাযোগের সমস্ত উপাদান ব্যবহার করতে পারবে, যদি উক্ত প্রতিষ্ঠান গ্রাফিক ডিজাইনের ওপর নির্ভর করে। কারণ এর নান্দনিক দিকটি যেমন-গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তার প্রয়োজনীয়তার দিকটিও সমগুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে গ্রাফিক ডিজাইনের ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় জোরালোরূপে অবস্থান করছে। ঘুম থেকে উঠে সকালের খবরের কাগজে দৈনিক খবরের কাগজ বা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের মাস্ট হেড (পত্রিকার নাম), পত্রিকার কলাম সাজানো, ছবি ব্যবহার এবং বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠানের নানা নকশার বিজ্ঞাপন]; সারাদিন বিভিন্ন কাজ বিনিময়ের মধ্যে; পছন্দের বইয়ের প্রচ্ছদে, গল্প ও কবিতার ইলাস্ট্রেশনে; পণ্য বিপণনের বিজ্ঞাপনে; সেবা বা জনসচেতনতামূলক প্রচারে (পোস্টার, বিজ্ঞাপন, লিফলেট, ম্যাগাজিন ইত্যাদি) এবং সর্বোপরি সর্বাধিক নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীতে গ্রাফিক ডিজাইন বিচরণ করে। সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির পরিচয় (লোগো ও ব্র্যান্ডিং) বহন করে গ্রাফিক ডিজাইন। যেমন-তাদের web sites, প্রকাশনা (ব্রশিওর, লিফলেট, পোস্টার, বিজ্ঞাপন) এবং কোনো পণ্যের মোড়ক নকশা ইত্যাদি। যেমন-একটি পণ্যের প্যাকেটে লোগোর সাথে পণ্যের গুণাগুণ-এর Text, নকশা, Art work (ফটোগ্রাফ, ডিজাইন, ইমেজ, ইলাস্ট্রেশন) রং ও নকশার উপাদানসমূহ ব্যবহার করে গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে সঠিক বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়।

আমাদের দেশে তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মেগা সিটি থেকে শুরু করে মফস্বল শহর ও গ্রামে সব শ্রেণির মানুষের কাছে টেলিভিশন তথ্য ও বিনোদনের একটি তাৎক্ষণিক জনপ্রিয় মাধ্যম। সারা বিশ্বের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রতিদিন সংবাদ, নাটক, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। টেলিভিশনের লোগো থেকে শুরু করে মোশন গ্রাফিক্স এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সেট ডিজাইন, টাইটেল অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স কার্ড, খবরের বিভিন্ন গ্রাফিক্স, যেমন-ইনফরমেশন কার্ড, ছবি, ম্যাপ, ব্যবসা, খেলা, দেশ ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সমূহের গ্রাফিক্স, সবকিছু গ্রাফিক ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত। টিভিতে যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় সেখানেও থাকে গ্রাফিক ডিজাইন। যেমন-একটি বিজ্ঞাপনের সেট কেমন হবে, তার ব্যাকগ্রাউন্ডের রং বা ডিজাইন কী হবে ইত্যাদি।

গ্রাফিক ডিজাইন ক্লায়েন্ট ও ডিজাইনারের মিলিতভাবে কাজ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এটি একটি চলমান সমস্যা সম্পাদনের প্রক্রিয়া। যেখানে ডিজাইনের সমস্ত শৃঙ্খলা বজায় রেখে সমস্যা সম্পাদনের কাজ করা হয়। বলা যায়–গ্রাফিক ডিজাইন তথ্য ও নকশার আন্তঃসংযোগের মাধ্যম হিসাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুভূতিসম্পন্ন জ্ঞান, দক্ষতা এবং প্রযুক্তি।

একটি প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির সেবা বা পণ্য এবং উপাদানসমূহের পরিচয় তুলে ধরে লোগো, রং, লেটার প্যাড, বিজনেস কার্ড, মোড়ক নকশা, প্রচার এবং লেখার

মাধ্যমে। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট করে কোম্পানির ব্র্যান্ডিং (Branding)। পাশাপাশি কর্পোরেট আইডেনটিটি (Corporate Identity)-র জন্য ব্র্যান্ডিং ব্যবসায়িক নামের ক্ষেত্রে অধিকতর দৃঢ় সম্পর্কযুক্ত পরিচিতিমূলক চিহ্ন। কর্পোরেট আইডেনটিটি পারে উক্ত কোম্পানির বৈশিষ্ট্য এবং মনোভাব তুলে ধরতে এবং সামাজিক পরিষেবা গড়ে তুলতে। সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োজন উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটি মানানসই লোগো, তারপর ব্র্যান্ডিং।

গ্রাফিক ডিজাইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উল্লিখিত দুটি অনুষঙ্গ 'লোগো' এবং 'ব্র্যান্ডিং' কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

লোগো ডিজাইন (Logo Design)

'লোগো' একটি Graphical element, যা গ্রাফিক ডিজাইনে গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিকতর কার্যকরী একটি উপাদান। ইংরেজি 'Logo' শব্দটি এসেছে গ্রিক 'Logos' শব্দ থেকে। এর অর্থ–শব্দ, কারণ বা পরিকল্পনা (https://www.britannica.com/topic/logos, ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২২)। Logo : A design or symbol used by a company to advertise it's products (Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Fourth Edition, 2021)। লোগো বোঝাতে প্রতীক, নিদর্শন, চিহ্ন, সংকেত এই সকল শব্দকে বোঝায়। লোগো কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষালয় এবং পণ্যসামগ্রীর ভাব, আদল, প্রতিচ্ছায়া রূপায়িত করে। অর্থাৎ, লোগো একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতীকায়ন নকশা। প্রতীকের সাহায্যে ভাবের রূপায়ণ, যা ব্যবহার হয় সাধারণত উক্ত প্রতিষ্ঠানের Letterhead, বিজ্ঞাপনে, সাইনবোর্ডে এবং যাবতীয় দলিল ও কাগজপত্রাদিতে; যেন সহজেই প্রতিষ্ঠানটি শনাক্ত করা যায়। যদি পণ্য উৎপাদনকারী কোনো প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে তাদের পণ্যের প্যাকেজিং ও পণ্যের লেবেলে সেই প্রতিষ্ঠানের লোগো ব্যবহৃত হয়, যা ব্র্যান্ডের দৃশ্যগত পরিচয়ের একটি অংশ। এ সম্পর্কে বাজার ও ব্যবস্যা সংক্রান্ত অনলাইন সাইট MBN-এর তথ্যমতে–A logo is a drawing or image that a company, organization, group, or person uses to mark their identity, i.e., who they are. Companies may use them on their letterheads, adverts, and the

products they sell (https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/logo-definition/)।

স্কুলপড়ুয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাদের বন্ধু বা ভাইবোনদের সাথে বই, খাতা, পেন্সিল, ইরেজার, স্কেল, জ্যামিতি বক্স ইত্যাদি বদলে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে নিজ নিজ জিনিসপত্রগুলোতে কোনো না কোনো চিহ্ন দিয়ে রাখে। কখনো কখনো নিজের নাম লিখে রাখতে দেখা যায়। আবার দেখা যায়, গ্রামবাংলার কৃষক ও গৃহস্থরা তাদের গৃহপালিত পশু যেন হারিয়ে না যায় বা অন্য কারো পশুর সাথে পরিবর্তিত না হয়ে যায়, সেজন্য পশুগুলোর গায়ে বিভিন্ন সিল (Seal) অর্থাৎ ছাপ মেরে রাখে। এই চিহ্ন বা মার্ক (Mark), সিল (Seal) তাদের নিজস্ব প্রতীক। এর সবই কিন্তু অন্য সবার মধ্য থেকে নিজেকে বা নিজের বস্তুটিকে আলাদা করে রাখার জন্য, যেন অন্য কেউ দেখলে বুঝতে পারে এই জিনিসটি কার। এই চিহ্নগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক ভায়ায় লোগো (Logo) বলা হয়ে থাকে। বিশ্ববিখ্যাত Apple ব্র্যান্ডের লোগো ডিজাইনার Harold Abelson-এর মত–Logo is the name for a philosophy of programing languages that aid in its realization (https://el.media.mit.edu/logo-foundation/what_is_logo/index.html)

লোগো একটি প্রতীক বা নিদর্শন, একটি গ্রাফিক চিহ্ন, যা একটি প্রতিষ্ঠান, একটি পণ্য, বা কোনো সরকারি ও ব্যক্তিগত সত্তাকে চিহ্নিত করে। কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নাম বা লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে হরফ বা নকশার দ্বারা স্বতন্ত্র প্রতীকরূপে প্রতিনিধিত্ব করে। একটি ছোট প্রতীকের অনেক দায়িত্ব। প্রাথমিকভাবে একটি লোগো কোনো প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, পণ্য বা সেবার প্রতীক। এটি হরফ এবং কোনো চিহ্নের ডিজাইন ও ইমেজ কিংবা উভয় মাধ্যমের সমন্বয়ে তৈরি, যা গ্রাহকের পছন্দের সেবা বা পণ্য কিংবা ব্র্যান্ড শনাক্ত করতে সহায়তা করে। একটি নান্দনিক লোগো সেই সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্বরূপ। কারণ সুন্দর উপযুক্ত একটি লোগো গ্রাহককে বুঝতে সহায়তা করে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য, কাজ, ধরন এবং গুরুত্ব।

নেদারল্যান্ড থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত Science Direct জার্নালের ৫১তম ভলিউমে George Adîr, Victor Adîrb, Nicoleta Elisabeta Pascu লেখকত্রয়ী তাদের আর্টিকেল Logo design and the corporate identityতে উল্লেখ করেন :

> First of all we have to see what a logo is. It is a symbol, a graphic and visual sign which plays an important role into the communication structure of a company. A logo is a clear graphic element which make possible to distinct between companies. A logo is a signature of a company, may be like a new conception, a certain life style etc. It is about a bridge between the public and the company. It conveys details in a very concentrate graphic representation. It is a possible sign to compare similar items. That is why to create a logo is not a happening, is a consequence of very specified analyses, concerning geometric shapes, colours, various signs and symbols, all into an harmonious mixture which is driven "to catch" and to be part of people's mind. (George, Victor, Nicoleta, 2012, 650)।

এখন অনেক জনপ্রিয় ও সফল কোম্পানি বলে থাকে–"simpler is better"। অর্থাৎ সরলতায় উত্তম অথবা সাদামাটা অধিকতর ভালো। বিশেষত আজ যখন মানুষের জীবনযাত্রা অনেক বেশি দ্রুত ব্যস্ততম, তখন অনেক কম সময়ের মধ্যে কীভাবে গ্রাহকের মনে রেখাপাত করা যায় প্রতিষ্ঠানগুলো সেদিকে লক্ষ রাখে। তাই এক্ষেত্রে ডিজাইনারকে লোগো ডিজাইন করার সময় সতর্ক থাকতে হয় তা যেন সহজেই মানুষের মনে গেঁথে যায়।

সুন্দর হরফ, সুন্দর ডিজাইন শৈলী তৈরির মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে একটি নান্দনিক সুন্দর লোগো। যেমন-বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, আড়ং, ব্রাক, প্রথম আলো, Coca-Cola, NIKE ইত্যাদি চমৎকার লোগোসমূহ নিজ প্রতিষ্ঠানকে পরিচিত করে তুলেছে অতি সুচারুভাবে।

চিত্র ১ : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস-এর লোগো (সূত্র : www.biman-airlines.com)

চিত্র ২ : বাংলাদেশের একটি হস্ত ও কারুশিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'আড়ং'-এর লোগো (সূত্র : www.aarong.com)

চিত্র ৩ : আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা ব্র্যাকের লোগো (সূত্র : www.brac.net)

চিত্র ৪ : বাংলাদেশের জনপ্রিয় দৈনিক খবরের কাগজ প্রথম আলো'র মাস্টহেড লোগো (সূত্র : www.prothomalo.com)

চিত্র ৫ : বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় কোমল পানীয় কোকা-কোলা'র লোগো (সূত্র : coca-cola company.com)

চিত্র ৬ : বিশ্বব্যাপী খেলাধুলার সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নাইকি'র লোগো (সূত্র : www.nike.com)

শুধু Typeface-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ইমেজ পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপিত না হলে এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় বা ভাবের সংক্ষিপ্ত প্রতীক বা চিহ্ন যুক্ত করে লোগো ডিজাইনে পরিপূর্ণতা আনা যায়। কিংবা Type-এর গঠন ভেঙে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আদলে একটি Form তৈরি করে লোগো ডিজাইন করা যায়। আবার কোম্পানির নামের শব্দগুলোর প্রথম অক্ষরটি নিয়েও লোগো ডিজাইন করা হয়। অনেক সময় Typeface-এর মাধ্যমে কোম্পানির নাম যুক্ত না করে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো চিহ্ন (Mark) বা প্রতীক (Symbol) ব্যবহার করেও প্রতিষ্ঠানের ইমেজ প্রতিফলিত করা সম্ভব। অন্যদিকে Type-এর রূপের কিছুটা পরিবর্তন করে (কিংবা না করেও) একটা নতুন চেহারা দেয়া যায়, যা কিছুদিন ব্যবহৃত হওয়ার ফলে নিজেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ইমেজকে প্রকাশ করে। এমনকি এর কোনো অংশ বাদ

দিলেও ইমেজটুকু ঠিকই থেকে যায়। যেমন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আলোক শিখা', বাটা সু কোম্পানির 'B', Benson & Hedges-এর '&' এবং ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়ার 'f' ইত্যাদি।

চিত্র ৭ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনোগ্রাম ও তার আলোকশিখা (সূত্র : গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

চিত্র ৮ : বাটা সু কোম্পানি'র লোগো এবং Bata'র প্রথম অক্ষর B (সূত্র : https://www.batabd.com)

চিত্র ৯ : Facebook-এর লোগো ও তার বহুল পরিচিত প্রথম অক্ষর ছোট হাতের f (সূত্র : www.google.com)

চিত্র ১০ : Benson & Hedges -এর ব্র্যান্ড লোগো ও '&' (সূত্র : www.batbangladesh.com)

লোগোর ভিজুয়াল ভাষা সাধারণত কোনো সংস্কৃতি বা দেশে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি বৈশ্বিক ভাষার ভিজুয়াল রূপ। তাই একটি প্রতিষ্ঠানের লোগো ও ব্র্যান্ড আইডেনটিটি বিশ্বসমাজের গণমানুষের উদ্দেশে প্রণীত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সেবা, পণ্য, ব্র্যান্ড-এর বিভিন্ন ডিজাইনের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যের লোগো হয়ে থাকে। কোনোটি শুধু একটি শব্দের, কোনোটি এক বা একাধিক অক্ষর দিয়ে তৈরি। কোনো লোগোতে শুধু কোনো চিহ্ন বা প্রতীক থাকে, আবার কোনোটিতে চিহ্ন ও লেখা দুটোই থাকে। এসব নানা ধরনের লোগোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন-

মনোগ্রাম (Monogram) বা লেটারমার্ক (Lettermark) লোগো, ওয়ার্ডমার্ক (Wordmark) লোগো, সচিত্র চিহ্ন (Pictorialmark) বা প্রতীকী (Symbolic) লোগো, বিমূর্ত বা ভাবগত/ভাবমূলক (Abstract) লোগো, মাস্কট (Mascot)

লোগো, সমন্বিত (Combination) লোগো, এবং প্রতীক (The Emblem) ইত্যাদি। (সূত্র : 99designs.com, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২২)

মনোগ্রাম (Monogram)/লেটারমার্ক (Lettermark) লোগো

Mono শব্দের অর্থ 'এক' এবং Grame অর্থ 'মানযুক্ত লিপি'। অর্থাৎ Monogram-এর আভিধানিক অর্থ–একক মানযুক্ত লিপি। এর প্রয়োগগত অর্থে এভাবে বলা যায়-দুই বা ততোধিক বর্ণ (বিশেষত নামের আদ্যক্ষর) জড়িয়ে তৈরি করা নকশা (যা রুমাল, নোটের কাগজ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়) (সূত্র : Bangla Academy English-Bangla Dictionary) এবং যে নকশায় কয়েকটি জড়ানো অক্ষর (বিশেষত : কোনো লোকের নামের আদ্যক্ষরসমূহ) খোদাই করা থাকে; a set of letters. (সূত্র : Oxford Advanced Learner's Dictionary, English to Bengali and English)। নাম থেকেই বোঝা যায় এই শ্রেণির লোগোগুলোর বৈশিষ্ট্য কেমন। মনোগ্রাম বা লেটারমার্ক লোগো সাধারণত অক্ষর নিয়ে গঠিত। এটি লিপি নিদর্শন প্রতীক। কোনো প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ নামের আদ্যক্ষর ব্র্যান্ড। পূর্ণ নাম না দিয়ে দুই বা তিন অক্ষরে একটি সংক্ষিপ্ত আকারে হরফের নান্দনিক উপস্থাপন করা। যেমন-'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' UGC (University Grants Commission of Bangladesh), 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন' BPC (Bangladesh Parjatan Corporation), BEXIMCO (Bangladesh Export Import Company Limited), ETV 'একুশে টেলিভিশন' (Ekushey Television), NASA (National Aeronautics and Space Administration) এবং IBM (International Business Machines Corporation) ইত্যাদি।

চিত্র ১১ : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর লোগো (সূত্র : www.google.com)।

চিত্র ১২ : বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর লোগো (সূত্র : www.google.com)

চিত্র ১৩ : বাংলাদেশের প্রথম সারির ব্যবসায়ী গ্রুপ বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি লিমিটেড-এর লোগো (সূত্র : www.beximco.com)

চিত্র ১৪ : বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন চ্যানেল একুশে টেলিভিশন-এর লোগো
(সূত্র : www.ekushey-tv.com)

চিত্র ১৫ : যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র National Aeronautics and Space Administration-এর লোগো
(সূত্র : www.google.com)

চিত্র ১৬ : যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র International Business Machines Corporation-এর লোগো
(সূত্র : www.ibm.com/us-en)

একটি লেটারমার্ক লোগো হলো অক্ষরভিত্তিক লোগো, যা একটি প্রতিষ্ঠানের একাধিক শব্দের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত হয়। এক ধরনের সরল আবহ তৈরি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। কারণ দীর্ঘ নাম মনে রাখার থেকে ছোট একটি শব্দ তার সৃজনশীল ডিজাইনের উপস্থাপনের মাধমে মানুষের মনে সহজেই সরলতার সাথে গেঁথে থাকে।

ওয়ার্ডমার্ক (Wordmark) লোগো

ওয়ার্ডমার্ক লোগো সাধারণত লেটারমার্ক লোগোর মতো। এটি একটি হরফভিত্তিক (Font-Based) লোগো। এই ধরনের লোগো ডিজাইনে প্রতিষ্ঠান বা পণ্যের নাম এক শব্দের হয়ে থাকে এবং সম্পূর্ণ নামটিই লোগো হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- খুব জনপ্রিয় সার্চ (Search) ইঞ্জিন 'Google'-এর লোগো। এছাড়া দুটি জনপ্রিয় প্রোডাক্ট লোগোর নাম উল্লেখ করা যায়, যথা–'কোকা-কোলা', যা একটি শব্দকে চিহ্ন বা প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করে এবং জার্মান মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি Beiersdorf AG-এর কেতাদুরস্ত স্কিন এবং বডি কেয়ার বিভিন্ন ধরনের পণ্যের লোগো 'NIVEA'।

চিত্র ১৭ : সারা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন Google-এর লোগো
(সূত্র : www.google.com)

চিত্র ১৮ : কোমল পানীয় কোকা-কোলা'র লোগো
(সূত্র : coca-cola company.com)

চিত্র ১৯ : স্কিন এবং বডি কেয়ার বিভিন্ন ধরনের পণ্যের লোগো 'NIVEA'
(সূত্র : https://www.nivea.com)

এই শৈলীর লোগোতে কোনো আদ্যক্ষর আলাদাভাবে ফোকাস হয় না, কিন্তু পুরো নামটিই একটি ব্র্যান্ডকে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিষ্ঠান বা পণ্যের নামটি যদি আকর্ষণীয় ও এক শব্দের হয়, তাহলে ওয়ার্ডমার্ক লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে এবং ব্র্যান্ড হিসেবে খুব ভালো কাজ করে। আকর্ষণীয় নাম, সৃজনশীল লিখনশৈলী এবং রঙের মিলিত নকশায় অনন্য একটি লোগো তৈরি হয়। এই ধরনের লোগো ব্যবহারকারী স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক কয়েকটি কোম্পানির নাম উল্লেখ করা যায়, যারা কি না তাদের প্রতিষ্ঠানের পুরো নাম লোগো হিসেবে ব্যবহার করেছে, যেমন- বাংলাদেশের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম জাতীয় সাবান, প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুতকারক ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান কোহিনূর কেমিক্যাল কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর প্রোডাক্ট 'তিব্বত'-এর লোগো (সূত্র : www.kohinoor-bd.com/), বুটিক শপ 'দেশাল', Facebook, FedEx, VISA, Nescafe, SONY, Canon, Lux ইত্যাদি।

চিত্র ২০ : ৬০, ৭০ ও ৮০'র দশকের জনপ্রিয় প্রসাধনী সামগ্রী তিব্বত-এর লোগো (সূত্র : https://sharebiz.net)

চিত্র ২১ : বাংলাদেশের আর্ট এন্ড ফ্যাশন প্রতিষ্ঠান দেশাল-এর লোগো (সূত্র : https://deshal.net)

চিত্র ২২ : বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ওয়েবসাইট facebook-এর লোগো (সূত্র : www.google.com)

চিত্র ২৩ : আমেরিকান বহুজাতিক সরবরাহ পরিষেবা সংস্থা FedEx Corporation-এর লোগো (সূত্র : www.fedex.com/en-us/home.html)

চিত্র ২৪ : আমেরিকান বহুজাতিক আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান Visa Inc.-এর লোগো। এর প্রদত্ত সেবাগুলোর মধ্যে অন্যতম ভিসা ব্র্যান্ডের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড (সূত্র : www.google.com)

চিত্র ২৫ : বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান Nestle-এর কফি ব্র্যান্ড Nescafe'র লোগো (সূত্র : https://www.nescafe.com)

চিত্র ২৬ : জাপানি ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী নির্মাতা প্রতিষ্ঠান SONY-এর লোগো (সূত্র : https://www.sony.net/)

চিত্র ২৭ : জাপানি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান Canon-এর লোগো। এই প্রতিষ্ঠানটি চিত্রধারণ ও অপটিক্যাল বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। ক্যামেরা ছাড়াও এই কোম্পানি ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার ও মেডিকেল প্রযুক্তি যন্ত্র উৎপাদন করে থাকে। (সূত্র : https://global.canon/en/)

চিত্র ২৮ : ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী বহুজাতিক কোম্পানি ইউনিলিভার-এর প্রসাধনী সামগ্রী LUX-এর লোগো (সূত্র : www.unilever.com/our-company)

সচিত্র চিহ্ন (Pictorial Mark) বা প্রতীকী (Symbolic) লোগো

এই প্রকারের লোগো সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে ইংরেজি শব্দ Pictorial-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত শব্দ সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

ইংরেজি Pictogram শব্দের অর্থ-চিত্রলিপি (ইংলিশ-বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ২০২০)। Pictography অর্থ চিত্র দ্বারা লিখন পদ্ধতি (Oxford) এবং Pictorial-এর আভিধানিক অর্থ; চিত্রে বিধৃত বা প্রকাশিত ও চিত্র সম্বন্ধীয় ইংলিশ-বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ২০২০)।

সচিত্র চিহ্ন বা প্রতীকী লোগো বলতে চোখের সামনে যা ভেসে ওঠে, তা আসলে বিভিন্ন ধরনের Pictograph। এই পিক্টোরিয়াল বা সিম্বলিক লোগো একটি ব্র্যান্ড মার্ক, যা আইকন (Icon) হিসেবেও পরিচিত। ইংরেজি Icon শব্দের অর্থ খোদাই করা প্রতিমা (ইংলিশ-বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ২০২০)। অন্যদিকে Symbolic শব্দের অর্থ প্রতীকী (ইংলিশ-বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ২০২০), যা Symbol (বাংলায় প্রতীক, লক্ষণ, চিহ্ন, সংকেত ইত্যাদি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়)-এর গুণবাচক (adjective) শব্দ। যাই হোক, উল্লিখিত ধারার লোগো ডিজাইনে সিম্বলিক আইকন (Symbolic Icon) ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে একটি প্রতীকী চিহ্ন নকশা করা হয়, যার একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে এবং অবশ্যই সেটি যে প্রতিষ্ঠানের লোগো তার বৈশিষ্ট্য বা যে বার্তা প্রদান করা হচ্ছে তার সাথে

সম্পর্কিত। এই পিক্টোরিয়াল বা সিম্বলিক লোগো এতটা জোরালো প্রতীক যে কোনো নাম বা তথ্য ছাড়াও চিহ্নটি তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা যায়। এটি একটি স্বতন্ত্র প্রতীকী চিত্র। পিক্টোরিয়াল মার্ক (Pictorial Mark) লোগোর সবচেয়ে বড় উদাহরণ পৃথিবীখ্যাত Apple কোম্পানির লোগো; জনপ্রিয় সোশ্যাল সাইট 'টুইটার' (Twitter)-এর বার্তা বাহক ছোট্ট নীল পাখি। বিশ্বব্যাপী খেলাধুলার সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 'নাইকি' (Nike) বর্তমানে তাদের লোগো থেকে 'Nike' শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু লেখার নিচের টিক চিহ্ন ব্যবহার করে তাদের সব ধরনের পণ্যসামগ্রী বাজারজাত করছে। বিশ্বব্যাপী গাড়ি প্রস্তুতকারী জাপানের প্রতিষ্ঠান Toyota Motor Corporation-এর লোগো। এসব লোগো পিক্টোরিয়াল মার্ক বা সিম্বলিক লোগোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগোটি সৃজনশীল নান্দনিক একটি প্রতীকী চিহ্ন, যার ডিজাইনে বইয়ের পিক্টোগ্রাফের মাঝে সূর্যের প্রতীকের পিক্টোগ্রাফ রয়েছে এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের লোগো 'মিল্কভিটা', যেখানে একটি গাভীর ফর্ম দিয়ে লোগো ডিজাইন করা হয়েছে।

চিত্র ২৯ : Apple Inc.-এর লোগো
(সূত্র : https://www.apple.com)

চিত্র ৩০ : সোশ্যাল সাইট Twitter-এর লোগো
(সূত্র : www.google.com)

চিত্র ৩১ : খেলাধুলার সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান NIKE.-এর টিক চিহ্ন
(সূত্র : https://www.nike.com)

চিত্র ৩২ : গাড়ি নির্মাণকারী বহুজাতিক জাপানি প্রতিষ্ঠান Toyota Motor Corporation-এর লোগো
(সূত্র : www.google.com)

চিত্র ৩৩ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো
(সূত্র : http://www.ru.ac.bd)

চিত্র ৩৪ : বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড-এর লোগো
(সূত্র : www.google.com)

এছাড়া অনেক ধরনের প্রয়োজনীয় Pictography Sign, Indexical Symbol Ges Singal দেখা যায়, যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং জনসচেতনতামূলক। যেমন-প্রসাধনী কক্ষের দরজায় নারী ও পুরুষের চিহ্ন, স্কুল, হাসপাতাল, ধূমপানমুক্ত এলাকা, বাস স্টপ, ট্রাফিক সিগনাল (রাস্তা পারাপার, হর্ন বাজানো নিষেধ, থামুন, ইউটার্ন নিষেধ) ইত্যাদি।

চিত্র ৩৫ : কয়েকটি জনসচেতনতামূলক Pictography Sign (সূত্র : www.google.com)

বিমূর্ত বা ভাবগত/ভাবমূলক (Abstract) লোগো

প্রথাগত লোগোর মতোই বিমূর্ত লোগো একটি ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন। এই লোগো ডিজাইন মূলত জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক বিভিন্ন আকার আকৃতি ও স্বাধীন ফর্মে করা হয়ে থাকে। এর রূপ, নকশা বা গঠন অনন্য। কারণ স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা না থাকলেও, নির্দিষ্ট ধারণাগত বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বাস্তবিক বৈশিষ্ট্যকে প্রদর্শন করে ফর্ম ও রঙের সাহায্যে। যেমন-পেপসি'র নীল ও লাল রঙের গোল বিভক্ত বৃত্ত, অলিম্পিক রিং, অ্যাডিডাস (adidas)-এর আনুভূমিক ডোরা রেখার ফুল এবং অটোমোবাইল কোম্পানি মিৎসুবিসি মোটরস্ (Mitsubishi Motors)'র লোগো।

চিত্র ৩৬ : কোমল পানীয় pepsi-এর লোগো (সূত্র : https://www.pepsi.com)

চিত্র ৩৭ : আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অলিম্পিক গেমস-এর লোগো (সূত্র : www.google.com)

চিত্র ৩৮ : খেলাধুলার সামগ্রী প্রস্তুতকারী জার্মান প্রতিষ্ঠান adidas-এর লোগো (সূত্র : www.google.com)

চিত্র ৩৯ : অটোমোবাইল কোম্পানি Mitsubishi Motors-এর লোগো (সূত্র : https://www.mitsubish-motors.com/en/index.html)

মাস্‌কট (Mascot) লোগো

মাসকট লোগো হলো এমন ধরনের লোগো, যেখানে বিভিন্ন ক্যারেক্টার (Character) ব্যবহার করা হয়। মাসকট লোগোর ডিজাইনে ব্যবহৃত চরিত্রটি সাধারণত খুবই আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। এই লোগোর প্রধান ফোকাস–চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলা। সাধারণত চরিত্রগুলো দেখা যায় রঙিন, কার্টুনিশ এবং সর্বদা মজাদাররূপে যা একটি ব্র্যান্ডের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। অনেকটা যেন কোম্পানির দূত হয়ে, বিশেষ করে যা শিশুদের মনে বেশ আবেদন তৈরি করে (আলোচনা : শাঙন, ৩রা অক্টোবর ২০২২, দুপুর ১:৩০ মিনিট)। এ ধরনের লোগোর মধ্যে KFC, Pringles এবং শিশুদের উপযোগী অনুষ্ঠান প্রচার করা বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেল 'দুরন্ত' (যেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার শাবককে উপস্থাপন করা হয়েছে) উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৪০ : আন্তর্জাতিক ফুড চেইন রেস্তরাঁ KFC (Kentucky Fried Chicken)-এর লোগো (সূত্র : www.google.com)

চিত্র ৪১ : পটেটো চিপস Pringles-এর লোগো (সূত্র : https://www.pringles.com/us/home.html)

চিত্র ৪২ : শিশুতোষ টেলিভিশন চ্যানেল দুরন্ত-এর লোগো (সূত্র : www.google.com)

সমন্বিত (Combination) লোগো

সমন্বিত লোগো হলো লেখা ও চিহ্নের সমন্বয়ে তৈরি লোগো ডিজাইন। এটি কোনো প্রতিষ্ঠান বা পণ্যের নামসহ একটি প্রতীক। যে প্রতীক অবশ্যই উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজ, সেবা এবং পণ্যের ধরনকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই ধরনের লোগো একটি সম্মিলিত শব্দচিহ্ন বা লেটারমার্ক এবং একটি সচিত্র চিহ্ন বা মাসকট কিংবা বিমূর্ত চিহ্ন নিয়ে গঠিত হয়। এক্ষেত্রে কখনো প্রতীক (Sign, Mark, Symbol)

ও নাম (Typography) পাশাপাশি থাকে, কখনো ওপর-নিচে হয়ে থাকে। আবার কোনোটাতে প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ নামের সাথে কয়েকটি চিহ্ন যুক্ত দেখা যায়। কোনো কোনো লোগোর ক্ষেত্রে দেখা যায় নির্দিষ্ট ফর্মের বা আকার (Shape)-এর ভিতরে প্রতিষ্ঠান বা পণ্যের নাম। আবার অনেকক্ষেত্রে পণ্যের ব্র্যান্ড নামের সাথে প্রতিষ্ঠানের নামটিও যুক্ত থাকতে দেখা যায় ।

চিত্র ৪৩ : Amazon.com-এর লোগো
(সূত্র : www.amazon.com)

সাধারণত এই ধারার লোগোতে একটি প্রতীকের সাথে একটি নাম (Text) থাকে। এই শৈলীর খুব অর্থপূর্ণ লোগো ডিজাইন হলো amazon.com। Amazon বিশ্বব্যাপী অনলাইনভিত্তিক একটি বাণিজ্য কোম্পানি। এটিকে খুচরা বিক্রেতাও বলা যেতে পারে, যেখানে সব ধরনের পণ্যসামগ্রী পাওয়া যায়। এর লোগোতে এই বিষয়টাকে খুব সচেতনভাবে ফুটিয়ে তুলেছে, amazon-এর 'a' এবং 'z' অক্ষরকে একটি বাঁকানো তীর চিহ্ন দিয়ে সংযুক্তকরণের মাধ্যমে; যা এ টু জেড (অর্থাৎ, সমস্তকিছু) কথাটিকে উপস্থাপন করছে (সূত্র : https://blog.logomyway. com/history-amazon-logo-design/)। কম্বিনেশন লোগো'র কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করা হলো–

চিত্র ৪৪ : বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন 'বাংলাদেশ বেতার'-এর লোগো।
(সূত্র : www.betar.gov.bd)

চিত্র ৪৫ : রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)-এর লোগো
(সূত্র : www.btv.gov.bd)

চিত্র ৪৬ : বাংলাদেশের বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল 'Channel 9-এর লোগো
(সূত্র : www.channelninebd.tv)

চিত্র ৪৭ : আন্তর্জাতিক ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী ব্রিটিশ কোম্পানি Unilever-এর লোগো (সূত্র : www.unilever.com/our-company)

চিত্র ৪৮ : বিশ্বব্যাপী পরিচিত আমেরিকান পোশাক কোম্পানি Levi Strauss & Co.-এর ডেনিম জিন্সের ব্র্যান্ড Levi's-এর লোগো (সূত্র : www.levi.com/US/en_US)

চিত্র ৪৯ : Unilever-এর একটি পণ্য। Personal care সামগ্রীসমূহের ব্র্যান্ড উড়াব-এর লোগো (সূত্র : www.dove.com/bd/home.html)

এমব্লেম (The Emblem)

Emblem-এর আভিধানিক অর্থ প্রতীক (English-Bangla Dictionary, বাংলা একাডেমি)। এমব্লেম (Emblem) বলতে সাধারণত জাতীয় প্রতীককে বোঝায়, যা অনেকটা ঐতিহ্যবাহী নকশায় ব্যাজ (Badges), সীল (Seal) ও ক্রেস্ট বা শিল্ড (Crest or Shield)-এর মতো হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক এবং সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতীককে এমব্লাম লোগো বলা হয়ে থাকে (সূত্র : https://www.merriam-webster.com › dictionary › emblem & https://99designs.com/blog/tips/types-of-logos)।

চিত্র ৫০ : বাংলাদেশ-এর জাতীয় প্রতীক (সূত্র : www.google.com)

চিত্র ৫১ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর প্রতীক (সূত্র : www.google.com)

চিত্র ৫২ : ভারত-এর জাতীয় প্রতীক (সূত্র : www.google.com)

চিত্র ৫৩ : পাকিস্তান-এর জাতীয় প্রতীক (সূত্র : www.google.com)

চিত্র ৫৪ : ইউনাইটেড কিংডম (UK)-এর প্রতীক (সূত্র :www.google.com)

চিত্র ৫৫ : ইউনাইটেড স্টেট অব আমেরিকা (USA)'র প্রতীক (সূত্র : www.google.com)

চিত্র ৫৬ : জাতিসংঘ'র প্রতীক (সূত্র : www.google.com)

অতএব বলা যেতে পারে যে-লোগো এমন একটি Brand, যা সব সময় মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখে। কোনো কিছুর Brand নির্মাণের ক্ষেত্রে দুটি কৌশলগত কার্যক্রম অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রথমত, সৃজনশীল ডিজাইনের উপাদান প্রায় সব সময় গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্বিতীয়ত, ডিজাইনের প্রয়োগ এমন হতে হবে যেন Branding-এর বৈশিষ্ট্যাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

২০১৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউ ইয়র্কে Brand New Conference-এ আমেরিকান গ্রাফিক ডিজাইনার Paula Scher (CNN, Citibank, windows 8-এর লোগো ডিজাইনার) বলেন :

> The logo is an entry point and at the core, should communicate some kind of message about your business. Even if it's something as simple as the company name (a wordmark). If it's some fancy text stating the company name accompanied by some kind of unique icon/image, that's great too! Storybooks come with all kinds of different covers, and a logo is no different. (সূত্র : https://vimeo.com/140774260)।

অনলাইন ডিজাইন সাইট 4C Design Works-এর তথ্যমতে–"একটি লোগো কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্র্যান্ড আইডেন্টিটির অংশ। এটি ব্র্যান্ডিং-এর এন্ট্রি পয়েন্ট। সাধারণত সামগ্রিক কার্যপরিধির প্রথম ধাপ তার লোগো, যার

নকশা ও রং মানুষকে সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রথমেই সংযুক্ত করে থাকে।" (সূত্র : https://4cdesignworks.com/logo-design)

একটি সুন্দর দুর্দান্ত লোগো একটি কোম্পানি সম্পর্কে মানুষকে বার্তা দেয়। অর্থাৎ, মানুষের নজরকে আকর্ষণ করে থাকে। সম্ভাব্য গ্রাহককে ব্যবসা, পণ্য, পরিষেবার সাথে একীভূত করতে পারে সুন্দর একটি লোগো। এর মাধ্যমে পরিকল্পিত একটি সফল ব্র্যান্ডিং পরিচালিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, বর্তমান আলোচনার দ্বিতীয় একটি প্রসঙ্গ ব্র্যান্ডিং, যার ডিজাইন কৌশল গ্রাফিক ডিজাইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ব্র্যান্ড আইডেনটিটি (Brand Identity)

Brand identity এক ধরনের স্বতন্ত্র পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রক্রিয়া, যার মূল উদ্দেশ্য একটি প্রতিষ্ঠান, তার পণ্য, সেবা বা পরিষেবা সৃজনশীল ডিজাইন দ্বারা যোগাযোগের মাধ্যমে উৎসাহিত করা।

কোনো একটি কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার জন্য তার নিজস্ব "BRAND" সূচনা করতে হলে তাদের এক ধরনের ভাবমূর্তি বা image দাঁড় করাতে হয় এবং তা দৃশ্যমান প্রচারণার মাধ্যমে প্রবর্তিত করতে হয়। Branding-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো-কোনো একটি প্রতিষ্ঠানকে অনন্য এবং পরিচয়যোগ্য করে তোলা এবং সেটি একটি কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পন্ন করা, যার ফলে সময়ের সাথে সাথে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি কোনো চিহ্ন বা আকৃতি ও রং দ্বারা শনাক্তযোগ্য একটি পরিবারে রূপ নেয়।

আমেরিকান লেখক ও ব্যবসা বিশ্লেষক Evan Tarver-এর ব্র্যান্ড আইডেনটিটি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ২০২২ সালের ১১ই এপ্রিল নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক ওয়েবসাইট Investopediaতে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন :

> Brand identity is the visible elements of a brand, such as color, design, and logo, that identify and distinguish the brand in consumers' minds. Brand identity is distinct from brand image.

> The former corresponds to the intent behind the branding and the way a company does the following-all to cultivate a certain image in consumers' minds:
>
> - Chooses its name, Designs its logo
> - Uses colors, shapes, and other visual elements in its products and promotions
> - Crafts the language in its advertisements
> - Trains employees to interact with customers
> - Brand image is the actual result of these efforts successful or unsuccessful. (www.investopedia.com/terms/b/brand-identity.asp)

কার্যকরী একটি Branding অনন্যরূপ প্রতিশ্রুতি দ্বারা অনুরূপ অনেক পণ্যদ্রব্য থেকে নিজের পণ্য বা কোম্পানির সবদিক বিবেচনা সাপেক্ষে উন্নীত করে নিজস্ব পণ্য এবং সেবা বেছে নিতে আবেগপূর্ণ অনুরণন সৃষ্টি করে ভোক্তা সাধারণের হৃদয় ও মন জয় করে। আমেরিকান ব্র্যান্ড কনসালটেন্ট ও লেখক Alina Wheeler তাঁর 'Designing Brand Identity' বইয়ে ব্র্যান্ড ও ব্র্যন্ড আইডেন্টিটি সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

> As competition creates infinite choices, companies look for ways to connect emotionally with customers, become irreplaceable, and create lifelong relationships. A strong brand stands out in a densely crowded marketplace. People fall in love with brands, trust them, and believe in their superiority. How a brand is perceived affects its success, regardless of whether it's a start-up, a nonprofit, or a product.

> Brand identity is tangible and appeals to the senses. You can see it, touch it, hold it, hear it, watch it move. Brand identity fuels recognition, amplifies differentiation, and makes big ideas and meaning accessible. Brand identity takes disparate elements and unifies them into whole systems. (Alina Wheeler, Designing Brand Identity, 2009 : 2, 4)

'প্রচারেই প্রসার'–বহুল প্রচারিত এবং পুরোনো একটি কথা। আর এই প্রচারই একটা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি তৈরি করে, দাঁড় করায় নিজস্ব ব্র্যান্ড। গ্রাফিক ডিজাইনের প্রয়োগের দরুন এই কাজটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন করা যায়। কোনো প্রতিষ্ঠান ও তার গ্রাহক বা সেবাগ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি বা পণ্য, সেবা ও পরিষেবার পরিচয় তুলে ধরতে গ্রাফিক ডিজাইনের প্রায়োগিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ডিজাইন এবং ব্র্যান্ডিং (Design & Branding) কোম্পানিগুলো তাদের টার্গেট (Target) ক্রেতাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ঠিক করতে সফল মার্কেটিং প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। যেহেতু মানুষ সব সময় দৃশ্যগত কোনো বিষয়বস্তু দেখে আকর্ষিত হয়, সেজন্য গ্রাফিক ডিজাইনের সমস্ত উপাদান ও প্রায়োগিক নীতির উপর নির্ভর করে দৃশ্যমান পরিচিতির পরিকল্পনা করা হয়। Brand identity সৃষ্টি করতে একজন গ্রাফিক ডিজাইনারের সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উপযুক্ত ও যথাযথ অনুষঙ্গ এবং গ্রাফিক ডিজাইনের উপাদান ব্যবহার করে ডিজাইনের পরিকল্পনা ও সম্পাদনা করতে হয় এবং লক্ষ রাখতে হয় যেন তা উক্ত কোম্পানি বা তার পণ্য ও সেবা'র প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

কাজের প্রকার (Type of Work)

গ্রাফিক ডিজাইনের বিভিন্ন প্রকার প্রায়োগ দেখা যায় ব্র্যান্ড আইডেন্টিটিতে। কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের লোগো (Logo) ডিজাইন থেকে শুরু করে তার পণ্য (Product), মোড়ক (Packaging) নকশা, বিজ্ঞাপন (Advertising) ডিজাইন, বিজনেস কার্ড

(Business Card), লেটারহেড প্যাড (Letterhead), খাম, নিজস্ব টাইপফেস (Typeface) তৈরি, ব্রোশিওর, বিল বোর্ড, পোস্টকার্ড, ফ্লাইয়ার ডিজাইন এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট, ই-মার্কেটিং টেম্পলেট, সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য বিজ্ঞাপন, ব্যানার, গ্রাফিক্স আইকন ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব চিহ্ন, রং, টাইপফেস ডিজাইনের মাধ্যমে প্রকাশিত করে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরে। এ সম্পর্কে Back Benchers অ্যাড এজেন্সির এক্সিকিউটিভ আর্ট ডিরেক্টর মোঃ আমজাদ হোসেন বলেন : "ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি হলো একটি ব্র্যান্ডের উপাদান, যেমন-রং, ডিজাইন এবং লোগো, যা ভোক্তাদের মনে ব্র্যান্ডটিকে চিহ্নিত করে এবং আলাদা করে। ডিজাইনের মাধ্যমে একটা একটি প্রতিষ্ঠান বা পণ্যের ইমেজ সৃষ্টি করে এবং ভোক্তাদের মনে একটি নির্দিষ্ট চিত্র গড়ে তোলে।" (সাক্ষাৎকার : ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২২, বিকেল ৫:৩৫ মিনিট)।

চিত্র ৫৭ : বাংলাদেশের হস্ত ও কারুশিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'আড়ং'-এর পণ্য ব্র্যান্ডিং ও বিজ্ঞাপন নকশা
(সূত্র : www.aarong.com/my-aarong-rewards)

চিত্র ৫৮ : Apple Inc.-এর ব্র্যান্ডিং
(সূত্র : https://thesocialgrabber.com/brand-identity-and-elements-of-apple)

চিত্র ৫৮ : Apple Inc.-এর ব্র্যান্ডিং
(সূত্র : https://thesocialgrabber.com/brand-identity-and-elements-of-apple)

চিত্র ৫৮ : Apple Inc.-এর ব্র্যান্ডিং
(সূত্র : https://thesocialgrabber.com/brand-identity-and-elements-of-apple)

চিত্র ৫৮ : Apple Inc.-এর ব্র্যান্ডিং
(সূত্র : https://thesocialgrabber.com/brand-identity-and-elements-of-apple)

আজকাল অনেক প্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ অফিসে ব্যবহৃত সামগ্রীতে তাদের লোগো, চিহ্ন ও টাইপফেস এবং রং ব্যবহার করে নান্দনিক নকশার মাধ্যমে নিজস্ব ব্র্যান্ডিং-এর একটা আবহ তৈরি করতে দেখা যায়। যেমন-অফিস ইন্টেরিয়র থেকে শুরু করে পেপার ওয়েট, কলম, নোট বুক, চায়ের কাপ, ইত্যদি। তাছাড়া অতিথিদের জন্য কোম্পানির পক্ষ থেকে উপহার হিসেব যেসব সামগ্রী দেয়া হয় সেসবেও নিজস্ব ব্র্যান্ডিং পরিচয় প্রকাশ পায়। যেমন-কফি মগ, টি-শার্ট, ক্যালেন্ডার, ডায়ারি, নোট বুক, কলম ইত্যাদি।

উপসংহার

আলোচিত গ্রাফিক ডিজাইনের দুটি অনুষঙ্গ 'লোগো' এবং 'ব্র্যান্ডিং' বর্তমানে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত, যা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এমনভাবে মিশে রয়েছে, যেখানে একটি অপরটির পরিপূরক। কারণ একদিকে 'লোগো'র রয়েছে স্বতন্ত্র এক পরিচিতি, অন্যদিকে লোগো নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড পরিচয়ের ভিত্তিস্বরূপ, যা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কার্যকলাপ থেকে নিজস্ব বিষয়বস্তুকে পৃথক করে দর্শকের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করে। এই দুটির মাধ্যমে মানুষ তার প্রয়োজনীয় তথ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। বলা যায়–যেহেতু 'লোগো' এবং 'ব্র্যান্ডিং' আধুনিক জীবনের ব্যবহারিক ও ব্যক্তিগত নানা শাখায় মিশে আছে ভিন্ন ভিন্ন অনন্য এক মাত্রায়। সুতরাং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রাফিক ডিজাইনের এই মাধ্যমের চিহ্নিত ভাষা উন্নত করা অত্যন্ত প্রয়োজন; যার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্র হবে আরও নান্দনিক ও শৈল্পিক, সমাদৃত হবে আরও স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে।

তথ্যসূত্র

আব্দুস সাত্তার (১৯৮৯)। শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি। রওশন আরা বেগম। ঢাকা।

নির্মাল্য নাগ (১৯৯২)। শিল্পচেতনা। দীপায়ন, কোলকাতা, ভারত।

মাকসুদুর রহমান (২০১৪)। বাংলাপিডিয়া। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

Alina Wheeler (2009). Designing Brand Identity. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Published simultaneously in Canada.

English-Bangla Dictionary (2012), Bangla Academy.

Kevin Budelmann, Yang Kim & Curt Wozniak (2010). Brand Identity Essentials. Published Rockport Publishers, China.

Liz Maquiston & Barry kitts (1987). Graphic Design Source Book. Published by Chartwell Books Inc. USA.

Steven Heller (2014) Design Genius. published by Bloomsbury Publishing, London, United Kingdom.

Terence Dalley (ed) (1980). The Complete Guide to Illustration and Design techniques and materials: Published by Chartwell Books Inc. USA.

https://www.pratiborton.com

https://99designs.com/blog/tips/types-of-logos/

https://www.designhill.com/design-blog/stuck-with-logo-design-crucial-tips-to-overcome-creative-block

https://topdesignfirms.com/logo-design/blog/abstract-logo

logos-world.net

https://www.merriam-webster.com › dictionary › emblem

https://vimeo.com/140774260

https://4cdesignworks.com/

https://blog.logomyway.com/history-amazon-logo-design

https://www.aarong.com/my-aarong-rewards

https://www.freepik.com/vectors/brand-identity-mockup

https://99designs.com/blog/tips/types-of-graphic-design/

গ্রাফিক ডিজাইনে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে গ্র্যাজুয়েটদের কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোঃ ইসরাফিল প্রাং*

সারসংক্ষেপ : *মানবসভ্যতা বিনির্মাণে শিক্ষা অপরিহার্য একটি মৌলিক উপাদান। যুগের চাহিদা বিবেচনায় শিক্ষার গতিপ্রকৃতি বিভিন্ন ধারা-উপধারায় বিভক্ত হয়ে প্রসারিত হয়েছে। শিল্পশিক্ষা সেই ধারাবাহিকতার একটি অতি প্রয়োজনীয় একটি ধারা। চিত্রকলাকে বলা হয় মানুষের প্রথম দৃশ্যগত ভাষা। দৃশ্যগত ভাষা বা এই শিল্পশিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সৃজনশীল এই শিক্ষাক্ষেত্রটি নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। গ্রাফিক ডিজাইন তারই একটি অন্যতম অংশ, যা অতি প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় বিষয়। প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বব্যবস্থায় গ্রাফিক ডিজাইনের আধুনিক প্রতিরূপ হলো (Visual Communication) দৃশ্যগত যোগাযোগের শিল্পকলা। প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সমন্বয়ে গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে যুগোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এখন অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে ১৬৫টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও বর্তমানে পাঁচটি সরকারি এবং তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের পাশাপাশি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক কর্মক্ষেত্রে দক্ষ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রাফিক ডিজাইনারের চাহিদা অনেক। এর বিপরীতে আমাদের দেশে গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের এই গ্র্যাজুয়েটদের পদচারণা যথেষ্ট নয়। সংখ্যা সীমিত হলেও তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে সুনাম অক্ষুন্ন রেখে চলেছেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে গ্র্যাজুয়েটদের সরব ও সক্রিয় উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার পরিসর বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এর কর্মক্ষেত্রের সমস্যা ও সম্ভাবনার নানান দিক অনুসন্ধান ও চিহ্নিত করা হয়েছে।*

*সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা (Introduction)

মানবসভ্যতার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। শিল্পের ইতিহাসের সময়কাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে বলা কঠিন। পৃথিবীর জন্ম ৪.৫৩৪ বিলিয়ন বছর হলেও আমরা জৈবিক সচেতনতা ও সচেতন মানবসভ্যতার অস্তিত্ব খুঁজে পাই প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের মধ্য দিয়ে। আদিম উৎপত্তি থেকে সভ্য রাষ্ট্রের দিকে মানব প্রজাতির যাত্রা এবং মানুষের ভাগ্যের উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা। প্রাথমিক পর্যায়ে যোগাযোগের মাধ্যম হলো শব্দের প্রয়োগ। আদিম উৎপত্তি থেকে শুরু করে দীর্ঘ বিবর্তনীয় পথ ধরে কথা বলার সীমাবদ্ধতা থেকেই শব্দের উৎপত্তি। (Maggs, 1998 : 4)

মানুষের স্মৃতির ভ্রান্ততা/ভ্রষ্টতা কিংবা অভিব্যক্তির তাৎক্ষণিকতা যা-পরিকল্পনা, সময় বা স্থান অস্পষ্ট হয়ে সময়ের সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায়। ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতায় অর্জিত জ্ঞান ও ভবিষ্যৎ চিন্তার অভিব্যক্তি স্থায়ীকরণের জন্যই পরবর্তীকালে শব্দ থেকে চিহ্ন ও চিত্রের প্রকাশ ঘটেছিল বলে ধারণা করা হয়। যার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় আদিম গুহাচিত্রে। ধারণা করা হয় ছবি আঁকা ও চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়াই মানুষের দৃশ্যমান প্রথম চাক্ষুষ যোগাযোগ ব্যবস্থা। আফ্রিকাতে পাওয়া প্রাথমিক মানুষের চিহ্নগুলো দুই লক্ষ বছরেরও বেশি পুরোনো। প্রারম্ভিক পালিওলিথিক থেকে নিওলিথিক সময়কালে (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০০ অব্দ-৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) গুহাচিত্রে চিহ্নগুলো রচিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। প্রথম দিকে আফ্রিকান এবং ইউরোপিয়ানরা যেসব গুহায় চিত্রগুলো অঙ্কন করেছিল সেসবের মধ্যে স্পেনের আলতামিরা এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের লাসকাক্স গুহা উল্লেখযোগ্য (Maggs, 1998: 5)।

আদিম চিত্রগুলোতে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের যে প্রাথমিক অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে তা কিন্তু শিল্প রচনার জন্য চিত্রিত হয়নি; দৃশ্যগত যোগাযোগের সূচনাপর্বে গুহাচিত্রগুলোতে উপজীব্য হয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার অনুষঙ্গ, উপযোগিতা এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি। চিত্রে বর্শা চিহ্নের উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় প্রাণীর উপর ক্ষমতা অর্জন ও শিকারে সফলতা অর্জনের জাদুকরী আচার। তার সাথে যুক্ত হয়েছে বিন্দু, বর্গক্ষেত্র, রেখা এবং বিভিন্ন আকারসহ বিমূর্ত জ্যামিতিক চিহ্ন। যা চিত্রে প্রাণীদের সাথে মিশে গিয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে মানুষের

সকল আকাঙ্ক্ষার। এভাবেই সমগ্র বিশ্ব তথা আফ্রিকা থেকে উত্তর আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা থেকে নিউজিল্যান্ডের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত চিত্রিত হয়েছে অসংখ্য পেট্রোগ্লিফ ও আইডিওগ্রাফ। যেগুলো পাথরে খোদাই বা আঁচড়ানো চিহ্ন বা সাধারণ চিত্র, যা মানুষের বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করা প্রতীক বা উচ্চতর পর্যবেক্ষণ এবং স্মৃতির প্রমাণ বলে মনে করা হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দক্ষিণ ফ্রান্সের লরথেটের গুহায় পাওয়া খোদাই-করা Raindeer Antler (বলগা হরিণের শিং)। এখানে হরিণ ও সামনের আঁচড়যুক্ত রেখা যতটা গুরুত্বপূর্ণ তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো অভ্যন্তরীণ চিহ্নসহ দুটি হীরার ফম, যা প্রাথমিক প্রতীকের অবকাঠামো বলে বিবেচিত হয়েছে। এ ধরনের চিত্র বা চিহ্নগুলোতে মূল চরিত্র বজায় থাকুক বা না থাকুক শেষ পর্যন্ত এটি আদিম মানুষের প্রাথমিক ভাষার দৃশ্যমান প্রতিরূপ হিসেবেই উদ্ভাসিত হয়েছে। (Maggs, 1998 : 5)

ভাষার দৃশ্যমান প্রতিরূপ হলো 'চিত্র'। আর এই চিত্র যখন মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও চাওয়া-পাওয়ার প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে চিত্রিত হয় তখনই তা শিল্পরূপ ধারণ করে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিল্প হাজারো শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হয়েছে। শিল্পশিক্ষার অনেক শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান থাকলেও বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে শিল্পশিক্ষায় গ্রাফিক ডিজাইন আজ একটি অন্যতম পাঠ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। অথচ গ্রাফিক ডিজাইনের উচ্চশিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বাংলাদেশে খুবই সীমিত বা যৎসামান্যই বলা চলে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক শিক্ষার্থীর মাঝে সুকুমার কলায় শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রসারিত হচ্ছে শিল্পবাজার। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিসংখ্যানের দিকে একটু চোখ ফেরালেই তা দেখা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশে মোট ১৬৫টি বিশ্ববিদ্যালয় (৫৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৩টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়) থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ রয়েছে (ইউজিসি ওয়েবসাইট : ২০২২)। উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীকে গ্রাফিক ডিজাইনে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান করলেও অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো সেভাবে গ্র্যাজুয়েশন

ডিগ্রি প্রদান করতে পারেনি। দুই-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর তিন-চারটি শিক্ষাবর্ষে হাতে গোনা কিছু শিক্ষার্থীকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। অপেক্ষাকৃত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো কোনো গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান করতে পারেনি। পক্ষান্তরে দেশে হাতেগোনা চার-পাঁচটি আর্ট কলেজ থাকলেও সেসব কলেজে গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে জ্ঞান চর্চার তেমন সুযোগ নেই বললেই চলে। কর্মক্ষেত্রের পরিধি এবং সম্ভাবনাময় বাস্তবতার কথা চিন্তা করলে এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

ঢাকার বর্তমান চারুকলা অনুষদে ১৯৪৮ সাল থেকে গ্রাফিক ডিজাইনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হলেও এর প্রসার ঘটে স্বাধীনতা-উত্তরকালে। শিল্পশিক্ষার চারণভূমিতে বেড়ে ওঠা শিল্পী কামরুল হাসান, কাইয়ুম চৌধুরী, রফিকুন্নবী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান প্রমুখ দেশবরেণ্য শিল্পীর হাত ধরে আজকের গ্রাফিক ডিজাইনের উর্বর ভূমি সৃষ্টি হলেও গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে তাঁরা যতটা প্রতিষ্ঠিত, তার চেয়ে শতগুণে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন চিত্রশিল্পী সত্তায়। আবার গ্লোবাল কমিউনিকেশনে অতীতের অবদান এবং বর্তমানের সুশিক্ষিত গ্রাফিক ডিজাইনারদের সাফল্য সঠিক পন্থায় উপস্থাপিত হচ্ছে না বা উপস্থাপন প্রক্রিয়ায় সক্ষমতার অভাব দেখা যায়। ফলে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইনের স্বতন্ত্র সত্ত্বা প্রতিষ্ঠা লাভ সেই অর্থে হয়নি। বিশ্ববাজারে ডিজাইনাররা যথাযথভাবে যুক্ত হতে পারছেন না বলেই আজ 'টপ টুয়েন্টি' বা 'টপ হান্ড্রেড ডিজাইনার ইন বাংলাদেশ'-এ চারুশিল্পে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত কোনো শিল্পীর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ হিসেবে এখানে উল্লেখ্য যে, গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে পারছেন না বা এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। যদিও প্রতিনিয়তই সংকুচিত হচ্ছে দেশীয় কর্মসংস্থানের স্থিতিশীলতা। অথচ গ্রাফিক ডিজাইনে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ বর্তমানে দিনদিন বাড়ছে। শুধু যুগোপযোগী উচ্চশিক্ষার সুযোগ না থাকার কারণে আগ্রহীরা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছেন। অপরদিকে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের চাপে অনেক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ডিগ্রি অর্জনের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানহীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুই-

তিন মাস কম্পিউটার ট্রেনিং সম্পন্ন করে তথাকথিত গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার আপ্রাণ চেষ্টায় অবতীর্ণ হচ্ছেন।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of the Research)

গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের কর্মক্ষেত্র, সক্ষমতা, সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা এবং সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য করণীয় নির্ধারণই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উচ্চতর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। দিনদিন সংকুচিত হচ্ছে সরকারি-বেসরকারি কর্মক্ষেত্র। প্রতিদিন বাড়ছে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা। সীমিত সুযোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশে যে হারে প্রতিবছর উচ্চ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হচ্ছে, সে হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। বাড়ছে না প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সুযোগও। কর্মসংস্থানেরক্ষেত্রে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের যে দায়বদ্ধতা কমছে নাকি বাড়ছে? এ দুটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে রেখে বর্তমান বাস্তবতার আলোকে এ প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশে নিম্নল্লিখিত আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলনও গবেষণার মূল লক্ষ্য।

ক) গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের প্রফেশনাল দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন;

খ) শিল্পশিক্ষায় আগ্রহী শিল্পানুরাগীদের গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

গ) বৈশ্বিক চাহিদার বিপরীতে গ্রাফিক ডিজাইন শিক্ষায় পেশাগত সক্ষমতা অর্জন;

ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রফেশনাল দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে সার্বিক মানব সম্পদ উন্নয়ন;

ঙ) বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাফিক ডিজাইন শিক্ষাপদ্ধতির সার্বিক উন্নয়ন।

পটভূমি (Background of the Study)

ঢাকা ১৬০৮ সালে বাংলার রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন মুর্শিদাবাদে। শতাব্দীকালীন সময়ে ঢাকায় মোঘল শিল্পকলার প্রভাব থাকলেও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প শিক্ষালয় গড়ে ওঠেনি।

বিভিন্ন জাতিসত্তার অধীনে ভারতবর্ষ শাসিত হলেও সর্বশেষ ১৮৫৮ সালে ইংরেজ দখলদারিত্বের মধ্য দিয়ে একচেটিয়া বাণিজ্য ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনাতে ইউরোপীয় বণিকরা এ অঞ্চলে আসতে শুরু করে। কোম্পানি শাসনের শুরু থেকে অনেক ভাগ্যান্বেষী, গুণিজন, শিল্পীরা আসতে থাকেন। তাদের সংস্পর্শেই বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল তথা বঙ্গদেশ হয়ে ওঠে আধুনিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। শিল্পী টিলি কেটলকে (১৭৬৯-১৮৫০) দিয়ে ভারতে প্রথম যাত্রা শুরু হয় ইউরোপীয় শিল্পীদের। ১৭৭০-১৮৫০ পর্যন্ত জোফানি (১৭৮৩-৮৯), আর্থার ডেভিড (১৭৮৫-৯৫), জন স্মার্ট (১৭৮৫-৯৫), ওজিয়াস হামফ্রি (১৭৮৫-৮৭), স্যামুয়েল অ্যান্ড্রুজ (১৭৯১-১৮০১), ডায়না হিল (১৭৮৬-১৮০৭), উইলিয়াম হজেস এর মতো গুণী শিল্পীদের আগমনে তৎকালীন শিল্পশৈলীর অনুপ্রেরণায় স্থানীয় যে শিল্পরীতি চালু হয়েছিল তা মুর্শিদাবাদ রীতি নামে পরিচিত। শিল্পকলাকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণের প্রথম পরিকল্পনা শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর (বিনোদবিহারী, ২০১৬ : ১০৮)। ইংরেজ শিল্পীদের আগমনে সংমিশ্রিত শিল্পধারা রচিত হাওয়ায় দেশীয় কারিগর ও শিল্পীদের শিল্প তথা জীবনমুখী কারুশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। দ্বন্দ্ব শুরু হয় সহজলভ্য শিল্পের সাথে।

১৮৫৪ সালের ১৬ই আগস্ট কোলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এই অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা শুরু হয়। ১৮৬৪ সালের ২৯শে জুন ইংরেজ শিক্ষক এইচ এইচ লক অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অধ্যক্ষ লক শিল্পশিক্ষাকে ফাইন আর্ট এবং অ্যাপ্লাইড আর্ট এই দুই ভাগে ভাগ করে তিনি পাশ্চাত্য আদর্শ ও উপকরণে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। প্রথমে মাত্র ১৩ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে এই শিক্ষা যাত্রা শুরু করে। তাঁর মৃত্যুর পর এম. শুয়ামবার্গ, ও. গিলহার্ডি ও ডব্লু.এইচ. জবিনস এর মতো

অধ্যক্ষের হাতে শিল্পশিক্ষার সামান্য পরিবর্তন হলেও আর্টস্কুলের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আসে অধ্যক্ষ ই.বি. হ্যাভেল-এর হাত ধরে। তিনিই প্রথম স্থানীয় কুটির শিল্পের সাথে দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং বিশ্বাস করেন স্থানীয় শিল্পের জাগরণ ছাড়া বৃহত্তর শিল্প বিকাশ সম্ভব নয়। হ্যাভেলের পরিকল্পনায় পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষা কিছুটা সংকুচিত হলেও ফ্রেস্কোর মতো বিষয়ের পাশাপাশি চালু করেন প্রাচ্যদেশিয় রীতি, ডিজাইন ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে বিক্ষুব্ধ তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রণদাশগুপ্তের নেতৃত্বে পুরোনো আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয় জুবলি আর্ট স্কুল। ই.বি হ্যাভেল তার শিল্পযুদ্ধে পাশে পান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তাঁর অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে অসুস্থতাজনিত কারণে হ্যাভেল ভারত ত্যাগ করার আগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ই.বি হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নতুন শিক্ষানীতি 'বেঙ্গল স্কুল' বেঙ্গল শিল্পধারা নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষের ক্রমধারায় অবিভক্ত বাংলার পূর্বাংশ অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে শিল্পচর্চার পটভূমি তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার যাত্রা শুরু ১৯৪৮ সালে। যার নেতৃত্বে ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। এমন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সকল মহলে প্রচারিত হলেও প্রথম শিল্পচর্চার ক্ষেত্রভূমি রচিত হয় খুলনার মহেশ্বরপাশায় ১৯০৪ সালে। খুলনার দৌলতপুর থানার মহেশ্বরপাশা গ্রামের শশীভূষণ পাল 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট' নামে নিজ বাড়িতে গোলপাতার ঘরে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম এই স্কুলের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে ১৯১৮ সালে তৎকালীন গভর্নমেন্ট আর জেলা বোর্ড থেকে স্কুলের নামে অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি আরও স্থায়ী ও নিয়মিত হয়। মহেশ্বরপাশা আর্ট স্কুলের প্যাডে ১৪.০৩.১৯৭৫ তারিখে জয়নুল আবেদিন উল্লেখ করেন, 'যুক্ত বাংলাদেশে কোলকাতা আর্ট কলেজের পরে একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান'। একই তারিখে স্বাক্ষরিত ড. নীলিমা ইব্রাহিম মন্তব্য লেখেন, ''বাংলাদেশে এটি প্রাচীনতম চারু ও কারুকলা বিদ্যালয়। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এই বিদ্যালয়টিকে টিকিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন।''(নজরুল, ১৯৮৮ : ২২)

দরিদ্র পরিবারে জন্ম হলেও শিল্পী শশীভূষণ পাল শৈশব থেকেই শিল্পসাধনায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। কোলকাতা কেন্দ্রিক শিল্পচর্চার বলয়ে শশীভূষণ যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর যোগ্য আসন পাননি। এর কারণ প্রান্তিকের প্রতি কেন্দ্রের উপেক্ষা। খুলনার একজন শিল্পী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী কোলকাতায় যে শিল্প বলয় তৈরি হয়েছিল তাতে গৃহীত হননি। শশীভূষণের নাম বাংলাদেশের ইতিহাসের সাংস্কৃতিক অধ্যায়ে তেমনভাবে উল্লেখিত নয়। কারণ ইতিহাসবেত্তারাও মহাসড়ক ধরে চলেন, ভুলে যান তারা আলপথ ধরে পল্লিগ্রামের শিল্পসৃষ্টির তাৎপর্য উপলব্ধির কথা। (মইনুদ্দীন, ২০২১ : ৬৪)

শিল্পী শশীভূষণ পাল নিজ গ্রামে প্রথমে গ্রামীণ সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নান্দনিক শিল্পবোধ জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে কর্মসংস্থানে তাদের যোগ্য করে তৈরি করাই ছিল তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য (শেখ সাদী, ২০২১ : ১০)। যুক্ত বাংলায় এটি চতুর্থতম শিল্পশিক্ষালয়। ১৮৩৯ সালে মেকানিক্স ইনস্টিটিউট পরে ১৮৫৪ সালে স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট, ১৮৬৫ সালে সরকারিকরণে 'গভার্ণমেন্ট স্কুল অফ আর্ট' নামে নামকরণ করা হয়। পরবর্তীকালে প্রতিবাদী শিল্প শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের পটভূমিতে ১৮৯৭ সালে রণদাশগুপ্তের নেতৃত্বে 'দা জুবলি আর্ট একাডেমি' প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার পটভূমি রচিত হয়। মহেশ্বরপাশা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় চারুকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কলাভবন।

জয়নুল আবেদিন যখন শৈশবে, শশীভূষণ পাল তখন শিল্প খ্যাতির শীর্ষে। উপনিবেশিক আমলে তিনিই একমাত্র শিল্পচর্চায় অবদানের জন্য 'রায় সাহেব' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর খ্যাতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজন্যবর্গের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। শশীভূষণ ও জয়নুলের শিল্প আন্দোলন এই উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন। শশীভূষণের শিল্পী খ্যাতি অর্জিত হয় ব্রিটিশ কলোনিয়াল পৃষ্ঠপোষকতায় আর জয়নুলের খ্যাতি আসে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বদেশি চেতনা জাগ্রত হয়। শশীভূষণ পাল ও জয়নুল আবেদিন পূর্ববঙ্গের দুই পথিকৃৎ শিল্পী। বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং লালনই তাঁদের মৌলিক শিল্পাদর্শ। শশীভূষণ পালের জীবদ্দশায় আর্ট স্কুলটি

তাঁর পরিবারের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর ছাত্র সুরেন্দ্রনাথের কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি ভারতে চলে যান। তারপর থেকে কার্যত স্কুলটি বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ধাবিত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। স্বাধীনতা-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী শিল্পকলা বা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের চেয়ে বৈষয়িক বিষয়াদির দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ফলে তৎকালীন কোলকাতা আর্ট স্কুলের যাবতীয় বিষয়াদির তালিকা আর্ট স্কুলের শিক্ষক জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ ও কামরুল হাসানের হাতে হলেও তারা ঢাকায় খালি হাতেই ফিরে এসেছিলেন। ঢাকায় ফিরে তাঁরা তাঁদের যোগ্য পেশা নির্ধারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। অবশেষে বাধ্য হয়েই জয়নুল আবেদিন ও আনোয়ারুল হক ঢাকায় সাধারণ স্কুলের শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হন। শফিকুল আমিন টিচার্স ট্রেনিং কলেজে, সফিউদ্দীন আহমেদ কলেজিয়েট স্কুলে আর হাবিবুর রহমান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যোগ দেন। এভাবেই বয়সে তরুণ প্রতিভাবান শিল্পীবৃন্দ বিশেষ করে জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান তৎকালীন বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, উৎসাহী সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায় ঢাকায় ১৯৪৮ সালে 'গভর্ণমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট' নামে আর্টস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। (বুলবন, ১৯৭৮ : ৯)। এই পর্বে শিল্পশিক্ষাকে 'ফাইন আর্ট' এবং 'কমার্শিয়াল আর্ট' নামে দুটি বিভাগে বিভক্ত করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করা হয়।

১৯৪৮ সালে চারুকলা প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৩-৫৬-এর মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রতিভাধর শিল্পী বেরিয়ে এসেছেন। তাঁরাই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে অগ্রদূত হিসেবে পরিচিতি পান। এদের মধ্যে সৈয়দ শফিকুল হোসেন, হামিদুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, মুর্তজা বশীর, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুর রউফ, আব্দুল বাসেত, রশীদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, আবু তাহের ও মীর মুস্তাফা আলী অন্যতম। (বুলবন, ১৯৭৮ : ১২)। ১৯৫৮ পর্যন্ত গোটা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে একটা প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন বিরাজ করছিল। এর আগে বেশ কিছু শিল্পী শিক্ষক আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে

শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। যেমন–মোহাম্মদ কিবরিয়া ও সফিউদ্দীন আহমেদ ছাপচিত্রে, আব্দুর রাজ্জাক ভাস্কর্যে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সেসব বিষয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ফলশ্রুতিতে গ্রাফিক্স (ছাপচিত্র, ১৯৫২), প্রাচ্যকলা (১৯৫৫), মৃৎশিল্প (১৯৬১), ভাস্কর্য (১৯৬৫), কারুশিল্প (১৯৬৭)-র মতো নতুন নতুন বিভাগের সৃষ্টি হয়। (বুলবন, ১৯৭৮ : ১৩)।

১৯৭১ সালে 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ঢাকা'কে বাংলাদেশের রাজধানী করা হলে দেশের সার্বিক শিল্পশিক্ষার গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে খুলনায় 'খুলনা আর্ট কলেজ' নামে শিল্পশিক্ষা পুনরুজ্জীবিত হয়। পরবর্তীকালে 'রাজশাহী আর্ট কলেজ' এবং পরে 'চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্পকলায় উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন গতিপথ সৃষ্টি হয়।

গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

উক্ত গবেষণাপত্রটি মিশ্র পদ্ধতিতে-সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং গুণবাচক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। গবেষণাপত্রটি সাক্ষাৎকার, জরিপ, পর্যবেক্ষণ এবং দ্বৈতয়িক বা সেকেন্ডারি উৎসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন জার্নাল, বই, ওয়েবসাইট এবং অভিসন্দর্ভকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ থেকে ২০০১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত পাশ করা ৪৫০ জন গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে ৯৩ জন গ্র্যাজুয়েটকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্ত-মারিয়ম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি এবং ইউডা বিশ্ববিদ্যালয়। এসব গ্র্যাজুয়েটের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রশ্নমালা প্রদানের মাধ্যমে।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

'গ্রাফিক ডিজাইন' কী? তা নিয়ে আলোচনা করার শুরুতেই 'শিল্প' সম্পর্কে আলোচনা জরুরি। কেননা মোটাদাগে শিল্প বলতে যা বোঝায় তার সাথে গ্রাফিক ডিজাইনের তাত্ত্বিক মেলবন্ধন প্রয়োজন।

শিল্প (Art)

'Art' শব্দটি শুনলেই সাধারণত সবার চোখে ভেসে ওঠে বিশ্বখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি 'মোনালিসা', 'গুয়ের্নিকা', 'দি পার্সিসটেন্স অব মেমোরি', 'দি ক্রিয়েশন অব অ্যাডাম', 'সানফ্লাওয়ার', 'লাস্টসাপার'-এর মতো বিশ্বনন্দিত কিছু চিত্রকর্মের প্রতিচ্ছবি। অথবা আত্মপ্রকৃতি ও দৈনন্দিন জীবনের চিত্রমালা। যেমন–প্রতিকৃতি, গ্রামের দৃশ্য, নদী-নৌকার দৃশ্য ইত্যাদি।

শিল্প কীভাবে গঠিত হয় তার কোনো সর্বসম্মত সংজ্ঞা নেই। শিল্পের ব্যাখ্যা ইতিহাস এবং সংস্কৃতি জুড়ে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে 'Art'-এর প্রাথমিক ধারণাটি পুরোনো একটি ল্যাটিন অর্থের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যা অনুবাদ করলে মোটামুটিভাবে অর্থ দাঁড়ায় 'দক্ষতা' বা 'নৈপুণ্য'। যেটি 'কারিগর' শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যেকোনো বিষয়ের উপর দক্ষতাকেই শিল্প বলা হতো।

খ্যাতিমান রুশ লেখক লিও টলস্টয়ের মতে "মানুষের সকল সৃষ্টিই শিল্প।"

মোটাদাগে শিল্পকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়–১) ফাইন আর্ট বা চারুশিল্প, ২) অ্যাপ্লাইড আর্ট বা ব্যবহারিক শিল্প।

১) ফাইন আর্ট বা চারুশিল্প :

যে শিল্প শুধু মনের ক্ষুধা মেটায় অথচ আমাদের প্রাত্যহিক বা ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যক্ষ কোনো কাজে আসে না এমন শিল্প ফাইন আর্ট বা চারুশিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। মানুষ যখন তার মনের সৌন্দর্য বা অভিব্যক্তির উপস্থাপন/দৃশ্যমান করে থাকে তখন মানবমনে আত্মতৃপ্তি, সুখ-দুঃখের আত্মব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। আর

এই আপেক্ষিক পরিপূর্ণতাই হলো ফাইন আর্টের মূল কার্যকারিতা। যেমন–পেইন্টিং, ভাস্কর্য, গান, নাচ, অভিনয় ইত্যাদি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব না রাখলেও প্রশান্তি, দুঃখ-ব্যথা, স্মৃতি-বিস্মৃতি ইত্যাদি আবেগে আপ্লুত করে তোলে।

২) অ্যাপ্লাইড আর্ট বা ব্যবহারিক শিল্প :

প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন সকল শিল্প হলো 'অ্যাপ্লাইড আর্ট' বা ব্যবহারিক শিল্প। এই শিল্প সৃষ্টি হয় মূলত ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে। অর্থাৎ ব্যবহারিক উপযোগিতা এবং গ্রাহক/অংশীদারদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে এ শিল্পের প্রধান প্রেক্ষাপট রচিত হয়। যেখানে সমাজ-সামাজিকতা, শ্রেণি-পেশা, সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা গ্রাহক ও দর্শকের রুচি-অরুচি, চাহিদা, তৃপ্তি বিবেচনায় রেখে নান্দনিক সৌন্দর্য আরওপিত হয়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, ফাইন আর্ট ব্যতীত পৃথিবীর তাবৎ শিল্পই অ্যাপ্লাইড আর্টের অন্তর্গত। গ্রাফিক ডিজাইন সকল শিল্পধারার অন্যতম একটি প্রবাহ। ব্যবহার উপযোগিতার ধরনভেদে এ শিল্পকে হাজারো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন–কারুশিল্প, দারুশিল্প, তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতবশিল্প, কাচশিল্প, চিকিৎসাশিল্প, সামরিকশিল্প ইত্যাদি।

গ্রাফিক ডিজাইন (Graphic Design)

'গ্রাফিক ডিজাইন'-এর আভিধানিক অর্থ 'চিত্র সম্পর্কিত নকশা'। এক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইন-এর উপযোগিতা সহজে উপলব্ধিতে আসে না। গ্রাফিক ডিজাইন-এর অন্তর্গত ব্যাখ্যা বহুমুখীনতায় প্রসারিত যা সমাজে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে। আধুনিক সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিত আপামর জনগণ এমন কেউ নেই যে গ্রাফিক ডিজাইন শব্দটির সাথে পরিচিত নয়। যদিও কখনো কখনো গ্রাফিক আর গ্রাফিক্স শব্দটি ওলটপালট হয়ে যায়, তারপরও গ্রাফিক ডিজাইনে আপেক্ষিক অভিব্যাপ্তি অভিন্নই থেকে যায়। ডিজাইন হলো মানবমনের সুনির্দিষ্ট কল্পনার দৃশ্যমান প্রতিরূপ। আর গ্রাফিক ডিজাইন হলো এমন-সব ডিজাইন যা সমাজে প্রতিটি স্তরে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ছাপা পদ্ধতি উদ্ভাবনের

পর থেকে যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই সমাজে গ্রাফিক ডিজাইনের নিত্য প্রয়োজনীয়তার ব্যাপকতা শুরু হয়। জনগণের সঙ্গে জনগণ, জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে তথ্য-নির্দেশনা, প্রচার, প্রকাশনা, যোগাযোগসহ সকল কাজেই গ্রাফিক ডিজাইনের ব্যবহার সুস্পষ্ট। গ্রাফিক ডিজাইনের প্রধান অনুষঙ্গ হলো 'আইডিয়া', 'ইমেজ' এবং 'টেক্সট'। প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান সময়ে গ্রাফিক ডিজাইনের আধুনিক প্রতিরূপ হলো Visual Communication বা দৃশ্যগত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

'গ্রাফিক' কথাটি ড্রইং, ডিজাইন ও প্রতিচিত্র সম্পর্কিত। কোনো বস্তু, বিষয় বা আইডিয়ার শৈল্পিক দৃশ্যমান কল্পনাকে নকশা বা ডিজাইন বলা হয়। কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য, পরিচয়, বার্তা, নির্দেশনা বা আইডিয়া দর্শক-গ্রাহকের কাছে আকর্ষণীয় ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য নান্দনিক দৃষ্টিনির্ভর ভাষা অনেক বেশি কার্যকর। এক্ষেত্রে ভাষা নির্মাণে টাইপোগ্রাফি ও ইমেজ প্রধান দুটি উপাদান। তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার-যেভাবে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করছে, অডিও ভিজুয়াল প্রযুক্তি এক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সহায়ক। এই ভিজুয়াল কমিউনিকেশনের কার্যকর ও নান্দনিক মাধ্যমটিই হলো গ্রাফিক ডিজাইন।(মাকসুদুর : ২০১৪)

গ্র্যাজুয়েট (Graduate)

গ্র্যাজুয়েট বলতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রফিক ডিজাইন বিষয়ে স্নাতক ডিগিপ্রাপ্তদের বোঝানো হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ (Observation and Analysis)

প্রত্যেক গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের কাছেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অসীম। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের প্রযুক্তি যেভাবে দ্রুত গতিময়তায় ধাবিত হচ্ছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অগ্রসর হতে পারছে না। বৈশ্বিক কর্মক্ষেত্রে বা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় যে পরিমাণ শিক্ষিত গ্রাফিক ডিজাইনার প্রয়োজন সে পরিমাণ সক্ষম, দক্ষ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রাফিক ডিজাইনার তৈরি করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষার ব্যাপ্তি ঘটানো যাচ্ছে না। অথবা রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা এর গুরুত্ব বিবেচনায় আনছেন না।

অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েটদের ধারণা আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পূর্বে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম এখনো সেখানেই আছি। অপরদিকে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ বিশ্ব পুরোপুরি গ্রাফিক ডিজাইনের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে এই বোধের অভাবজনীত কারণে অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে আধুনিক বিশ্ব থেকে। তারপরও অনেকের অভিমত কিছুটা হলেও গ্রাফিক ডিজাইনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত নান্দনিক শিল্পবোধ ও জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই তারা টিকে আছে। আবার কারো কারো ধারণা গ্রাফিক ডিজাইনে দক্ষতা অর্জনে প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা, শিল্পবোধ ও নিরলস জ্ঞানচর্চা। সেই সঙ্গে প্রয়োজন বাস্তবতার আলোকে নিরেদেরকে সমসাময়িক পর্যায়ে উন্নীত করার গভীর অনুশীলন।

শুধু ব্যবহারিক শিক্ষা কিংবা সফটওয়্যারের দক্ষতাভিত্তিক গ্রাফিক ডিজাইন শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ডিজাইনার হিসেবে গড়ে তোলে না। অন্য সব বিষয়ের মতোই গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রেও রয়েছে কিছু মৌলিক ও তাত্ত্বিক বিষয়, যা সময়ের সাথে সাথে অগ্রসর হচ্ছে তেমনি হচ্ছে আধুনিক। ফলে এতে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন নীতি ও তত্ত্ব যোগ হচ্ছে। গ্রাফিক ডিজাইনের এই মূল বিষয় জানা ও শেখার জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন। এমন মতের সাথে অনেকেই একমত প্রকাশ করে বর্তমান শিক্ষা পরিধি বাড়ানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ, শিল্পমান সম্পন্ন গ্রাফিক ডিজাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নেই।

স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ না জেনে যথার্থ শব্দ গঠন বা লেখা সম্ভব হয় না, তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলে গ্রাফিক ডিজাইনারও হওয়া যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত একজন ডিজাইনারের ভিত্তি তৈরি করে থাকে। ডিজাইনারের শিল্পবোধ আর দক্ষতার সংমিশ্রণে ডিজাইনের মানও বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। কারণ বাংলাদেশে উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় কর্মক্ষেত্র দুটোরই অভাব রয়েছে। অভাব রয়েছে উদার মনমানসিকতারও। কারণ কর্মক্ষেত্রগুলোর কর্তাব্যক্তিগণ স্বল্প পারিশ্রমিকে সকল বিষয়ে পারদর্শী ডিজাইনার প্রত্যাশা করেন। আর তাই তাদের

কাজের শিল্পমানের ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এগুলো তুলনামূলকভাবে মানহীন বিবেচিত হয়। গ্রাফিক ডিজাইন শিল্প বর্তমান ইন্টারেক্টিভ যুগে বিশাল অবদান রেখে চলেছে। দিনদিন যেভাবে প্রযুক্তির সর্বাত্মক ব্যবহার ও উৎকর্ষতা সাধিত হচ্ছে তাতে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর শিল্পশিক্ষার পরিসর বিস্তৃত হচ্ছে না। প্রযুক্তিনির্ভর পাঠক্রম শিল্প-শিক্ষার্থীদের নাগালে না আনতে পারলে বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইন গুরুত্ব হারাবে। বিশ্বব্যাপী এই শিল্প ভাষা ও আবেদন অত্যন্ত শক্তিশালী। যা কমিউনিকেশনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ইতোমধ্যেই বিবেচিত। উন্নত অথচ দ্রুত পরিবর্তনশীল এই কর্মমূখী শিল্প যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে এ শিল্প কোথায়, কিংবা কোনো চূড়ায় পৌঁছাবে তা কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদেরও উচিত এই একই পরিমণ্ডলে অবস্থান করা। কারণ বিশ্বজগতের সদা পরিবর্তনশীল ডিজাইন সেক্টরের অনেক কিছুই আমাদের অজানা থেকে যাচ্ছে। আর এজন্য রাষ্ট্রায়ত্ব কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় অদক্ষতা বা সাধারণ দক্ষতার বিশেষ গুরুত্ব। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইনে সৃজনশীলতা, নান্দনিকতা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট ক্যারিকুলামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রযুক্তিগত সুবিধা ও সমসাময়িক সুদক্ষ শিক্ষকের অভাবে যেটুকু হাতেকলমে শিক্ষা শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কিছুটা সুযোগ তৈরি হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। এ কারণে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যুগোপযোগী দক্ষ তারুণ্যনির্ভর দেশি-বিদেশি শিক্ষক ও প্রশিক্ষক এখন সময়ের দাবি।

চারুকলার নানা শাখা-প্রাশাখা থাকলেও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের এই যুগে পেশা হিসেবে গ্রাফিক ডিজাইন চাহিদাসম্পন্ন সম্মানজনক পেশা। এমন কোনো সেক্টর পৃথিবীতে নেই যেখানে গ্রাফিক ডিজাইন অনুপস্থিত। দিনের শুরু থেকে রাত অবধি অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় এর প্রায়োগিক পটভূমি, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সমান। ফলে গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের সরাসরি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ডিজাইন শিক্ষা যা অন্য সব অপেশাদার বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষায় যারা আগ্রহ প্রকাশ করছে তারা

অধিকাংশই শৈশব থেকেই শিল্পের প্রতি অনুরক্ত থাকে। যদিও অনেকেই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পায় না। চাহিদার বিপরীতে উচ্চতর শিক্ষার পরিসর নগণ্য বলেই প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অগণিত আগ্রহী শিল্পী। তাই প্রায় সকল গ্র্যাজুয়েটের মন্তব্য-উন্নত ও রুচিসম্মত কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার একান্ত প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর শিল্পশিক্ষার পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতিটি শিশুর সুকুমার বৃত্তিকে অনুপ্রাণিত করার বা প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করাও জরুরি। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমরা দেখি তার বিপরীত চিত্র। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় চারুকলাকে আবশ্যিক বিষয় থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আর বিসিএস ক্যাডার হবার স্বপ্নে বিভোর লাখ লাখ জিপিএ ৫.০০ পাওয়া শিক্ষার্থী সমাজে ঘুরছে জীবনের অজানা গন্তব্যের সন্ধানে। এক্ষেত্রে চাইলেই চারুকলাসহ অপরাপর সৃজনশীল ও প্রযুক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যুক্ত করা যেতে পারে। যেন সার্টিফিকেট-নির্ভর কর্মক্ষেত্রের বাইরে নিজের কর্মপরিধি নির্মাণ করতে ভূমিকা রাখে।

ফলাফল (Results)

প্রতিবন্ধকতা (Challenges)

দেশের গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের কর্মক্ষেত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতা বাড়ছে। এর মূল কারণ আবার প্রযুক্তির সহজলভ্যতা। গ্রাফিক ডিজাইনে স্বল্প সময়ে অনেকেই কোর্স করে ডিজাইনার হিসেবে কাজ করছেন। আর ওদিকে অসাধু ব্যবসায়ীরা গ্রাফিক ডিজাইনের সার্টিফিকেট বিক্রি করে বাজার নষ্ট করছেন। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের ডিজাইনাররা কম পারিশ্রমিকে কাজ করে বাজারে শিল্পবোধসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট গ্রাফিক ডিজাইনারদের চাহিদা নষ্ট করে চলেছেন।

গ্রাফিক ডিজাইনের মতো সৃজনশীল বিষয়ের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব, নিয়োগকর্তাদের অজ্ঞতা বা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ শিল্পবোধের অভাব। একজন গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা জীবন শেষ করে কোনো একটি কর্পোরেট কোম্পানিতে ডিজাইনার হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে মালিক/উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/সংশ্লিষ্ট ব্র্যান্ড ম্যানেজার সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার একজন ব্যক্তি। যিনি ডিজাইনের ধরন ও শিল্পমান বিবেচনা করেন নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের ভিত্তিতে। নান্দনিক শিল্পবোধ, ব্র্যান্ডের ভ্যালু, পরিবেশ-পারিপার্শিকতা সেখানে উপস্থিত থাক বা না থাক তাতে তার কিছু আসে-যায় না। এক্ষেত্রে সাইকোলজিক্যাল ইমব্যালেন্স তৈরি হয়। যা ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের ডিজাইনে বা সৃজনশীল কর্ম সম্পাদনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গতানুগতিক ডিজাইন ট্রেন্ডের বাইরে গিয়ে ডিজাইন করতে না পারার কারণে স্বতন্ত্র বা ট্রেন্ডের ডিজাইন গড়ে ওঠে না। কারণ ডিজাইনকে শুধু একটি ইমেজ, ভিডিও বা চিত্র হিসেবে গণ্য করে এর পেছনের আইডিয়া, সক্ষমতা, মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমকে গুরুত্ব না দেয়া এবং ডিজাইনারদের সৃজনশীল ব্যক্তি না ভেবে একজন কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে মূল্যায়ন করা। তাছাড়া নিয়োগকারী সংস্থাগুলো গ্রাফিক ডিজাইনে দক্ষ একজন গ্র্যাজুয়েট এবং একজন সাধারণ কোর্স সম্পন্ন করা ডিজাইনারের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারাও এর অন্যতম কারণ। গতানুগতিক ডিজাইন তৈরির আরও একটি কারণ হচ্ছে-নিয়োগকর্তা কর্তৃক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সময় তাদের গতানুগতিক চিন্তা চাপিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে কর্তৃত্বপরায়ণ মানসিকতা প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়।

গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের কর্মক্ষেত্র নির্মাণে শুধু নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠান বা করপোরেট কোম্পানিকে দায় চাপিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষালয় ব্যর্থতা এড়াতে পারে না। বাংলাদেশের সংকুচিত শিল্পশিক্ষার পরিসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগসহ যেটুকুই প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ আছে তা আবার সময়োপযোগী কি না তা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েটগণ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়ে গুরুত্ব আরওপ করেছেন। তবে কিছু কিছু গ্র্যাজুয়েট মনে করেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে যে নান্দনিক শিল্পবোধ

অর্জিত হয়েছে তা নিজেদের কর্মক্ষেত্র নির্মাণে প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। কর্মক্ষেত্রের ধরনভেদে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা বা আগ্রহ তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

২০০১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ যে তিন-চারটি বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চতর প্রতিষ্ঠান গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান করেছে তার সংখ্যা চাহিদার তুলনায় নগণ্য। এর মধ্যে ৯৩ জন গ্র্যাজুয়েটের অনলাইন সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ ডিজাইনার না পাবার ক্ষেত্রে নিম্নেল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে–

- গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে মানসম্পন্ন উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতা;
- গ্র্যাজুয়েটদের মার্কেট উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য পাঠক্রম প্রতিনিয়ত যুগোপযোগী না করা;
- গ্র্যাজুয়েটদের পেশাদারি মনোভাবের অনুপস্থিতি ও যথাযথ ওয়ার্ক প্লেসের অভাব;
- আন্তঃযোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের দুর্বলতা ও সাবলীল উপস্থাপনায় জড়তা;
- সমকালীন পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে গ্র্যাজুয়েটদের সমন্বয়ের অভাব;
- জাতীয় শিক্ষাক্রমে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে চারুকলা শিক্ষাকে নেতিবাচকভাবে মূল্যায়ন;
- শিল্পজ্ঞানহীন ভোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া;
- আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেস বা শিল্পবাজার সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অভাব;
- বাজার, ভোক্তার চাহিদা ও বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা বা তাত্ত্বিক জ্ঞানের অভাব;
- অপেশাদার এবং সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিল্পবোধহীন ডিজাইন-কর্মীদের সহজলভ্যতা;
- সক্ষমতা অনুযায়ী নিজেদের যথাযথ পোর্টফোলিও নির্মাণে অনীহা;

- অ্যাকাডেমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত শিল্পকর্ম শিল্পমানসম্মত কি না তা যথাযথ মূল্যায়নপূর্বক পরামর্শ না দেওয়া।

সম্ভাবনা (Prospects)

'চারুকলা' শব্দটি উচ্চারিত হলেই সমাজে একটি ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর তা হচ্ছে–ছবি আঁকাআঁকির এক মহাউৎসব। যারা চারুকলায় ভর্তি হবার স্বপ্ন দেখে বা আগ্রহ প্রকাশ করে তাদের অধিকাংশই ছবি আঁকবে ভেবে মনের অজান্তেই স্বপ্ন বুনতে থাকে। শিল্পালোকের সেই স্বপ্নবিলাস থেকেই উৎসারিত হয় জীবনের বাস্তবতা। বাংলাদেশের চারুশিল্পশিক্ষায় যে কয়টি ধারা বা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয় তার মধ্যে গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়টি বর্তমান বাস্তবতায় প্রধানতম জীবননির্ভর শিল্পশিক্ষা। এ শিল্পধারায় শিক্ষিত একজন শিক্ষার্থী তার নিজের মতো করে জীবন সাজাতে এবং আর্থিক সফলতা লাভ করতে পারেন। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর দুনিয়াতে একজন গ্রাফিক ডিজাইনার চাইলে শিল্পসৃষ্টির পাশাপাশি নিজেকে স্বনির্ভর করতে পারেন সহজেই। কারণ রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অবারিত হয়েছে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্র। প্রয়োজন শুধু নিজের আত্মবিশ্বাস আর নিজেকে গ্রাফিক ডিজাইনের শিক্ষার সাথে সাথে প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র বিশ্বজুড়ে উন্মুক্ত।

গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়টি এখন সবারই পরিচিত একটি পেশার নাম। জনবহুল এই বাংলাদেশে সরকারি চাকুরির সুযোগ অপ্রতুল। আর তাই আজ শিক্ষিত অথচ কর্মহীন জনগোষ্ঠী ঝুঁকে পড়ছে গ্রাফিক ডিজাইন নির্ভর পেশায়। চারপাশে চোখ ফেরালে সহজেই তা দৃশ্যমান। ফ্রিল্যান্সিং করার সুযোগ আছে বলে অনেকেই গ্রাফিক ডিজাইনের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। একজন গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েট স্বাভাবিকভাবে ডিজাইনে অনেকের থেকে বেশি জ্ঞান রাখেন। তাদের এ জ্ঞান যদি আরও অনেকের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায় তবে গ্রাফিক ডিজাইন গ্র্যাজুয়েটদের বাইরেও অনেকেই বিশ্ববাজারে ডিজাইনে বেশ ভালো অবস্থান তৈরি করতে পারে। যা বাংলাদেশের ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ বড় একটা ভূমিকা রাখবে বলে আশা

করা যায়। গ্রাফিক ডিজাইন এমন এক শিল্পশিক্ষা যা রাষ্ট্রের পাশাপাশি বেসরকারি এবং স্বকর্মসংস্থানে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

বর্তমানে গ্রাফিক ডিজাইনে দক্ষতাসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েটদের চাহিদা সর্বব্যাপী বলে এর কর্মপরিধিও ব্যাপক। যেমন–সরকারি ও বেসরকারি চাকুরিসহ ফ্রিল্যান্সিং, প্রোডাক্ট ডিজাইন, মার্কেটিং, পাবলিকেশন ডিজাইন, ব্র্যান্ডিং, পাবলিসিটি ডিজাইন, প্যাকেজিং, প্রিন্টিং প্রেস, ইভেন্ট ডিজাইন, সেট ডিজাইন, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, ফটোগ্রাফি, ইমেজ ম্যানিপুলেশন, ইন্টারেক্টিভ মিডিয়া ডিজাইন, টেক্সটাইল ডিজাইন, ফন্ট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ইউঅ্যাই/ইউএক্স ডিজাইন, ওয়েব ও অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন, গেইম ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, মোশন গ্রাফিক্স, 3D মডেলিং, কার্টুন অ্যানিমেশন, 2D & 3D ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন, ব্রডকাস্ট ডিজাইন, ফিল্ম প্রোডাকশন, ভিজুয়াল ইফেক্টস প্রডাকশন (VFX), OTT (over-the-top) প্লাটফর্ম, রেডিমেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, মোবাইল কোম্পানি, সংবাদপত্র, ফ্যাশন হাউজ, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, অলংকরণ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট করপোরেট কমিউনিকেশন, ভিজুয়াল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইত্যাদি।

সুপারিশ (Recommendations)

গ্রাফিক ডিজাইন যেহেতু সরাসরি ভোক্তা বা ক্লায়েন্টের মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনে নির্মিত হয়, তাই একজন ডিজাইনারকে ডিজাইনের মৌলিক নিয়ম অনুসরণে স্বতন্ত্র শিল্পবৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে হয়। সেই সাথে উপজীব্য বিষয়কে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হয়। বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইনে উচ্চতর শিক্ষায় গ্র্যাজুয়েটদের আত্মবিশ্বাস, কর্মক্ষেত্র, সক্ষমতা এবং সম্ভাবনা সৃষ্টিতে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা যেতে পারে–

- জাতীয় পর্যায়ে যুগোপযোগী মানসম্পন্ন উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাফিক ডিজাইন শিক্ষার প্রসার;
- শিক্ষকদের প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক ট্রেনিং, সভা-সেমিনারের সুযোগ সৃষ্টি;

- দক্ষ, বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক/খণ্ডকালীন শিক্ষক/চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি;
- গ্র্যাজুয়েটদের প্রযুক্তিনির্ভর বাজার-উপযোগী করে গড়ে তুলবার জন্য পাঠক্রম প্রতিনিয়ত আধুনিকায়ন করা;
- গ্র্যাজুয়েটদের পেশাদারী মনোভাব গঠনে গবেষণা জার্নাল, প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনার এবং ডিজাইন উৎসব আয়োজন;
- ইংরেজিসহ আন্তর্জাতিক দু-একটি ভাষাজ্ঞানের দুর্বলতা দূরীকরণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;
- শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে স্নাতক পর্যায়ে ইন্টার্নশিপ বা খণ্ডকালীন চাকুরি বাধ্যতামূলক করা;
- সমকালীন পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে গ্র্যাজুয়েটদের আগ্রহ বাড়াতে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট স্কিল অনুযায়ী ফ্রিল্যান্সিংয়ে উৎসাহিত করা;
- জাতীয় কর্মসংস্থানে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টির মাধ্যমে যথোপযুক্ত সম্মানে সম্মানিত করা;
- উচ্চতর গ্রাফিক ডিজাইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজাইনের নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র বিবেচনায় রেখে প্রফেশনাল মাস্টার্স বা সংক্ষিপ্ত কোর্স অফার করা;
- আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেস বা শিল্পবাজার সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান প্রদান;
- আন্তর্জাতিক ডিজাইন সংস্থা, ফোরামের সাথে যুগপৎ কর্মসম্পাদন চুক্তি করা;
- বাজার, ভোক্তার চাহিদা ও বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা বা তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রদান।

উপসংহার (Conclusion)

'গ্রাফিক ডিজাইন' একটি সুপরিচিত শব্দ। যোগাযোগ বা কমিউনিকেশনের সঙ্গে রয়েছে যার গভীর সম্পর্ক। এই কমিউনিকেশন মূলত ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু

করে রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, জনগণের সঙ্গে কমিউনিকেশন সৃষ্টির ক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। বর্তমান ডিজিটালাইজেশনের যুগে বাংলাদেশেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত আপামর জনগোষ্ঠীর কাছে 'গ্রাফিক ডিজাইন' শব্দটি অতিপরিচিত। গ্রাফিক ডিজাইন-এর কার্যকরণ, বিষয়বস্তু ও তার সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু সুস্পষ্ট নীতিমালা ও মৌলিক আদর্শ শিক্ষণীয় বলেই যুগ-যুগান্তর ধরে রচিত হয়েছে শিল্পশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক পটভূমি। বর্তমান কমিউনিকেশনের যুগে অত্যাবশ্যকীয় জীবনমুখী ও সৃজনশীল সম্মানজনক পেশা হিসেবে গ্রাফিক ডিজাইন গুরুত্বপূর্ণ। শুধু দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক ডিজাইনারগণ সর্বজনীনভাবে সমাদৃত। গ্রাফিক ডিজাইন তথা ডিজাইনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা প্রায়োগিক বাস্তবতার কারণেই আজ আলোকিত। এই বিবেচনায় জীবনমুখী শিক্ষার প্রয়োজনে গ্রাফিক ডিজাইনের মৌলিক জ্ঞানসমৃদ্ধ উচ্চশিক্ষার প্রসার এখন সময়ের দাবি। এতে রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তি মালিকানায় যৌক্তিক কর্মসংস্থান বাড়বে, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করবে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র। বৈশ্বিক পরিসরে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ব্যাপ্তি ঘটবে, সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে দৃশ্যমান অবদান রাখবে।

তথ্যসূত্র (References)

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (২০১৬)। চিত্রকথা। অরুণা প্রকাশনী, ঢাকা।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্ড কমিশন ওয়েবসাইট। http://www.ugc-universities.gov.bd/cbhe (প্রবেশ ২১শে মে ২০২২, ০২:২৭টার সময়)

বুলবন ওসমান, "বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের উন্নয়ন : সামাজিক পটপ্রেক্ষিত", এম আসাফউদ্দৌলা (সম্পা.) (১৯৭৮)। শিল্পকলা। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

মইনুদ্দীন খালেদ, "শিল্পী শশিভূষণ পাল", মো. শেখ সাদীর ভূঁইয়া (সম্পা.) (২০২১)। শিল্পী শশিভূষণ পাল স্মারকগ্রন্থ। ফাইন আর্ট স্কুল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (১৯৮৮)। শিল্পী শশিভূষণ পাল ও মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট (অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ)। চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোঃ মাকসুদুর রহমান (২০১৪)। বাংলাপিডিয়া। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। https://en.banglapedia.org/index.php?title=Graphic_Design (প্রবেশ ২৮শে মে ২০২২, ০২:২৭টার সময়)

Maggs, Philip B. (1998). A History of Graphic Design. John Wiley & Sons, Inc, New York.

স্টেনসিলের নকশা চর্চা

মোঃ আব্দুল মোমেন*

সারসংক্ষেপ : *মানুষের জীবনযাপনের ধারাবাহিকতায় কারুশিল্প সামগ্রীর ভূমিকা অপরিসীম। প্রতিটি দেশের নিজস্বতা প্রতীয়মান হয় তার শিল্পজাত দ্রব্যের চারিত্রিক ও কৌশলগত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে। তেমনি বিলুপ্ত প্রায় স্টেনসিলের নকশা চর্চা একটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঐতিহ্যকে ধারণ করে টিকে আছে। এই কারুশিল্পীরা বাংলাদেশের গৌরবের ধারক এখনো এই পেশায় সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাদের জন্য গর্ব হয়। এই শিল্পীদের দ্বারা বিভিন্ন ধাতব পাতের মাধ্যমে স্টেনসিল পদ্ধতিতে নকশা চর্চার ঐতিহ্যকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দেশে কোনো গবেষণা বা লেখালিখি একদম নেই। ফলে মাঠপর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে ঢাকার জেলখানা, চিটাগং রোড ও নারায়ণগঞ্জ। স্টেনসিলের নকশাচর্চার অতীত ও বর্তমান, মোটিফ, শিল্পশৈলী, উপকরণ ও করণকৌশল, প্রায়োগিক দিক ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে নকশার বিবর্তন ও এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য খোঁজার মধ্য দিয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ এবং তা আলোকপাত করার ফলে গবেষণা প্রবন্ধটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে।*

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক সময় নানা ধরনের কারুশিল্প দেখা যেত। কালের বিবর্তনে বর্তমানে তার মধ্য থেকে অনেক শিল্পের অস্তিত্বই নেই, যদি থেকেও থাকে তা মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। এদেশের বর্তমান রাজধানী ঢাকা একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পসমৃদ্ধ নগরী ছিল। ঢাকার ইতিহাসের শুরু খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে (হাকীম

*সহযোগী অধ্যাপক, কারুশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হাবীবুর রহমান, ফেব্রুয়ারি ২০০৫:১১)। ঢাকার একটা আলাদা ভৌগোলিক গুরুত্ব ছিল এবং এর সাথে যুক্ত ছিল এখানকার শিল্পকার্যের শ্রেষ্ঠত্ব। এ সম্পর্কে হাকীম হাবীবুর রহমান তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "সারা হিন্দুস্তানের যে শহরেই যান না কেন, প্রত্যেক জায়গাতেই এক দুটি প্রসিদ্ধ শিল্প পাওয়া যাবে কিন্তু আমি আপনাদের বলতে চাইছি যে, ঢাকা এত ধরনের শিল্পে (বৃত্তিতে) শ্রেষ্ঠত্ব রাখত এবং এখনো রাখে যে তার পূর্ণ তালিকার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন।" (হাকীম হাবীবুর রহমান, ফেব্রুয়ারি ২০০৫:২৭)। তেমন একটা শিল্প স্টেনসিলের নকশা শিল্প। ঢাকাতে এক সময় ব্যাপকভাবে স্টেনসিলের নকশা চর্চা হতো। এ অঞ্চলকেন্দ্রিক পেশা হিসেবে গড়ে ওঠা স্টেনসিলের নকশা কাটার সাথে অনেকেই যুক্ত হন। স্টেনসিল একটি ছাপার পদ্ধতি। একটি পাতলা শীট বা প্লেট যেখানে একটি প্যাটার্ন স্পেস বা বিন্দু কাটা হয়, যার মাধ্যমে প্রয়োগ করা রং বা কালি নিচে একটি পৃষ্ঠে পাঠিয়ে ছাপ নেওয়া হয়। মুদ্রণশিল্পে এই পদ্ধতি প্রাচীনকাল থেকে আজও প্রচলিত আছে।

কাগজ, প্লাস্টিক, লোহা, টিন, অ্যালুমিনিয়াম, তামা বা পিতলের পাতলা পাতের উপরে নকশা এঁকে বিশেষ যন্ত্র দিয়ে কাটা হয়। ঐ নকশা কাটা পাতের উপর কাপড়ের তৈরি পুতলি, তুলি বা ব্রাশ, স্প্রে দিয়ে রং লাগিয়ে দিলে যে কোনো জমিনে নকশার ছাপ পড়ে এই পদ্ধতিকে স্টেনসিলের নকশা বলা হয়। একাধিক রঙের জন্য একটি করে স্টেনসিলের পাত ব্যবহার করা হয়। Thames and Hudson Dictionary of Art terms গ্রন্থে স্টেনসিল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "The process of transferring a design to a surface by applying paint or other colouring through a mark or stencil, cut to the required shape." (Edward lucie-smith, 1988:177). Lan Chilvers সম্পাদিত গ্রন্থে স্টেনসিল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে জানা যায় যে, ধাতু, কাগজ বা অন্যান্য উপযুক্ত উপাদানের একটি পাতলা শীটের কাঙ্খিত নকশা (প্রায়শই অক্ষর) ব্লক কেটে শীটটি কাগজ বা ফ্যাব্রিকের উপর বিছিয়ে দেওয়া হয় এবং কাটা অংশের মাধ্যমে রং ঢুকিয়ে ছাপ নেওয়া হয়। (Ian chilvers, 1990 : 448)। শিল্পের শব্দার্থ বইয়ে উল্লেখ আছে যে, স্টেনসিল হলো কোনো একটি পর্দা, ছাঁচ, নকশা জানালা। জাল বা স্টেনসিলের মধ্য দিয়ে রং পাঠিয়ে কোনো তলে ছাপ তোলার পদ্ধতি (কমল আইচ, ২০০৯ : ৬১০)।

Jonathan Metcalf and Della Thompson সম্পাদিত গ্রন্থে স্টেনসিলের অর্থসূচক বর্ণনা করা হয়েছে, "A thin sheet of plastic, metal, card etc in which pattern or lettering is cut, used to produce a corresponding pattern on the surface beneath it by applying ink, paint etc." (Jonathan Metcalf and Della Thompson, 2003:815). Bangla Academy English-Bengali Dictionaryতে দেখা যায় স্টেনসিলের আভিধানিক অর্থ, লেখা বা আঁকার জন্য ধাতব কার্ডবোর্ড বা মোমমিশ্রিত পাতলা পাতা; ছিদ্রময় পাত যার উপর লেখা, নকশা বা আঁকা যায় (Zillur Rahman Siddiqui, Editor, January 2015:762)। এগুলো বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পাওয়া স্টেনসিল সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের প্রাক্কালে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্টেনসিলের নাম বা অর্থ জানা যায়, একে মূলত স্টেনসিল, টিনের ব্লক, ফর্মা বা ডাইস বলা হয় (মোঃ জানু, জুলাই ২০২২ : সাক্ষাৎকার)। মনসুর মিয়া একটু ভিন্ন ভাবে জানালেন, এর নাম স্টেনসিল, মার্কা, চিকা[১] (মনসুর মিয়া, জুলাই ২০২২ : সাক্ষাৎকার)। এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে বিভিন্ন নামে এই কারুশিল্পকর্মটি পরিচিত। কিন্তু এদেশের প্রেক্ষিতে পেশার নামটি নির্দিষ্ট কী হবে তা জানা যায় না। তবে এ সম্পর্কে বর্তমানে এই পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট জনাব মোঃ জানু জানালেন, "এই পেশার নাম টিনের ব্লক কাটার বা স্টেনসিল শিল্পী, আমি নিজেকে স্টেনসিল শিল্পী হিসেবে পরিচয় দেই বা দাবী করি।" (মোঃ জানু, জুলাই ২০২২: সাক্ষাৎকার)। মনসুর মিয়া জানালেন, "এই পেশার নাম স্টেনসিল কারিগর বা টিনের ফর্মা অথবা মার্কা কাটার।" (মনসুর মিয়া, জুলাই ২০২২ : সাক্ষাৎকার)। এই পেশার প্রচলন না থাকায়, নামেমাত্র দুই একজন শিল্পী এখন এই কাজ করছেন। পেশাটি প্রায় বিলুপ্ত। এদেশে স্টেনসিল বিভিন্ন উদ্দেশে বা ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে আসছে এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে দেশজ রূপ লাভ করেছে, যা একেবারেই নিজস্ব ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

২. স্টেনসিলের নকশা চর্চার উদ্ভব ও ইতিহাস

সভ্যতার ইতিহাসে স্টেনসিলের নকশা চর্চার উদ্ভব মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। কালক্রমে স্টেনসিলকৃত নকশাকর্ম কারুশিল্পে উন্নীত হয় তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যে। স্টেনসিলের নকশা এক অনন্য কারুশিল্প। বস্তুত স্টেনসিল

তৈরি ও স্টেনসিল প্রিন্টিং পদ্ধতি বেশ প্রাচীন। কবে, কোথা থেকে এবং কেমন করেই বা স্টেনসিলের উৎপত্তি সঠিকভাবে তার ইতিহাস বলা যায় না। তবে জানা যায় ফিজি দ্বীপবাসীরা কাপড় ছাপার জন্য প্রাচীনতম স্টেনসিল তৈরি করেছিলেন। তাঁরা কলাপাতায় ফুটো করে যে কোনো স্টেনসিলের নকশা তৈরি করতেন আর তা ব্যবহার বা প্রয়োগ করতেন (Stan Smith and Professor H.F. Ten Holt; 1988:139)। সিল্ক স্ক্রিন বা স্ক্রিন প্রিন্টিং পদ্ধতি শুরু না হওয়া পর্যন্ত স্টেনসিল কৌশল বা পদ্ধতি দ্বারা শুধু সাধারণ আকারগুলো মুদ্রণ করা যেত; তবুও নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর খুব সরলতা এবং রূপরেখার তীক্ষ্ণতা প্রধান গুণ হয়ে উঠতে পারে, এবং এই প্রক্রিয়াটির ফ্যাব্রিক প্রিন্টিং এবং প্রিন্টের রং বিশেষ করে উডকাট উভয় ক্ষেত্রেই এর একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে (Ian chilvers, 1990 : 448)। কাগজ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কাগজের স্টেনসিলের উদ্ভব হয়। প্রাচীন চীনে কাগজ কেটে নকশা করা একটি প্রচলিত কারুশিল্প। সম্ভবত পশ্চিম হান প্রদেশের পঞ্চম রাজা লিউ চিং-এর (১৫৬-৪৭ খ্রি.পূ.) আমলে এটা উৎপত্তি (নিত্যানন্দ ভকত, এপ্রিল ২০১২:৪৬)। ধারণা করা হয় যে এই সময় থেকে কাগজের স্টেনসিল নকশা তৈরি করা হয়। এই কাগজের স্টেনসিল দিয়ে ছাপ দেওয়ার প্রচলন সম্ভবত এখান থেকে শুরু হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রাচীনকাল থেকে স্টেনসিল শিল্পের বহুল প্রচলন দেখা যায়। জাপানে ছাপানোর ক্ষেত্রে ও কাপড় রং করার জন্য স্টেনসিলের ব্যবহার ব্যাপক প্রচলিত। জাপানিরা স্টেনসিল দিয়ে চার থেকে পাঁচ রঙা নকশা ছাপাতেন। মধ্যযুগে উডব্লক প্রিন্টের সঙ্গে স্টেনসিলের ব্যবহার প্রিন্ট ও খেলার তাস অলংকরণের কাজে লাগানো হতো। ষোড়শ শতাব্দীতে স্টেনসিলের সাহায্যে পাণ্ডুলিপি অলংকরণ এবং ধর্মীয় কিছু ছবিতে কারুকার্য করা হতো (Stan Smith and Professor H.F. Ten Holt, 1988:139)। ফ্রান্সে একে পোচোয়ার[২] বলা হয়। বইয়ের চিত্রে স্টেনসিলিং অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়েছে (Ian chilvers, 1990 : 448)। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে স্টেনসিল দিয়ে ওয়ালপেপার ছাপা হয়েছে। আমেরিকাতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আসবাবপত্রে স্টেনসিলের নকশা ব্যবহার করা হয়েছিল। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে হোয়াইটওয়াশ করা দেয়ালের ওপর স্টেনসিলে সরাসরি প্রিন্ট নেওয়া হতো

(Stan Smith and Professor H.F. Ten Holt, 1988:139)। এর মধ্যে সুষ্ঠু এবং সরলভাবে উপাদান ও নির্মাণ পদ্ধতির সেইসব দিককেই তুলে ধরা হয়েছে।

প্রত্যেক কারুশিল্পীই তার সমাজ, পরিবেশ, প্রকৃতি থেকে গৃহীত উপাদান নিয়ে তৈরি করেন একটি রূপ। বাংলাদেশে বেশির ভাগ কাজ অর্ডারি হলেও এবং নকশার জন্য প্রস্তুতকৃত লে-আউট সরবরাহ পেলেও স্টেনসিল শিল্পীদের দ্বারা সুচারু বিন্যাসে স্টেনসিল কাটিং নান্দনিক হয়ে ওঠে। এই নান্দনিক অনুভূতিরই আরেক নাম সৌন্দর্যবোধ। এই সৌন্দর্যবোধের প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক আবেগ ও ভাবপ্রবণতা আছে। এমন অনুভূতির আনন্দে মানুষ শিল্পকর্ম উপভোগ করে এবং প্রয়োজনের তাগিদে কেউ কেউ শিল্পকর্ম নির্মাণ করতে চায়। বিভিন্ন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত ইত্যাদি প্রয়োজনে এই শিল্পের চাহিদা আছে। আলংকারিক ফুল, লতা, পাতা, পাখি, বিভিন্ন নকশার লেখা, জ্যামিতিক ফর্ম দিয়ে স্টেনসিলের নকশা কবে থেকে শুরু হয়েছে তার সঠিক ইতিহাস না বলা গেলেও সময়ের চাহিদানুযায়ী চর্চিত হয়ে টিকে আছে এদেশে।

মোঃ জানু স্টেনসিলের উদ্ভব সম্পর্কে তার বাবার কাছে থেকে শুনেছেন যে বিহারীদের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্টেনসিলের নকশা চর্চা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তার বাবা বিহারীদের নিকট থেকে এই কাজ রপ্ত করেন (মোঃ জানু, ২০২২ : সাক্ষাৎকার)। এ থেকে বোঝা যায় স্টেনসিলের বিকাশে বিহারীদের অবদান অনেক। মোঃ হানিফ পাপ্পু জানালেন, ঢাকায় আগে, রথখোলা, জেলখানা, নবাবপুর, মিরপুরে এগুলোর চর্চা ছিল। জেলখানা অঞ্চলে আরও দুই-তিনজন করতেন। নির্বাচনী কার্যকলাপ যখন থাকত তখন এই অঞ্চল স্টেনসিল কার্যক্রমের জন্য বেশি জাঁকজমক হতো। এই এলাকায় এগুলো বেশি তৈরি হতো (মোঃ হানিফ পাপ্পু, জুলাই ২০২২ : সাক্ষাৎকার)। বাংলাদেশের বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চিটাগং রোড, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া ইত্যাদি অঞ্চলে স্টেনসিলের নকশা চর্চা এখনো বর্তমান।

৩. নকশা

বঙ্গীয় শব্দকোষে সরাসরি নকশা শব্দটি নেই, এখানে নকশ মূল শব্দ হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়। এর ভিতরে বা মধ্যে নকশা শব্দটি রয়েছে। সেই নকশা শব্দের

আভিধানিক অর্থ হলো চিত্র, নকশা উৎকীর্ণ (খোদাই করা) চিত্র, সূচিশিল্প, ফুল বুটা ইত্যাদির চিত্র। নকশা কাটা, জমির রেখাচিত্র; ম্যাপ, মানচিত্র, রেখা চিত্র (Plan) বাড়ির নকশা ইত্যাদি উল্লেখিত (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম মুদ্রণ ২০১৬ : ১১৭০)। আশিস খাস্তগীর তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, মূল আরবি শব্দ নক্স। যার অর্থ কারুকাজ, রেখাঙ্কন, ছবি। এই নক্স থেকে উৎপন্ন নকশার মার্জিত অর্থও একই (আশিস খাস্তগীর, ২০০৫ : ২৩১)। একটা নকশা কেবল এক জিনিস নিয়ে হয় না। অনেক জিনিসের রূপ একত্র করে তৈরি হয় একটা নকশা। যে নকশা অঙ্কন করে আরবিতে তাকে বলে নাককাশ[৩] (ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, জুন ২০০৮:৩৮)

পরিকল্পিত কিছুকে নান্দনিকভাবে প্রকাশ করাই হলো নকশা। জোনাথান জাইটলীন তিনি বলেন, "সুনির্দিষ্ট তথ্যকে প্রতিভাত করার জন্যই নকশা বা ডিজাইন।" (জোনাথান জাইটলীন, ১৯৮৯ : ১৪)। নিত্যানন্দ ভকত এর গ্রন্থ থেকে জানা যায় "নকশা হলো সৃজনশীল চেষ্টার সার্থক রূপায়ণ।" (নিত্যানন্দ ভকত, এপ্রিল ২০২২:২)। আসলে নকশা বা সব শিল্পকলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দর কিছু সৃষ্টি করা। যেখানে কিছু মোটিফ সঠিকরূপে ব্যবহার করা হয় এবং যথার্থ মূল্য উপভোগ করার ভঙ্গি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত, এ সকল কাজকে নকশা (Design) বলে। প্রকৃতি থেকে গৃহীত সবই নকশা সৃষ্টির উৎস, আর নকশার শুরু সেখান থেকেই।

যে কোনো নকশার জন্য নিম্নে উপস্থাপিত ছকটি প্রযোজ্য

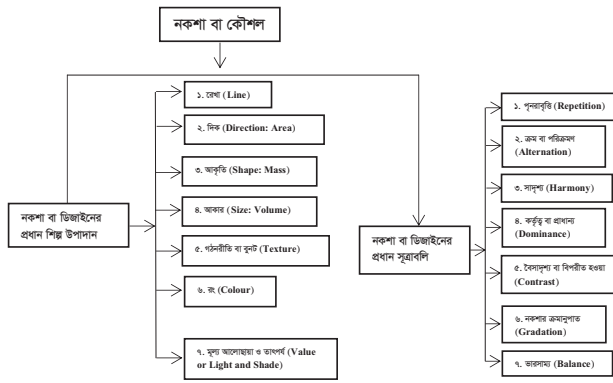

[উৎস : সালাহউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষণে চারু ও কারুকলা, (মুন্সিগঞ্জ : জাফর বুক এজেন্সী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮৭) পৃ. ৪৮-৬০]

স্টেনসিলে পরিকল্পিত বাস্তব আকার একটি ধরাবাঁধা ছকে পড়ে কিছু সৃষ্টি হয়, তাকে স্টেনসিলের নকশা বলে। স্টেনসিলের নকশা কাটায় এরূপ সংজ্ঞা প্রতিফলিত হয়। মহাজন কাপড় প্রথমত ছাপাকারদের কাছে পাঠাত ছাপাকাররা 'গেরুয়া' রঙের সাহায্যে প্রথম কাপড়ে নকশা ছাপাত। পরবর্তীকালে এই ছাপাকৃত কাপড় গরিব হিন্দু মুসলিমদের মাঝে কাশীদারের[৪] (সূচিকর্ম) জন্য দেয়া হতো (হাকীম হাবীবুর রহমান, ফেব্রুয়ারি ২০০৫:৩০)। এই ছাপাকর্ম যে স্টেনসিল পদ্ধতিতে করা হতো তা সহজেই অনুমান করা যায়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে জানা যায়, এখনো এই প্রচলন রয়ে গেছে। মেয়েরা স্টেনসিল সংগ্রহ করে তা দ্বারা কাপড়ে ছাপ দিয়ে বা ড্রইং করে সূচিকর্ম সম্পাদন করে। কাপড়ে স্টেনসিল দিয়ে ছাপা বা ড্রইং করে কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুল-লতা-পাতা অথবা কোনো সুদৃশ্য পশুপাখি ইত্যাদি মোটিফ সেলাই করা হয়। স্টেনসিলের নকশা ব্যবহারিক নকশা হিসেবে পরিগণিত হয়। এই নকশা ব্যবহারে বিভিন্ন সামগ্রী অথবা স্থানে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং গুরুত্ব বেড়ে যায়। সৌন্দর্য আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনশীল। সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য বজায় রেখে চাহিদানুযায়ী নকশার উপাদানগুলো সুনিপুণভাবে নির্বাচন করে সাজিয়ে স্টেনসিল কাটা হয়।

বাংলাদেশের স্টেনসিলের নানান ধরনের দৃষ্টিনন্দন নকশার মধ্যে ফুল, লতা, পাতা, পাখি, প্রজাপতি, গাছ, সূর্য, নৌকা ইত্যাদির নকশা ব্যবহৃত হয়, কাঁথা, ওয়াড়, পোশাক, শাড়ি, রুমাল, আসন, জায়নামাজ ছাড়াও নানা ধরনের বস্ত্র সামগ্রীতে। পৌরাণিক কাহিনি, চরিত্র ও অনুষঙ্গে শত শত প্রতীক স্টেনসিলে নকশা হিসেবে ব্যবহার হয়। জীবনযাত্রায় বিভিন্ন উপকরণ, পালকি, ষাঁড়, লাঙল, পান-সুপারি, তালগাছ ইত্যাদি ব্যবহার হয়। লোকাচারে বিশেষ তাৎপর্যবাহী পশুপাখি যেমন- পেঁচা, ময়ূর, কাক, হাতি, বাঘ, সিংহ, কচ্ছপ ইত্যাদি নকশা কাটা হয়। এছাড়া বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মমতের ধর্মীয় প্রতীকের প্রভাবে স্টেনসিলে কাবা শরিফ, মসজিদ, মিনার; গম্বুজ, তাজিয়া, দুলদুল ঘোড়া, আরবিতে আল্লাহু, মোহাম্মদ (স.), পাক পাঞ্জাতন, বিভিন্ন আয়াত, তরবারি, চাঁদ, তারা ইত্যাদি স্টেনসিল নকশাদার হিসেবে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপ হিন্দু, খিষ্টান,

বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা, অং, ক্রস, কালি সরস্বতী, গণেশ ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক স্টেনসিলে নকশার বৈচিত্র্যময়তা লক্ষ করা যায়।

সাইনবোর্ড লেখার দোকানগুলো আগ্রহের সঙ্গে এই পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই পদ্ধতিতে একটা মাত্র স্টেনসিলের সাহায্যে কয়েক হাজার ছাপ নেওয়া সম্ভব। সমতল বক্র, অসমান পৃষ্ঠে এটা দ্বারা সহজেই ছাপানো যায়। যে কোনো মাপেই স্টেনসিল দিয়ে ছাপ নেওয়া সম্ভব এবং বিশেষ কোনো যন্ত্রপাতিরও দরকার হয় না। স্টেনসিলে নকশা বা ছবি বা লেখাকে ট্রান্সফার বা স্থানান্তর করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো সরাসরি হাতে এঁকে বা কখনো কখনো ট্রেসিং বা কার্বন দিয়ে তোলা এবং পরে সাধারণ যন্ত্র ব্যবহার করে স্টেনসিলে নকশা কাটা হয়। শুধু বাংলাদেশে স্টেনসিল দেখা যায় তা নয়, বিশ্বের অন্য অনেক দেশেও এই কারুশিল্পের ব্যবহার দেখা যায়।

৪. স্টেনসিলের নকশা চর্চা

যুগে যুগে নানা জাতি নানা অঞ্চলের মানুষ চর্চা করে তৈরি করেছেন হরেক রকম নকশা। সেগুলোর কোনো কোনোটা বহু প্রজন্ম ধরে বয়ে চলে। গড়ে ওঠে একটা সংস্কৃতি। এটা সমাজে দারুণভাবে প্রভাব ফেলে। তখন মানুষ শুধু বেঁচে থাকতে নয়, সুন্দর করে বাঁচতে চায়, সমাজবদ্ধ হয়ে বাঁচতে চায়। এই মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক তথ্যে নকশা চর্চা প্রভাব ফেলে। প্রভাব ফেলে প্রাত্যহিক জীবনে দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীতে। সামগ্রীগুলোকে যখন স্টেনসিল পদ্ধতিতে মনের মাধুরী মিশিয়ে সুন্দর রূপ দেওয়া হয়, তখন সেগুলো শুধু আটপৌরে বস্তু থাকে না, হয়ে ওঠে কারুশিল্প। নকশা কাটা স্টেনসিল নিজেও হয়ে ওঠে শিল্প। তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে স্টেনসিলের নকশা চর্চা করা হয়ে থাকে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

৪.১ নকশায় হস্তাক্ষর

প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলার যে সমস্ত নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়, তা মানুষের প্রাকৃতিক গুহায় বসবাসের সময়ে অঙ্কিত রেখা প্রধান ও নকশাধর্মী চিত্রে দৃষ্টিগোচর

হয়। বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনে যেমন বিশেষ করে মিশরের সমাধিক্ষেত্রে প্রাপ্ত চিত্র, নকশা প্রভৃতির নান্দনিক ও কারিগরি দক্ষতা বিস্ময়কর। ফারাও এবং বিত্তশালী বা প্রভাবশালী ব্যক্তির মৃতদেহ মমি করে পিরামিডে সুরক্ষা করা হতো। পিরামিডের অভ্যন্তরে মৃত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী রেখে দেওয়া হতো পাশাপাশি দেয়ালে নানান দেব-দেবী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির চিত্র ও প্রতীক চিত্র বা চিত্রলেখার আদি নিদর্শন যা নকশা আকারে রচিত হয়েছে।

প্রাচীন অলংকৃত হস্তাক্ষর দেখতে পাওয়া যায় ৫০০-৬০০ খিষ্টপূর্বে 'পারস্যদেশে' (নিত্যানন্দ ভকত, এপ্রিল ২০২২:৪৮)। এছাড়াও প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশে তাদের পুথিপত্রে, সৌধগাত্রে আসবাবপত্রের উপর ও ধর্মীয় স্থাপনার দেওয়ালে অলংকৃত হস্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। ইউনিক্যাল (Unical) খিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হাতের লেখার একটি ধরন। ইউরোপীয় পাণ্ডুলিপিতে পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীতে এর বহুল ব্যবহার হয়েছিল। রোমান বড় হাতের অক্ষরের মতো ইউনিক্যালের হরফের গঠন ছিল, তবে হরফের কোনাগুলো তীক্ষ্ণ ও সুচারু (কমল আইচ, ২০০৯:৪৬)। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পারস্যে লিপিশিল্প চরম উৎকর্ষ সাধন করে। এর পেছনে কাজ করেছেন তাব্রিজের শিল্পী মির আলিল (ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, জুন ২০০৮:৪৫)। একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দ গেঁথে সৃষ্টি করেছেন অপূর্ব নকশা। তিনি লিপিশিল্প চর্চায় অনেক দক্ষ ছিলেন। স্টেনসিলে লেখা কাটার জন্য নিজেই স্বহস্তে সরাসরি লেখা স্টেনসিলে এঁকে, পরিকল্পিত আদলে কারুকাজখচিত লিপি কেটে প্রিন্ট উপযোগী স্টেনসিল তৈরি করেন। লেখার সাথে সাথে ফুল-লতা-পাতা, বিশেষ করে গোলাপের সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়ে নকশা চয়ন করেন।

নকশা ও লেখা হলো স্টেনসিল শিল্পের গঠনশৈলী বা যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ। মাঝেমাঝে লেখার চারপাশে বর্ডারগুলো খুবই সূক্ষ্ম নকশায় শোভা পায়। লতাপাতার সূক্ষ্ম নকশাকৃত বর্ডারগুলো লেখার চারদিকে আকর্ষণীয় দেখা যায়। স্টেনসিল প্রিন্টের সুবিধা হলো এসব চিকন বা সূক্ষ্ম রেখার ছাপা খুব সহজে দেয়াল বা বিভিন্ন সামগ্রীতে নেওয়া হয়। বর্ডারের বিশেষ মাপের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। তাই কাটার সুবিধার্থে তাঁরা মধ্যরেখা ঠিক করে অর্থাৎ সুষমা নকশা এঁকে নেন।

বাংলা ভাষায় আছে ব্যঞ্জনবর্ণ আর স্বরবর্ণ, এছাড়া বাংলা সংখ্যা, ইংরেজি অক্ষর ও ইংরেজি সংখ্যা বহুল প্রচলিত। স্টেনসিল নকশায় আরবি ভাষারও গুরুত্ব আছে।

কারুকাজের এই শিল্পীরা, যারা হস্ত লেখাশিল্পে উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল বিশেষ করে স্টেনসিল ব্যবহার করে ছাপ দেওয়ার জন্য দেয়ালে দেয়ালে, বস্তাতে, ইলেকট্রিক খুটির গায়ে, কাপড়ের জমিনে, নির্বাচনের মার্কা, বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর বা পণ্যচিহ্ন এবং বিভিন্ন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম ইত্যাদি তারা স্টেনসিলে নকশা কাটত। সম্ভাব্য সকল জায়গায়, মাটি হোক, পাথর হোক, লোহা হোক বা কাচ হোক সকল কিছুর উপর স্টেনসিলের নকশা ব্যবহার করা যায়। ঘরের আসবাব, ছোটখাটো তৈজসপত্রও তাঁদের এই কারুকাজের আওতার বাইরে থাকতে পারেনি। লেখা দিয়ে কারুকাজের এই নকশাও বিভিন্ন রকমের, বিচিত্র এ সকল কারুকাজের উৎস হলো বিভিন্ন ধাচের বর্ণ বা অক্ষর। লেখার স্টাইল চাহিদা অনুযায়ী করে থাকেন। যে যেভাবে চায় তারা সেভাবেই নিয়মকানুন তৈরি করে নিজস্ব পদ্ধতিতে স্টেনসিলে নকশা কাটেন।

৪.২ নকশায় ফুল, লতাপাতা, গাছ, পাখি ও প্রজাপতিসহ নানা ধরনের মোটিফ

গাছ, ফুল, ফল ও লতাপাতা থেকেও নানান নকশা ও আকৃতির প্রতিরূপ বিচিত্র রূপে ফুটে উঠে স্টেনসিল শিল্পীর হাতে। বিভিন্ন দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিভিন্ন রকম। কাপড়চোপড়, খাওয়াদাওয়া, ভাষা, আচার-আচরণ দেশভেদে সব আলাদা আলাদা। লেখা ছাড়াও যেসব কারুকাজ দেখা যায়, তার অধিকাংশই ফুল, ফল, লতা-পাতাভিত্তিক। বিভিন্ন ফুল, লতাপাতা, পাখি, প্রজাপতিসহ নানা রকম মোটিফ দিয়ে স্টেনসিল শিল্পী মনের ভাব প্রকাশ করেন। স্টেনসিল শিল্পীরা প্রকৃতি থেকে এমনিতেই নকশা আকারে খেয়াল খুশিমতো আঁকেননি বা কাটেননি। ফুল, লতাপাতা, ফলেও এক ধরনের চিরন্তন এবং বিস্ময়কর প্রতিসাম্য চোখে পড়ে বা দেখতে পাওয়া যায়। ফুল, ফল, লতাপাতা ইত্যাদির নকশায় অংশ বিশেষের বিকশিত হওয়ার জন্য প্রতিসাম্যের সৃষ্টি হয়। বারবার ছাপ নেওয়ার ফলে ঐক্যবদ্ধতা একই রকম থাকে এবং প্রতিসাম্য পূর্ণতা পায়। আঁকাবাঁকা লতাপাতার আশ্রয় নেয়া হয়। স্টেনসিল শিল্পীরা নকশায় অনেক রকম ফুল, ফল, লতাপাতা,

গাছগাছালি, পাখি, প্রজাপতি, নৌকা, বিভিন্ন ধরনের মোটিফ[৫] ব্যবহার করেন। নকশায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মোটিফ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

নৌকা : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় নৌকার বহুল প্রচলন এখনো লক্ষ করা যায়। আবার নৌকা এদেশের একটা রাজনৈতিক দলের মার্কা হওয়ায় স্টেনসিলে সবচেয়ে বেশি নকশা কাটা হয় নৌকার। আকার ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে নৌকার বাহারি প্রকারভেদ দেখা যায়। যা নিপুণভাবে ফুটে ওঠে স্টেনসিল নকশায়।

পদ্ম : পদ্ম হলো স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের মেলবন্ধন। আবার পদ্ম ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক। প্রাচীন বিশ্বাস মতে এটি সৃষ্টির প্রাথমিক চিহ্নও বটে। লক্ষ করলে দেখা যায় সম্পদদাত্রী দেবী লক্ষ্মীর আসন পদ্ম। বুদ্ধের আসনভঙ্গির নাম পদ্মাসন। ধর্মীয় আচারসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে পদ্ম বাস্তব এবং প্রতীকীরূপে স্টেনসিলে নকশা কাটা হয়।

বৃক্ষ বা গাছ : বৃক্ষের চিহ্নটি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাণ ও উর্বরতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয় বৃক্ষ। স্টেনসিলের নকশায় নানান আঙ্গিকে এবং প্রয়োজনে এটি ব্যবহার হয়।

কলকা : পাতা সদৃশ কলকা খুবই জনপ্রিয় একটি প্রতীক। বাংলাদেশে তৈরি তাঁতের শাড়িতে কলকা মোটিফ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন নকশায় কলকা এদেশের নিজস্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। স্টেনসিল নকশায় এটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। সূচিকর্মের জন্য এর চাহিদা রয়েছে।

প্রজাপতি : শুভমিলন বা বিবাহের প্রতীক হিসেবে প্রজাপতির ব্যবহার স্টেনসিলের নকশায় বহু প্রাচীন। তাই মিলনাত্মক শুভকাজ বা নবদম্পতির জন্য বা বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রজাপতির নকশা কাটা হয়।

পাখি : পাখি ছোট বড় সবার কাছেই প্রিয়। পাখি মানুষের মনে শুভ বারতা ছড়িয়ে দেয়। কত আকার-আকৃতির পাখি প্রতীকীরূপে লোগো বা মনোগ্রামে প্রস্ফুটিত হয়, বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। তারই নকশা মনোরমভাবে দক্ষ শৈলীতে কাটা হয় স্টেনসিলে। পাখির মাথার ঝুঁটি, ঠোঁট, মাটি পর্যন্ত ঝোলানো লেজ সবকিছুই স্পষ্ট

করে দেখাতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় তারা স্টেনসিল কাটায় এতই দক্ষতা অর্জন করেছে যে, যে কোনো কিছুর আদল সৃষ্টি করতে পারেন।

গোলাপ : গোলাপ হলো ভালোবাসার প্রতীক। পবিত্রতার প্রতীক। বহুদিন আগে দেয়ালে চিকামারা হয়েছিল "কাঁটা নয়, গোলাপ দাও ভালোবাসা বাঁচাও" মধ্যখানে গোলাপের নকশাযোগে লেখা দিয়ে স্টেনসিলে নকশা কাটা হয়েছিল। দেয়ালে দেয়ালে এমন নকশা স্টেনসিল পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয়েছিল। মাঠ পর্যায়ে গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে জানা যায়, বিভিন্ন আকার আকৃতির গোলাপ সবচেয়ে বেশি ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে, তাঁরা তা সংগ্রহও করে। স্টেনসিল শিল্পীরা জানান, তাঁরা অর্ডার ছাড়াই আপন মনে গোলাপের নকশা কেটে থাকেন।

৪.৩ নকশায় জ্যামিতিক ফর্ম

প্রকৃতিই সবকিছুর উৎস। প্রকৃতি থেকে কারুখচিত জ্যামিতিক নকশা বিভিন্ন ফর্মে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন উপাদান জ্যামিতিক নকশায় পরিণত হয়। প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে যাবতীয় নকশার ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন–গোলাকৃতি থেকে বৃত্তের ধারণা, চৌকোণা থেকে চতুর্ভুজের ধারণা আবার ত্রিকোণা কিছু থেকে ত্রিভুজের ধারণা। জ্যামিতিক নকশাগুলো যেমন–ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি, সম্ভবত মুসলিমদের বদৌলতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কেননা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একটি বড় অংশের বিশ্বাস হলো, প্রাণীর ছবি তৈরি করা একটি ধর্ম গর্হিত কাজ; তবে জ্যামিতিক নকশা নির্মাণে বাধা নেই। যদিও আরও আগে থেকে নানান বিশ্বাস ঘিরে এ রকম নকশা চালু ছিল।

বেশির ভাগ নকশার পটভূমিকে কখনো নকশা থেকে আলাদা করে ভাবা যায় না। ফুল, লতাপাতা, পাখি ইত্যাদিকে খুব সুন্দরভাবে জ্যামিতিক ছাঁচে ফেলে নকশা আঁকা হয়। বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ তিনটি মৌলিক ফর্মসহ পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ, অষ্টভুজ, দশভুজের সমন্বয়ে স্টেনসিল শিল্পীরা অপূর্ব নকশা সৃষ্টি করতেন এবাং এখনো করেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে যুগে যুগে বাংলাদেশের এ শিল্পীরা জ্যামিতিক নকশার ব্যবহার করেছেন। স্টেনসিল শিল্পীরা জ্যামিতিক যন্ত্র বা কম্পাস দিয়ে গোলাকার রেখা বা স্কেলের সাহায্যে সোজা দাগ টেনে স্টেনসিল কেটে নিখুঁত

নকশা বা শিল্পকর্মের সৃষ্টি করেন। সব সময়ই জ্যামিতিক নকশার ভিত্তি কোনো ভাগ বা ছোটখাটো অংশে বিভক্ত হয় বা জালিকার মতো হয় (নিত্যানন্দ ভকত, এপ্রিল ২০১২ : ৪৭)। স্টেনসিল শিল্প আজ বিলুপ্তপ্রায় কারুশিল্প হলেও বিভিন্ন ধরনের মার্কা, পণ্যচিহ্ন, বিশেষ শ্রেণীর পণ্য প্রতীক, বিভিন্ন যানবাহন, নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান, বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি, লোগো-মনোগ্রাম ইত্যাদিতে জ্যামিতিক অলংকরণ অথবা জ্যামিতিক ফর্মকে ভিত্তি করে স্টেনসিলে নকশা কেটে স্টেনসিল পদ্ধতিতে সৃষ্ট মুদ্রণ প্রক্রিয়া রূপায়িত হয়।

এছাড়াও হাতে আঁকা সিনেমার ব্যানারের বর্ডারে শুরু থেকেই স্টেনসিলের নকশা মুদ্রিত করা হয়। সিনেমার ব্যানার এখন বিলুপ্তপ্রায়। যেহেতু বর্ডারের নকশা বা কাজে নিরবচ্ছিন্নতা অন্যতম শর্ত, সেহেতু বর্ডার নকশায় সিনেমা ব্যানার আর্টিস্টগণ স্টেনসিলের আশ্রয় নিতেন। এখন সিনেমা ব্যানার আর্টিস্ট হানিফ পাপ্পু দ্বারা দু-একটা সিনেমা ব্যানার করা হয়, সেখানেও বর্ডারে স্টেনসিলে নকশা ছাপানো হয়। বর্ডার থাকার কারণে, বিশেষ একটা সীমারেখা মনে রেখেই ব্যানার শিল্পীরা ব্যানারের অন্যান্য কারুকর্ম সম্পন্ন করেন। মোঃ হানিফ পাপ্পু এ সম্পর্কে জানালেন, তিনি যখন সিনেমার ব্যানার আঁকতেন তখন বর্ডার নকশায় ব্যবহার করতেন এনামেল রং। অক্সাইড পাউডার রং দিয়ে এসব কাজ করা হতো। সিনেমার ব্যানারও এই রঙে আঁকতেন। অন্য লোকের মাধ্যমে অর্থাৎ ছোট ছেলেরা বা নতুন কাজে যোগ দিয়েছে, তাদের দিয়ে ব্যানারের বর্ডারে জ্যামিতিক, লতাপাতার নকশা কাটা স্টেনসিল দিয়ে ছাপ মারা হতো। (মোঃ হানিফ পাপ্পু, ২০২২ : সাক্ষাৎকার)।

৫. উপকরণ ও করণকৌশল

৫.১ উপকরণ

স্টেনসিলের নকশা কাটার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

- টিন, পিতল, তামা, স্টিল, কাগজ ইত্যাদির পাত।
- ছোট-বড় বিভিন্ন সাইজের লোহার তৈরি ছেনি[৬]

- কাঠের হাতুড়ি
- কাঠের খাটিয়া[৭], সসার প্লেট[৮]
- কাতানি
- কাচি
- পেন্সিল, কাগজ, ট্রেসিং পেপার ইত্যাদি
- কম্পাস, স্কেল, ইত্যাদি জ্যামিতিক টুলস।
- চুম্বক[৯]

৫.২ করণকৌশল

স্টেনসিলে যে নকশা নির্মাণ হয় সেগুলো এমনভাবে ক্রিয়া করে যা প্রাত্যহিক জনজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। মানুষের এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন নকশাকে দেখবার চোখও পালটে গেছে, পালটে গেছে ধারণাও। বর্তমান সময়ে ডিজাইন বা নকশা হলো মানুষের জীবনযাত্রার একটি প্রধান অংশ। যার ভিত্তি হলো কারিগরি করণকৌশলের ক্রমবর্ধমান পর্যায়ক্রমিক উন্নতি। ছেনির আঘাতে টিনের জমিনে তৈরি হয় আলোছায়ার ব্যঞ্জনা যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নকশাগুলো। টিন কেটে কেটে নকশা করা সহজ নয়। কী উদ্দেশে নকশাটি ব্যবহৃত হবে এ অনুযায়ী কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এ সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। কঠিন নকশা হলে নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে নকশাটিকে সরলীকরণ করে কাটার পদ্ধতি নির্মাণ করা হয়। স্টেনসিল পদ্ধতিতে ছাপার কাজের নকশা তৈরি করতে হলে যে বস্তু দিয়ে স্টেনসিল হবে অবশ্যই সেই সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে ও নকশা তৈরির রীতিনীতির প্রাথ মিক জ্ঞান থাকতে হবে। এসব অর্জিত জ্ঞান দিয়ে সংগৃহীত টিনে প্রথমে পেন্সিল বা ট্রেসিং বা কার্বনের মাধ্যমে নকশা ভলোভাবে তুলে সাধারণ ছেনি দিয়ে কেটে কেটে অপূর্ব নকশা চয়ন করা হয়। Joan Dean-এর উক্তিটি স্টেনসিলের ক্ষেত্রে যথার্থই, "A picture or design also includes relationships of line and shape।" (সালাহউদ্দিন আহমেদ, ১৯৮৭ : ৪৮)

নকশার মূল সূত্র হচ্ছে Repetition বা পুনরাবৃত্তি। যে কোনো একটা ছোট নকশা এঁকে কার্বন পেপারের সাহায্যে তাকে পরপর সাজিয়ে অথবা কার্বন পেপারের সাহায্যে তার উল্টো নকশা প্রথমটার গায়ে লাগিয়ে দিয়ে স্টেনসিলে এঁকে কাটা হয়। এভাবে চারপাশে লাগালে স্কয়ার বা বৃত্তাকার নকশা অথবা ঐ স্কয়ার বা বৃত্ত আবার চারপাশে আঁকলে একটি বড় স্কয়ার বা বৃত্ত সম্পূর্ণ আলাদা নকশা স্টেনসিলে তুলে কাটা হয়। কৌশলগত দিক দিয়ে এই নকশা কাটতে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এভাবে সুন্দর স্টেনসিলের নকশার সৃষ্টি হয়। স্টেনসিলে খন্ডিত রেখাসমূহ ছোট হলেও তাদের ধারাবাহিকভাবে যুক্ত করলে একটি রূপ তৈরি হয়, এভাবেই নকশার সূচনা হয়। স্টেনসিল নিজেই একটি নকশা, এর একটি প্রায়োগিক বা ফলিত (Applied) দিক রয়েছে।

অর্ডারি কাজ ব্যতীত নিজ উদ্যোগে বিক্রির জন্য যে নকশাগুলো করা, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রকৃতির লতাপাতা থেকে নেওয়া আকার-আকৃতি, অনিবার্যভাবে স্টেনসিল নকশায় ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও লতাপাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি এককভাবে বা গুচ্ছরূপে ব্যবহৃত হয়েছে (মোঃ জানু, ২০২২ : সাক্ষাৎকার) ছাপার সুযোগ-সুবিধার জন্য শুধু এক রঙেই ছাপা নেওয়া হয়। রঙিন ছাপার ক্ষেত্রে একের বেশি রঙের স্টেনসিল বা ব্লক থেকে যে কোনো তলে ছেপে পূর্ণাঙ্গ রঙিন ছবি করা হয়। স্টেনসিলে প্রতিকৃতি, সৃজনশীল নকশা সহজেই ছেপে নেওয়া যায়।

কারুশিল্পকর্ম মানুষের এক অত্যন্ত উচ্চস্তরের সাধনা প্রজ্ঞালব্ধ কৌশল ও পরম্পরার জ্বলন্ত উদাহরণ। স্টেনসিলশিল্পীদের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রচলন হয়নি। প্রথমে জোগানদার বা সহকারী হিসেবে কাজ করার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন শেষে যিনি পূর্ণ স্টেনসিল নকশা কাটতে সক্ষম। পূর্বে, সমস্ত শৈল্পিক কার্য সম্পাদনকারীকে কারুশিল্পী বলা হতো। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা একটা উচ্চমর্যাদার কারুশিল্প। এই কারুশিল্পশিক্ষা সামাজিক বা পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে হাতে কলমে, কায়িক শ্রমে, একেবারে প্রশিক্ষিত হয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়।

৬. স্টেনসিল শিল্পের বৈশিষ্ট্য

ডিজাইন সম্পর্কিত ধারণা একবার সম্পূর্ণ হলে তাকে অধিকতর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে কাজে পরিণত করে চূড়ান্তভাবে ডিজাইন প্রস্তুতকরণের কাজে লাগাতে হবে। কোনো সামগ্রীর সৌন্দর্য এবং চাহিদা উভয়ই নকশার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এসবের চমৎকার টেক্সচারবহুল নকশা তৈরি করা সম্ভব। নকশা সাধারণত সাদা কালো থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের রং দিয়ে ছাপা যায়।

স্টেনসিল শিল্পে নিয়োজিত শিল্পী বা কারিগরগণ প্রধানত গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী স্টেনসিলের নকশা তৈরি করে থাকেন। স্টেনসিলে নকশা প্রস্তুত করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে কোনো কোনো নকশায় সৃষ্টিশীলতা মননশীলতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়।

পৌনঃপুনিকতা নকশা[১০], স্টেনসিল নকশার আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

এই শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, শিল্প উদ্যোক্তা নিজেই কারিগর, নিজেই বিপণনকারী, আবার নিজেই প্রশিক্ষণদাতা সর্বোপরি নিজেই মালিক পাশাপাশি যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী নৈপুণ্য বা দক্ষ কারিগর সহায়ক ব্যবস্থা নিজেই গড়ে তোলে।

এই কারুশিল্পের বাজার পুরোটাই স্থানীয়।

৭. সমস্যা ও সমাধান

লেখা, প্রকৃতি ও জ্যামিতিভিত্তিক এই তিনটি ধারাতে স্টেনসিলের নকশা চর্চিত হয়ে থাকে। স্টেনসিলের এই ধারা প্রশিক্ষণের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। বংশপরম্পরায় এক শিল্পীর কাছে থেকে অন্য শিল্পীর কাছে যায়। বর্তমানে এই শিল্পটির চর্চা একেবারেই কমে যাচ্ছে। ঢাকা শহরে হাতে গোনা কয়েকজন স্টেনসিলের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, বাবা-দাদার জ্ঞানকে সঙ্গী করে। ফুটপাতে বসে তারা চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। মোঃ জানুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এই শিল্পের বিলুপ্ত হওয়ার কারণ কী উত্তরে তিনি জানালেন অনেক কারণ আছে, এর মধ্যে প্রধান কারণ হলো প্রিন্টিং লাইনের উত্থান, বিশেষ করে এই জায়গা দখল করে নিয়েছে

স্ক্রিন প্রিন্ট (মোঃ জানু, ২০২২ : সাক্ষাৎকার)। এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন সরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা। তাঁদের যথাযথ মর্যাদায় আসীন করা এবং তাঁদের হস্তগত শিল্পকার্যক্রমকে সবার সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরা। সর্বোপরি এদেশের শিল্প হিসেবে এর ব্যাপক পরিচয় ঘটাতে হবে।

৮. উপসংহার

শিল্পের সাথে মানুষের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিল্প মানুষের সৃষ্টি, আবার মানব সমাজও দিনে দিনে শিল্প-সংস্কৃতির সোনার কাঠির জাদুস্পর্শে ক্রম-অগ্রসর হয়। আর কারুশিল্পের বিশেষ শাখা স্টেনসিলের প্রায় সবটুকু জুড়েই রয়েছে ডিজাইন বা নকশার অস্তিত্ব। বিশ্বশিল্পকলায় সর্বব্যাপী নকশা বিশেষ স্থান দখল করলেও নকশায় যেমন–বিভিন্ন নতুন পদ্ধতি জন্ম নিয়েছে তেমনি অনেক পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়েছে। স্টেনসিলের নকশা এখন বিলুপ্ত প্রায়। তবে বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকটা অঞ্চলে ক্ষীণভাবে এর কার্যক্রম ও চর্চা হচ্ছে।

বিপুল পরিবর্তনের যুগেও ইতিহাস বারবার স্মরণ করায় যে, একই ধরনের ঘটনা বা পরিস্থিতি বারে বারে ঘুরেফিরে আসে। বর্তমান যুগ অত্যন্ত গতিসম্পন্ন এবং বিশাল পরিবর্তনের যুগ, এই যুগেও স্টেনসিল একটা সৃষ্টিশীল কাজ। এমন সমীকরণে সৃজনশীল স্টেনসিলের নকশা নিবু নিবু প্রদীপ জ্বেলে কোনো রকমে টিকে আছে। কিন্তু এর একটা দ্যুতি আছে।

টীকা

১. মাঠ পর্যায়ে গবেষণায় জানা যায় স্টেনসিল দিয়ে নির্বাচনের বা রাজনৈতিক বক্তব্য বা বিজ্ঞপ্তি বা ব্যক্তিগত অভিমত দেওয়ালে সেঁটে যে প্রিন্ট নেওয়া হয় এটাকেই চিকা মারা বলা হয়। টিন কেটে নকশা করাকেই 'চিকা' বলে। অর্থাৎ স্টেনসিলের অপর নাম 'চিকা'। এই চিকার মাধ্যমে কাপড়ের পুটলি দিয়ে রং লাগিয়ে ছাপ দেওয়া হয়। এতে অক্সাইড রং বেশি ব্যবহার করতেন।

মনসুর মিয়ার ছেলে মোঃ জাভেদ মিয়া বাবার কাছ থেকে স্টেনসিলের নকশা কাটা শিখে এখন সিদ্ধহস্ত। তিনি জানালেন এই স্টেনসিল দিয়ে গভীর রাত্রে দেয়ালে দেয়ালে নানান বিষয়কে অবলম্বন করে স্টেনসিলের নকশার ছাপ মারা হয়। এগুলো করতে বেশির ভাগ সময় রাতকে বেছে নেওয়া হতো। ইঁদুরসদৃশ চিকা এদেরকে রাত্রে দেখা যায়। কিন্তু দিনে এদের কোন সাড়াশব্দ থাকে না। শুধু রাত্রে তারা অবাধ বিচরণ করে। অনুরূপভাবে স্টেনসিলের ক্ষেত্রেও বেশির ভাগ সময় রাত্রে দেয়ালে দেয়ালে এর ছাপা মারা হয়। ফলে এমন কার্যক্রমে স্টেনসিল হয়তো কালক্রমে 'চিকা' নাম হয়ে যায়। তরুণরাই এ কাজে সম্পৃক্ত হতো বেশি। তারা স্টেনসিল মাধ্যমে দেয়াল লিখনকে "চিকা মারা" সম্বোধন করত এবং তা ব্যাপক প্রচার পায়।

সিনেমা ব্যানার শিল্পী মোঃ হানিফ পাপ্পু জানালেন, "দেয়ালে চিকা মারা দীর্ঘ দিনের প্রচলিত কথা। এই 'চিকা' হইলো স্টেনসিল। আমি গভীর রাতে দেয়ালে দেয়ালে কত চিকা মারছি ইয়ত্তা নাই।"

২. ফ্রান্সে স্টেনসিলকে পোচোয়ার (Pochoir) বলা হয়।

৩. আরবি 'নাককাশ' শব্দের অর্থ কারুশিল্পী।

৪. এক ধরনের সূচিকর্মই কাশীদা নামে পরিচিত। কাশীদা ফার্সি শব্দ। সাধারণত বুটিদার, এক প্রকার সূচি কারুকাজযুক্ত মসলিনকে কাশীদা নামে অভিহিত করা হয়। রেশম ও কার্পাস সুতার সংমিশ্রণে কাশীদা সৃষ্টি হয়।

৫. মোটিফ (Motif) অর্থ মুদ্রা। শৈল্পিক বিন্যাসই (In artistic composition) হলো মোটিফ। নকশার প্রত্যেকটি আলাদা রূপকে বলা হয় মোটিফ। মোটিফ হচ্ছে নকশার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্থায়ীভাব বা সুর এবং প্রায়শ পুনরাবর্তিত হয়।

৬. ছেনি হলো লোহা, ইস্পাত, রড এবং টিন ইত্যাদি কাটার লোহার তৈরি যন্ত্র বিশেষ।

৭. স্টেনসিলের নকশা কাটার জন্য সিসার প্লেট ব্যাবহার করে। কিন্তু কেউ কেউ এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য সিসার প্লেটের পরিবর্তে কাঠের খাটিয়া বা খণ্ডের উপর রেখে স্টেনসিলে নকশা কাটে।

৮. সিসার প্লেটের উপর রেখে স্টেনসিলের নকশা কাটা হয়। এর ব্যবহার অনেক আগে থেকে প্রচলিত এই পদ্ধতিতে কাটলে নকশা কাটা ভালো হয়।

৯. এই চুম্বক সাধারণ চুম্বক খণ্ড যা দিয়ে টিনের গুঁড়া বা ছোট ছোট কাটা টিন, মাঝে মাঝে বা কাজ শেষে গুছিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়।

১০. একই মাপের আকৃতি বা মোটিফ বারবার একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব সৃষ্টি হলে তাকে পৌনঃপুনিকতা নকশা বা Repeated Design বলা হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আশিস খাস্তগীর, নক্সা কিস্‌সা বাতেলা ২০০৫। বুদ্ধিজীবীর নোটবই, সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.)। কোলকাতা : পুস্তক বিপণি।

কমল আইচ ২০০৯। শিল্পের শব্দার্থ সন্ধান। কোলকাতা : করুণা প্রকাশনী

জোনাথান জাইটলীন ১৯৮৯। কম খরচে মুদ্রণ। ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

নিত্যানন্দ ভকত, এপ্রিল ২০২২। নকশার গঠনশৈলী। কোলকাতা : সাহিত্য সংসদ।

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জুন ২০০৮। নকশাকলা। দিনাজপুর : মোঃ হাবিবুর রহমান।

সালাহউদ্দিন আহমেদ ১৯৮৭। শিক্ষণে চারু ও কারুকলা। মুন্সিগঞ্জ : জাফর বুক এজেন্সি

হাকীম হাবীবুর রহমান ফেব্রুয়ারি ২০০৫। ঢাকা : পঞ্চাশ বছর আগে। ড. মোহাম্মদ রেজাউল করিম (অনু.)। ঢাকা : প্যাপিরাস।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম মুদ্রণ ২০১৬। বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড। কোলকাতা : সাহিত্য অকাডেমি।

তথ্য উৎস : মোঃ জানুর সঙ্গে গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, নাজিম উদ্দিন রোড, জেলখানা, ঢাকা, সময় ৭.০৫-৮.০০, তারিখ : ০৩-০৭-২০২২।

তথ্য উৎস : মনসুর মিয়ার সঙ্গে গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, নাজিম উদ্দিন রোড, জেলখানা, ঢাকা, সময় ৪.৪৫-৬.০০ সন্ধ্যা, তারিখ : ০৫-০৭-২০২২।

তথ্য উৎস : মোঃ হানিফ পাপ্পুর সঙ্গে গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, নাজিম উদ্দিন রোড, জেলখানা, ঢাকা, সময় ৮.০০-৮.৪০ রাত, তারিখ : ০৪-০৭-২০২২।

Edward Lucie-Smith, 1988. Thames and Hudson Dictionery of Art Terms. London: Thames and Hudson Ltd.

Ian Chilvers (Edited), 1990. The Concise Oxford Dictionary of Art and Artists. New York: Oxford University Press.

Jonathan Metcalf and Della Thompson (Managing Editor) 2003. Revised & Updated Illustrated Oxford dictionary. New York: Oxford University Press.

Stan Smith and Professor H.F. Ten Holt (Consultant Editors), 1988, The Artist Manual London: QED Publishing Limited.

Zillur Rahman Siddiqui (Editor), January 2015. English-Bangla Dictionary. Dhaka: Bangla Academy.

বাংলাদেশের শিল্পকলায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা

মোঃ আব্দুল আযীয*

সারসংক্ষেপ : *শিল্পকলা চর্চার ইতিহাসে বরাবরই ক্যালিগ্রাফি একটি প্রাচীন আর্ট ফর্ম হিসেবে চর্চিত হয়ে এসেছে। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত ক্যালিগ্রাফি চর্চা হয় মূলত চীন, জাপান এবং মুসলিম দেশগুলোতে। উনিশ এবং বিশ শতকে ক্যালিগ্রাফি নতুনভাবে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে। তবে আরবীয়রা ক্যালিগ্রাফিকে একটি শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। আধুনিক সময়ে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয় শিল্পক্ষেত্রেও শিল্প হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। সম্প্রতি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নতুন করে ভাবনা শুরু হয়েছে ক্যালিগ্রাফি চর্চা নিয়ে। বাংলার চারুকলায় ক্যালিগ্রাফির উত্তরাধিকার এসেছে মোগল মিনিয়েচারের ঐতিহ্য থেকে। ৭০ দশকে চারুকলার প্রাচ্যকলা বিভাগে পাণ্ডুলিপি চিত্রণ সংযুক্তের সাথে ক্যালিগ্রাফি বিষয়টি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয় (মলয়বালা, ২০১৮ পৃ. ২৮৬)। এছাড়া গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগেও ক্যালিগ্রাফি সিলেবাসভুক্ত আছে। বর্তমান সময়ে বইপত্রের প্রচ্ছদ, ইলাস্ট্রেশন এবং লিপিকলাতে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার বেশি দেখা যায়। বইয়ের প্রচ্ছদে ক্যালিগ্রাফি স্টাইলে লেখার অগ্রনায়ক গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের অধ্যাপক শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরী। বই-পত্রের প্রচ্ছদ, পোস্টারে প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক শিল্পী হাশেম খানের তুলির টানে রয়েছে গ্রামীণ বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার বৈশিষ্ট্য। সময়ের সাথে সাথে ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও এর ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে অনেক শিল্পী ক্যালিগ্রাফি শিল্পচর্চা করছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে, হস্তলিখিত লোগো ডিজাইনে, ধর্মীয় চিত্রে, ঘোষণায়, স্মৃতিনথিতে, প্রশংসাপত্রে, জন্ম-মৃত্যু সনদে, মানচিত্র ও অন্যান্য লিখন কাজে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় পরিসরে ক্যালিগ্রাফি*

*সহযোগী অধ্যাপক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিভিন্ন মাধ্যমে চর্চা হচ্ছে। ফলে শিল্পাঙ্গনে ক্যালিগ্রাফি চর্চার বিষয়টি জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশের শিল্পকলায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা নিয়ে আলোচনা করা হলো এই নিবন্ধে।

শব্দসংকেত (Keyword) : শিল্পচর্চা, ক্যালিগ্রাফি, প্রাচ্যকলা, শিল্পকলা

ভূমিকা

ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে শব্দ আঁকার শিল্প যেখানে চমৎকার সব প্রতীক নিজস্ব স্টাইলে নিখুঁত ও সুন্দর করে সাজানো হয়। এ শিল্পে শব্দ ও হরফ লেখার ক্ষেত্রে দক্ষতা, ঐতিহ্য, ছন্দ, সৃজনশীলতার সংমিশ্রণ দেখা যায়। ইংরেজি Calligraphy শব্দটা গ্রিক শব্দ ক্যালিগ্রাফিয়া থেকে এসেছে। গ্রিক শব্দ Kallos এবং Graphein-এর সহযোগে গঠিত হয় ক্যালিগ্রাফিয়া। Kallos অর্থ সুন্দর, Graphein অর্থ লেখা। সুতরাং চমৎকার লেখন শিল্পকে বলা যায় ক্যালিগ্রাফি (উইকিপিডিয়া, ১৬ই জুন, ২০২২)। এই শিল্পে মোটা কলম বা তুলির সাহায্যে অক্ষরের নকশা করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, কোনো অক্ষর বা শব্দকে সুশৃঙ্খল ও সুসজ্জিতভাবে ফুটিয়ে তোলা। তবে যে কোনো অলংকার সজ্জিত সুন্দর লেখা ক্যালিগ্রাফি বা চারুলিপি নয়। ক্যালিগ্রাফি শিল্পতে শিল্পকলার শর্তগুলো বিদ্যমান থাকে। এছাড়া ক্যালিগ্রাফি যোগাযোগেরও একটি মাধ্যম। এর ভেতর টাইপোগ্রাফি, সাইনবোর্ড, রাইটিং ব্যানার, গ্রাফিতি, গ্রাফিক ডিজাইনের মতো নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। ক্যালিগ্রাফির লেখা পড়তে বা বুঝতে একটু অসুবিধা হলেও এর চমৎকার শৈল্পিকতা ও দৃষ্টিনান্দনিকতা সেটা ভুলিয়ে দেয়। বর্তমানে এই আর্ট ফর্মটি বিভিন্ন দেশ, ভাষা এবং ধর্মের মানুষ চর্চা করে। প্রাচ্যদেশিয় শিল্পচর্চার কলম দিয়ে চিত্র রচনার সাথে শিল্প খণ্ডিত লেখার সন্নিবেশ যেমন হতে হয়, তেমনি তুলি দিয়ে চিত্র নির্মাণের সাথে বিশেষ দক্ষতায় ক্যালিগ্রাফি করা হয়। প্রাচ্যের এই কলম ও তুলি দিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চা দুটি ধারায় প্রবহমান। বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে এ ক্যালিগ্রাফি চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে। এ আলোচনায় দুটি ধারার ক্যালিগ্রাফির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ক্যালিগ্রাফি চর্চা

বাংলাদেশে আরবি, বাংলা, ইংরেজি হরফে ক্যালিগ্রাফি চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চারুকলার প্রাচ্যকলা ও গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে দেখা যায়। বাংলা ও ইংরেজি হরফে ক্যালিগ্রাফির যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে হয়েছে তা বইয়ের প্রচ্ছদ, পোস্টার কিংবা বিজ্ঞাপন তৈরির কাজে নান্দনিক রেখাপ্রধান শিল্প হিসেবে নিশ্চিত হবার অবকাশ রয়েছে (চিত্র নং-১)। বইয়ের ভেতর ইলাস্ট্রেশনেও সেটি দেয়া দেখা যায়। অন্যদিকে পুস্তক চিত্রণ বিষয়ের সাথে ক্যালিগ্রাফি প্রাচ্যকলায় ৭০ দশকে অন্তর্ভুক্ত হলেও পরবর্তী সময়ে নিরীক্ষাধর্মী বা সৃজনশীল ক্যালিগ্রাফি চর্চা হিসেবে প্রাচ্যকলায় চর্চা হয়। আরবি ক্যালিগ্রাফি প্রাচ্যকলায় পেইন্টিংয়ে মোটিফ হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি শিল্পী আবদুস সাত্তারের হাত ধরে চালু হয় (মলয়বালা, ২০১৮ : পৃ. ২২০-২২১)। বলা যায়, বাংলাদেশে আরবি ক্যালিগ্রাফি চিত্রণে পরীক্ষা-নীরিক্ষাও শিল্পী আবদুস সাত্তার শুরু করেন (চিত্র নং-২)। এছাড়া ছাপচিত্রে আরবি ক্যালিগ্রাফি চর্চাও তিনি প্রথম করেন। ১৯৮৪ সালে মালয়েশিয়াতে ইসলামিক আর্ট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শিল্পী আবদুস সাত্তারের উডকাঠ মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মটির প্রদর্শনী হয়। এবং শিল্পকর্মটি আয়োজকরা সংগ্রহ করে (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২০২২: ১৩ই জুন)। তবে টাপেস্ট্রিতে শিল্পী রশিদ চৌধুরী এবং তার ছাত্র তাজুল ইসলাম ক্যালিগ্রাফি চর্চার পথিকৃৎ (চিত্র নং-৩)। পেইন্টিংয়ে সুলতানি আমলের শিলালিপির ফর্ম প্রথম দেখা যায় নব্বই দশকে শিল্পী মর্তুজা বশিরের কাজে। তার কালিমা তৈয়বা প্রদর্শনীর কাজগুলো এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নজির হয়ে থাকবে। প্রাচ্যকলায় যে সৃজনশীল ক্যালিগ্রাফি চর্চা হয়, তাতে ক্যালিগ্রাফি বৈশিষ্ট্যের তুলনায় চিত্রনির্মাণে আঙ্গিক ও অনুষঙ্গ হিসেবে ক্যালিগ্রাফিকে উপস্থাপনের প্রয়াস দেখা যায়। মোগল মিনিয়েচারে ক্যালিগ্রাফি যে অসাধারণ ক্যালিগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত, বাংলাদেশ আমলে প্রাচ্যকলার কাজে তা অনুপস্থিত, কারণ কলমের কাজ করার মতো শিক্ষক শিল্পী না থাকা অথবা বিষয়টিতে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়া। সুতরাং প্রাচ্যকলার ক্যালিগ্রাফি চর্চায় আরবি কোনো শৈলীর প্রয়োগ দেখা যায় না।

৮০'র দশকে পুরান ঢাকার মোগল স্থাপত্যের ফর্মের আদলে একটি আরবি ক্যালিগ্রাফি মোটিফ নির্ভর কিছু পেইন্টিং করেছিলেন শিল্পী আবু তাহের। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তা বেশ সাড়া ফেলেছিল। ইউনেস্কোর ভিউকার্ডে সেটা স্থান করে নিয়েছিল (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)।

প্রতিবছর চারুকলা অনুষদের বার্ষিক ও প্রাচ্যকলা বিভাগের বার্ষিক প্রদর্শনীতে ক্যালিগ্রাফি কাজের সরব উপস্থিতি দেখা যায়। এছাড়া প্রাচ্যকলার অ্যালামনাই ও শিল্পীদের গ্রুপ প্রদর্শনীতে ক্যালিগ্রাফির দেখা নিয়মিত পাওয়া যায়। মাধ্যম হিসেবে কাগজ, ক্যানভাস বহুল ব্যবহৃত হলেও একেবারে অপ্রচলিত মাধ্যম তালপাতায় ক্যালিগ্রাফি প্রথম করেছেন প্রাচ্যকলার পিএইচ ডি গবেষক মোহাম্মদ আবদুর রহীম (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ১৪ই নভেম্বর ২০২২)। প্রাচ্যকলা আয়োজিত এক তালপাতা ও পটচিত্র কর্মশালায় "হিলাইয়া" ফর্মে এ ক্যালিগ্রাফিটি তিনি করেন। প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের বাংলা আরবি ক্যালিগ্রাফি নীরিক্ষাধর্মী কাজ সাম্প্রতিক সময়ের প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত হয়েছে (চিত্র নং-১১)। এছাড়া গোপালচন্দ্র ত্রিবেদীর কাজেও বাংলা ক্যালিগ্রাফির কলমের কাজ রয়েছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্যালিগ্রাফি চর্চা

ইসলামের শিল্প হলো ক্যালিগ্রাফি। সৌন্দর্য ও জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই শিল্পকলাকে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিল্পীরা ব্যাপকভাবে ধারণ ও চর্চা করে চলেছেন। বাংলাদেশে সামাজিকভাবে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বড় অর্জন হচ্ছে-ক্যালেন্ডার, ভিউকার্ডে এর ব্যাপক ব্যবহার। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম শোভা পাচ্ছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিফট আইটেম হিসেবে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম প্রদান বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি একটি নান্দনিক শিল্পকলা হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দেশের সৌখিন শিল্পীগণ কর্মশালা ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ অথবা দেখে দেখে রং দিয়ে অথবা ক্যালিগ্রাফি কলম দিয়ে এর চর্চা করে চলেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রথম নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী করেন সাইফুল ইসলাম।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চার একটি আবহ তৈরি হয় শিল্পী ও এ বিষয়ে আগ্রহী লেখকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য প্রধানত দু ধরনের। এক. শৈলীভিত্তিক বা ট্রেডিশনাল-দুই. পেইন্টিং নির্ভর।

শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফির আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে নন্দনতত্ত্বের বিষয়টি এসে যায়। আক্ষরিক অর্থে শৈলী বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ দাবি করে সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকদের ওপর। শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফির নন্দন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এদেশের প্রচলিত আরবি হরফ সম্পর্কে সাধারণের মাঝে যে ধারণা রয়েছে সেটা বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ দেশের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশ আরবি হরফ বলতে কোলকাতা ছাপার কুরআনের হরফ বুঝে থাকেন। এই হরফ মূলত নিশ্চল বা গতিহীন টাইপ সেট। এতে হাতের লেখার জীবন্ত প্রবাহ খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও খুব সীমিত পরিসরে লক্ষ্ণৌ ছাপার কুরআন রয়েছে, তবু তা অধিকাংশের কাছে পাঠ করা কঠিন বলে অনুযোগ রয়েছে। সুতরাং শৈলীবিষয়ক নন্দন তত্ত্বের আলোচনায় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরবি হরফের শৈলীবিষয়ক বিশুদ্ধতা যেটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেটা আরব দেশসমূহে বিশেষ করে তুরস্কে রয়েছে। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মগুলো গত তিন দশক ধরে শিল্পীগণ চর্চা করে চলেছেন। তার শৈলীভিত্তিক বিবেচনা দেশীয় আঙ্গিকে যথেষ্ট আশাপ্রদ। এ কথা এজন্য বলা হচ্ছে, কারণ পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফিতে শৈলীর উৎকর্ষতা উন্নীত এবং আন্তরিক। নিবেদিতপ্রাণ শিল্পীগণ একক ও দলগত প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন। বিদেশের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তাদের সরব অংশগ্রহণও চোখে পড়ার মতো। ২০০৭ সালে তুরস্কের আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে ৫ জন শিল্পী-মোহাম্মদ আবদুর রহীম, আবু দারদা নুরুল্লাহ, মোরশেদুল আলম, মাসুম বিল্লাহ ও সিদ্দিকা আফরিন লামিয়া অংশগ্রহণ করেন (ইরাসিক ক্যাটালগ, ২০০৭, পৃ. ৮৮-১০৫)। শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশের সদস্য। যেহেতু প্রতি বছর আয়োজিত বিভিন্ন প্রদর্শনীতে শৈলীগত সৌন্দর্যরূপের পরিবর্তন হচ্ছে তাই সাম্প্রতিক শিল্পকর্মের এবং ৩ দশক আগের শিল্পকর্মের শৈলীগত পার্থক্য বেশ বড় ধরনের। সাম্প্রতিক ২০০৮ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা

একাডেমি ও সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ১০ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে শিল্পকর্মগুলোতে শৈলীর উৎকর্ষতা চোখে পড়ার মতো। হরফের গতি-প্রকৃতি, বিভিন্ন ফন্টের নিপুণ উপস্থাপন, কম্পোজিশনে নতুনত্ব, এমনকি সাম্প্রতিক মুয়াল্লা শৈলীর বেশ কয়েকটি মানসম্মত কাজ প্রদর্শনীতে স্থান পায়। আরবি ক্যালিগ্রাফির শৈলীভিত্তিক নন্দনতাত্ত্বিক স্বরূপ বা দর্শন কী? কয়েকটি বিষয় এর সাথে জড়িত, হরফের সঠিক সেইপ ও সাইজ যেটা আল খাত আল মানসুব বা আনুপাতিক লেখনীর সাথে সম্পৃক্ত এবং ইবনে বাওয়াবের মানসুব আল ফায়েক অর্থাৎ সৌন্দর্যময় লেখনী আক্ষরিক অর্থে আরবি ক্যালিগ্রাফির শৈলীভিত্তিক নন্দনতত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। এছাড়া ইয়াকুত আল মুস্তাসিমীর কলম কাটার কলা কৌশল এতে পূর্ণতা এনেছে, কালির প্রস্তুতবিধি, ব্যবহার নীতিমালা। কাগজ বা উপায়-উপকরণ একটি নির্দিষ্ট বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সুলুস লিপির আলিফটি ক্যালিগ্রাফি কলম দিয়ে লিখতে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। র'স বা মাথা হবে দেড় থেকে দুই ফোঁটা বা নোকতা বরাবর এবং জেসম বা শরীরটি ৫-৬ নোকতা বরাবর লম্বা হবে। শেষে মাথার নিচে কলমের ডান কোনা দিয়ে পূরণ করতে হয়। এটা হলো সাধারণ নিয়ম কিন্তু হরফের আকৃতি ও পরিমাপ ঠিক রাখার সাথে সাথে এর রৈখিক বাঁক ও ভাঁজগুলোও যথাযথ করতে হয়। এটি সরাসরি নন্দনতত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট যেটা হাতে কলমে ওস্তাদ ছাত্রকে শিখিয়ে থাকেন। আর ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ হাতে কলমে ক্যালিগ্রাফি শিখিয়ে আসছে ১৯৯৮ সাল থেকে। যেজন্য নবীন ক্যালিগ্রাফারদের বৃহৎ অংশটি শৈলীতে দ্রুত উন্নতি করতে পেরেছে। বাংলাদেশে শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফি যারা চর্চা করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন-শহীদুল্লাহ এফ. বারী, বসির মেসবাহ, মোহাম্মদ আবদুর রহীম, আবু দারদা, নেসার জামিল প্রমুখ। আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মে খাগের কলমের সরাসরি প্রয়োগ অনুপস্থিত। কিন্তু তিনি শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফির প্রতি যত্নশীল। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মে সুলস, নাসখ, দিওয়ানী, কুফী, রুকআ, নাস্তালিক, রায়হানী, মুহাক্কাক, ও মুয়াল্লা শৈলীর উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। রঙের মাধ্যম হিসেবে পানি রং, কালি, অ্যাক্রিলিক, তেল রং মেটাল রং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কাগজ, ক্যানভাস, কাঠ, পাথর, ধাতব মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি করা হয়ে থাকে। চিত্রকলায় যেমন শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফির উপস্থাপন রয়েছে

তেমনি স্থাপত্যে বিশেষ করে মসজিদ গাত্রে আরবি ক্যালিগ্রাফি ইদানীং বাংলা ক্যালিগ্রাফির শৈলীভিত্তিক উপস্থাপন দেখা যায়। শিল্পী আরিফুর রহমান ২০০২ সালে কুমিল্লার গুনাই ঘর ও ২০০৬ সালের শেষ নাগাদ বরিশালের গুঠিয়ায় ২টি মসজিদে বাংলা-আরবিতে শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফি করেছেন। শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম ২০০০ সালে চট্টগ্রামে পতেঙ্গায় সলগোলা জামে মসজিদ, ২০০৩ সালে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং থানার সুন্ধিসার জামে মসজিদ, ২০০৫ সালে ঢাকা সেনানীবাসে সেনা কেন্দ্রীয় মসজিদ, ২০০৪ সালে বারিধারা ডিওএইচএস মসজিদ, ২০০৬ সালে ঢাকা উত্তরার ৫নং সেক্টর জামে মসজিদ, ২০০৭ সালে হবিগঞ্জে শাহ সোলেমান ফতেহ গাজী (রহ.) দরগাহ-এ এবং ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে পুরান ঢাকায় একটি ইমারাত ভবনের চারটি ফটকে আগ্রার তাজমহলের ফটকের অনুরূপ সুরা ইয়াসিনের শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফি করেন (রহিম, ২০১৫, সংগ্রাম, ১৭ জানুয়ারি)। এসব স্থানে কুফি, সুলস, বেঙ্গল তুগরা, নাসখ, দিওয়ানী প্রভৃতি শৈলীতে ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে (চিত্র নং-৪)। শিল্পী মনিরুল ইসলাম, শহীদুল্লাহ এফ. বারীসহ কয়েকজন শিল্পী বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদ, ধর্মীয় ইমারতে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পে বৃহত্তম অংশ হচ্ছে পেইন্টিং নির্ভর। আর এই পেইন্টিং ক্যালিগ্রাফিতে প্রবীণ ও খ্যাতিমান শিল্পী মুর্তজা বশীরের শিল্পকর্ম এক অনন্য দৃষ্টান্ত (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)। বাংলাদেশের শিল্পকলার পেইন্টিংয়ে কীভাবে ক্যালিগ্রাফির সার্থক উপস্থাপন হতে পারে তা দেখিয়েছেন তিনি (চিত্র নং-৫)। তাকে বাংলাদেশের পেইটিং ক্যালিগ্রাফির পথিকৃৎ বলেছেন শিল্পবোদ্ধারা। প্রবীণ শিল্পী আবু তাহের, মরহুম শামসুল ইসলাম নিজামী, সবিহ-উল আলম, ড. আবদুস সাত্তার, সাইফুল ইসলাম, ইব্রাহিম মণ্ডল, আমিনুল ইসলাম আমিনসহ অর্ধ শতাধিক প্রবীণ নবীন শিল্পী আরবি-বাংলা হরফকে অনুষঙ্গ করে অসাধারণ সব ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং করে চলেছেন। শিল্পী আবু তাহের অর্ধবিমূর্ত ঢংয়ে পেইন্টিং করে থাকেন। আরবি হরফের পরস্পর ছন্দ ও গীতিময়তা একটি টান টান আকুলতা নিয়ে ফুটে ওঠে তার শিল্পকর্মে। রং, ফর্ম ও রেখার আশ্চর্য সম্মিলন দেখা যায় তার ক্যালিগ্রাফিতে। শিল্পী সবিহ-উল আলমের ক্যালিগ্রাফিতে ত্রিমাত্রিক ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে (চিত্র নং-৬)। শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তারের ক্যালিগ্রাফিতে প্রাচ্যকলার আবেশ মূর্ত হয়ে ওঠে (চিত্র নং-৭)। সাইফুল ইসলাম

নিজস্ব স্টাইল ও রঙের সমন্বয়ে এক ভিন্ন জগৎ তৈরি করেছেন। তার ক্যালিগ্রাফিতে তাই নাগরিক ক্যালিগ্রাফির মুখরতা দেখা যায়। ইব্রাহীম মণ্ডলের ক্যালিগ্রাফিতে বাংলার নিসর্গ, ফর্ম ও রেখার সাথে রঙের উজ্জ্বল্য উপস্থিতি দর্শককে আকর্ষণ করে। আমিনুল ইসলাম আমিন চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বাস্তব জগতের সাথে আধ্যাত্মিক ক্যালিগ্রাফির সমন্বয় তুলে ধরেন তার শিল্পকর্মে (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭) (চিত্র নং-৮)। নিপণ তুলির ছোঁয়ায় তার শিল্প ভাস্বর হয়ে ওঠে। এছাড়া আরও খ্যাতনামা ক্যালিগ্রাফি শিল্পী রয়েছেন, মাহবুব মুর্শিদ তিনি বাংলা বর্ণমালা বিন্যাসের মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের উপর ক্যালিগ্রাফি করেছেন। (চিত্র নং-৯) ভাস্কর রাসা কাঠ মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালার বিন্যাসে ভাস্কর্যে ক্যালিগ্রাফির রূপ দিয়েছেন (চিত্র নং-১০)। পেইন্টিং ক্যালিগ্রাফিতে হরফ যেহেতু অনুষঙ্গ হয়ে আসে, সেক্ষেত্রে শৈলীর উপস্থাপন হয় গণ্য। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে শৈলীও সমানভাবে পেইন্টিংয়ে উঠে আসে। তবে সেটা সংখ্যায় একেবারে হাতে গোনা। মূলত : পেইন্টিং ক্যালিগ্রাফিতে, রং, ফর্ম, দর্শন চিন্তা, ব্যাকরণ প্রভৃতি লক্ষ্য রাখা হয়। পেইন্টিংয়ে শিল্পকর্ম হতে গেলে যেসব উপাদান থাকা প্রয়োজন শিল্পী সেদিকে গভীর দৃষ্টি রাখেন। ১০ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে প্রায় সব শিল্পকর্মে এমন উপস্থাপন লক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পে পবিত্র কুরআন হাদিসের বাণী মুখ্য হয়ে আছে। এর সাথে শুধু হরফের কম্পোজিশন যেমন–আরিফুর রহমানের আলিফ বিন্যাস, ইব্রাহীম মণ্ডলের আলিফ নৃত্য শিল্পকর্মের কথা উল্লেখ করতে হয়। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পে বাংলালিপি-নির্ভর বহু উল্লেখযোগ্য কাজ রয়েছে। ড. আবদুস সাত্তার, সাইফুল ইসলাম, ইব্রাহীম মণ্ডল, আরিফুর রহমানসহ অধিকাংশ শিল্পী তাদের শিল্পচর্চায় বাংলা ক্যালিগ্রাফিকে সযত্নে লালন করেছেন। এসব শিল্পকর্মে হরফের প্রান্তীয় স্ট্রোকগুলো প্রলম্বিত করে এবং কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে হরফকে ভেঙেচুরে সমন্বয় ও ছন্দায়িত করার প্রয়াস চালানো হয়। অনেক শিল্পী তাদের কাজে বাংলা ক্যালিগ্রাফির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে প্রধান্য না দিয়ে আরবি কুফি, সুলুস প্রভৃতির আদলে করতে চেয়েছেন, এতে অনেক শিল্পবোদ্ধা ভিন্ন মতোমতও ব্যক্ত করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে পেইন্টিংয়ে যে বাংলা ক্যালিগ্রাফি দেখছি সেটা ৯০ দশকের শেষ দিকেও তেমন লক্ষ করা যায়নি। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্প আক্ষরিক অর্থে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তিন দশক পর এই শিল্পের পথ চলায়

প্রয়োজনীয় উপাদান উপকরণ যেমন সহজলভ্য হয়েছে তেমনি এর প্রতিষ্ঠায় একটি মজবুত ভিত্তিও পেয়েছে। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে জানার জন্য বইপত্র, পত্রিকা, ম্যাগাজিনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ সম্পর্কে ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটে এখন দেখা মেলে। একটি কথা না বললেই নয়, বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য শিল্পীদের ব্যক্তিগত প্রয়াসকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিতে হয়। সেই সাথে যারা এ শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাদের অবদানও কম নয়। লেখালিখি, গবেষণার মাধ্যমে এ শিল্পের ইতিহাস সংরক্ষণ গতি প্রকৃতি মূল্যায়ন ও সবার কাছে এর পরিচয়, সৌন্দর্য, গুরুত্ব, অপরিহার্যতা তুলে ধরার জন্য নিরলস সাধনা যারা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের অবদান যেন আমরা ভুলে না যাই। এদেশে ক্যালিগ্রাফির উন্নয়ন, প্রসার ও জনপ্রিয় করতে ইতোমধ্যে যে রচনা সম্ভার ও বইপত্র প্রকাশ পেয়েছে তা নিতান্ত কম নয়। শতাধিক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, প্রতিবেদনের সাথে বাংলাভাষায় এর ইতিহাস ক্রমধারা, শৈল্পিক বিশ্লেষণ নিয়ে গ্রন্থও রচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির ওপর সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল, পিএইচ ডি ডিগ্রিও নিচ্ছেন অনেকে। ক্যালিগ্রাফির এই বিস্তৃতিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেশ লক্ষণীয় প্রভাব পড়েছে। ৮০ দশকের গোড়ার দিকে ক্যালেন্ডারে সিনেমার নায়িকা ও নারীচিত্র প্রধান উপাদান ছিল। কিন্তু এখন সেখানে ক্যালিগ্রাফি, মসজিদ বা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীই একচ্ছত্র স্থান দখল করে চলেছে। সরকারি বেসরকারি ইমারতে ইন্টেরিয়র সজ্জায় ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম বড় ধরনের স্থান করে নিয়েছে। এমনকি বিদেশে সরকারি উপহার সামগ্রী প্রেরণের ক্ষেত্রে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম গুরুত্ব লাভ করেছে। ব্যক্তি পর্যায়ে বহু ইমারতে ক্যালিগ্রাফি মুরাল, টেরাকোটা ফ্রেস্কো প্রভৃতি প্রধান্য লাভ করছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ক্যালিগ্রাফির যে বিস্তৃতি, তার মূল্যায়নে দেশের প্রথিতযশা কয়েকজন শিল্পীর মন্তব্য এখানে তুলে ধরছি। শিল্পী মুর্তজা বশীর বলেন, আমি একজন পেইন্টারের দৃষ্টি দিয়ে এটা বলতে পারি অক্ষর দিয়ে পেইন্টিং করার একটি প্রয়াস এখানে রয়েছে যাতে ক্যালিগ্রাফি ছাপিয়ে নান্দনিক রসের অনুভব আমরা পেতে পারি (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)। শিল্পী আবু তাহের বলেন, বেশ কিছু শিল্পী গভীর মমত্ব ও আনুগত্য নিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চায় মনোযোগ দিয়েছেন এবং আনন্দের বিষয় এদের মধ্যে কেউ কেউ শিল্পবোদ্ধাদের মনে গভীর রেখাপাত করতে

সক্ষম হয়েছেন (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)। শিল্পী সবিহ-উল আলম বলেন, ১৬২টি ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম নিয়ে ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০৩ গুণে মানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছেছে, এটা নিঃসন্দেহে যেমন–আনন্দের তেমনই গৌরবের (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)। স্পেন প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পী মনিরুল ইসলাম ক্যালিগ্রাফিকে মিস্ট্রিক্যাল ফর্ম উল্লেখ করে বলেন বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)। এজন্য তিনি শিল্পীদেরকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। ১২তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে গ্র্যান্ড প্রাইজ প্রাপ্ত ইরানের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফি শিল্পী সিদাঘাত জাব্বারি বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি চর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেন (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)। এজন্য তিনি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীগুলোর আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

ক্যালিগ্রাফির প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক চর্চার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায় বহমান। বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটে এর প্রাতিষ্ঠানিক ধারা চলমান রয়েছে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায় চর্চা চলছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় উপায়, উপকরণ, করণ কৌশল, সিলেবাস, কারিকুলাম সবকিছু নির্দিষ্ট শিক্ষাকমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় ফলে শিল্পের গুণাবলিসহ টেকসই ক্যালিগ্রাফির শিক্ষা এখানে বিদ্যমান। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীরা বাণিজ্যিক বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন তাই অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায় শিল্পের গুণাবলিকে মানসম্পন্ন পর্যায়ে পাওয়া সম্ভব নয়। তারা সাধারণত আরবি ও বাংলা হরফে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় শিল্পশৈলী ও সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দেয়া হয় এবং তুলনামূলকভাবে বাংলা হরফে বেশি ক্যালিগ্রাফি চর্চা করা হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায় করণ-কৌশলে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও ক্যালিগ্রাফির শৈলীতে বড় ধরনের অসংগতি থেকে যায়। প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় ক্যালিগ্রাফির নিরীক্ষাধর্মী কাজ প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত হয় কিন্তু বাংলাদেশে ক্যালিগ্রফির মৌলিক স্টাইলের শিক্ষকের অপ্রতুলতা রয়েছে। শিল্পের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ক্যালিগ্রাফি চর্চার পর্যাপ্ত শিক্ষক তৈরি হলে এর পূর্ণতা এসে

যাবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায় এখন পর্যন্ত শৈলী ও মাধ্যম উপায়-উপকরণে সৃজনশীল বিষয়টি উপেক্ষিত। এখানে কপিপেস্ট পদ্ধতিতে নকল কাজ ও উৎপাদনের বিষয়টি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে স্থাপত্য ও পেইন্টিং ক্যালিগ্রাফিতে এই নকলের আধিক্য অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায় বড় দুর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মোটাদাগে, ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক মানসম্পন্ন চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় সহজলভ্য।

উপসংহার

বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্প স্বতন্ত্র ও বলিষ্ঠ শিল্প মাধ্যম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্যালিগ্রাফি চর্চায় একটি সমৃদ্ধ ধারা বয়ে চলেছে, তা উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়। পর্যায়ক্রমে শিল্পটি অনেক দূর এগিয়ে গেছে, যা এখন একটি জনপ্রিয় ও মানসম্পন্ন কলা হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফিকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে শিল্পীদের ব্যক্তিগত প্রয়াস ও পৃষ্ঠপোষকদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি-বেসরকারি ইমারত, ভাস্কর্য মসজিদ, ক্যালেন্ডার, বইপত্র, মুরাল ইত্যাদিতে ক্যালিগ্রাফির প্রসার লক্ষণীয়। এছাড়াও ক্যালিগ্রাফির প্রদর্শনী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছেছে যা অত্যন্ত গৌরবের। তবে সামগ্রীক শিল্পচর্চায় ক্যালিগ্রাফি নিয়ে সেভাবে আলোচনা ও প্রকাশনা লক্ষ করা যায় না। ক্যালিগ্রাফি চর্চা বাংলাদেশে এখনো সেইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করেনি। শুধু প্রশিক্ষণ কোর্স, ওয়ার্কশপ, ডেমনস্ট্রেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা একটি বিভাগও হতে পারে। সে বিবেচনায় বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ব্যক্তিগতভাবে ক্যালিগ্রাফি আর্কাইভ গড়ে উঠছে। কিন্তু ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য একটি স্থায়ী গ্যালারি এখনো নেই। যে কোনো শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা শিল্পটিকে টেকসই ও উন্নয়নে মূল ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির অপ্রাতিষ্ঠানিক চর্চার প্রসারতা প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার তুলনায় বেশি। ফলে এ শিল্পের প্রকৃত উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যায় না। ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা বৃদ্ধির উদ্যোগ সংশ্লিষ্টদের নিতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

এবনে গোলাম সামাদ (১৯৭৩), ইসলামী শিল্পকলা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (১৯৯৫), মুসলিম লিপিকলা, ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

ড. আব্দুস সাত্তার (২০০৩), প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুর রহীম (২০০২), ইসলামী ক্যালিগ্রাফি, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুর রহীম (২০১০), সুলস লিপিশৈলী, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

মুহাম্মদ নূরুর রহমান (২০০৯), আরবি ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

মলয় বালা (২০১৮), বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মলয় বালা (২০১৮, পৃ. ২৮৬), বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সরসী কুমার সরস্বতী (১৯৭৮), পাল যুগের চিত্রকলা আনন্দ, কোলকাতা।

Shah Muhammad Shafiqullah (2012), Calligraphic Art in Sultanate Architecture, Dhaka.

সহায়ক প্রবন্ধ, রচনা, প্রতিবেদন।

ইরসিকা ক্যাটালগ, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক, ২০০৭।

ক্যালিগ্রাফি আর্ট পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, আগস্ট-২০০৩, ঢাকা।

ক্যালিগ্রাফার মোহাম্মদ আব্দুর রহীমের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে

সংগৃহীত, ১৪ই নভেম্বর, ২০২২।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, শিল্পী আব্দুস সাত্তার, ১৩ই জুন, ২০২২।

মোহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক (২০১৩), বাংলার ইতিহাসে আরবি ও ফারসি শিলালিপি চর্চার গুরুত্ব, শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুর রহীম (২০১৫), বাংলা ভূখণ্ডে ক্যালিগ্রাফির পদযাত্রায় শিলালিপির ভূমিকা, সংগ্রাম, ১৭ই জানুয়ারি।

ইন্টারনেট

https://en.wikipedia.org/wiki/ক্যালিগ্রাফি #ইতিহাস.....১৮.৩০টার সময়, ১৬ই জুন ২০২২।

ক্যালিগ্রাফি চিত্র সূচি

চিত্র নং-১
শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর পোস্টার
তথ্যচিত্র : প্রথম আলো প্রকাশ :
১১ই মার্চ ২০২২, ১৪:০০

চিত্র নং-২
শিল্পী আব্দুস সাত্তারের ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ক্যাটালগ
৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২

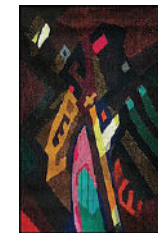

চিত্র নং-৩
শিল্পী রশিদ চৌধুরীর ট্যাপেস্ট্রি
ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র :
Daily Observer, Monday,
December 15.2014

চিত্র নং-৫
শিল্পী মর্তুজা বশিরের ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ক্যাটালগ
৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২

চিত্র নং-৬
শিল্পী সবিহ-উল আলমের ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ক্যাটালগ
৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২

চিত্র নং-৪
শিল্পী আব্দুর রহিম এর মসজিদ গাত্রে
ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফি সংগ্রহ

চিত্র নং-৭
শিল্পী আব্দুস
সাত্তারের ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ক্যাটালগ
৫ম ক্যালিগ্রাফি
প্রদর্শনী-২০০২

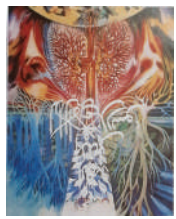

চিত্র নং-৮
শিল্পী আমিনুল ইসলামের
ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ক্যাটালগ
৫ম ক্যালিগ্রাফি
প্রদর্শনী-২০০২

চিত্র নং-৯
শিল্পী মাহবুব মুর্শেদের ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : প্রতিদিনের সংবাদ
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

চিত্র নং-১০
ভাস্কর রাসার ক্যালিগ্রাফি, তথ্যচিত্র : ক্যাটালগ
৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২

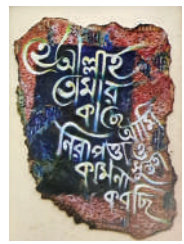

চিত্র নং-১১
শিল্পী মিজানুর রহমান ফকিরের বাংলা ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০২২

কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলায় ডিজাইনের নানাবিধ অনুষঙ্গ

আব্দুস সাত্তার*

সারসংক্ষেপ : *বাংলাদেশের চিত্রকলা জগতের অন্যতম প্রধান শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩৪-২০১৪)। ১৯৪৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হকের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ)-এর দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। তাঁর চিত্রকলার ভুবন বৈচিত্র্যময়তায় পরিপূর্ণ। ব্যবহারিক শিল্পকলার নানাবিধ দিক যেমন– প্রকাশনা, গ্রন্থ এবং পত্রিকার ইলাস্ট্রেশন ও বিশেষ করে টাইপোগ্রাফির ক্ষেত্রে তাঁর যে বিপ্লবাত্মক ভূমিকা তা থেকেই মানুষ কাইয়ুম চৌধুরীকে চেনেন। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহারিক শিল্পের নানা শাখায় বিচরণ, ডিজাইন সেন্টারে নকশাবিদ হিসেবে যোগদান ও গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে শিক্ষকতা, এর সবকিছুর প্রভাবেই অগ্রসর হয়েছে কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলার চর্চা। তাঁর ক্যানভাসে জাগ্রত হয় মানুষ, প্রকৃতি, পশু-পাখি, নৌকা, মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজবাস্তবতা এক বিশেষ শৈলীতে। কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলায় নানারকম মোটিফ বা নকশার ব্যবহার ও ডিজাইনিক সেন্স এক ভিন্ন মাত্রা দান করে। তাঁর চিত্রকলার স্বরূপ উন্মোচনে ডিজাইনের নানাবিধ অনুষঙ্গের রূপায়ণ ও লোকশিল্পের আঙ্গিক প্রয়োগের তুলনামূলক আলোচনাই এই প্রবন্ধের মূল কথা।*

শিল্পকলার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চেতনার সম্পর্ককে একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট একজন শিল্পীর সচেতন উপলব্ধি ও একাত্মতা হিসেবে বর্ণনা করা যায়।[১] সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মে জাতিসত্তার পরিচয়কে বিধৃত করার এই

*সহযোগী অধ্যাপক, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আকাঙ্ক্ষা জাতীয় কৃষ্টির নির্যাস ও মৌল রূপকে সন্ধান করারই আকাঙ্ক্ষা।[২] আর এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই কাইয়ুম চৌধুরী তাঁর চিত্রকর্ম নির্মাণ করেছেন।

বাংলাদেশের শিল্পকলার পথ নির্মাণে যেসব শিল্পী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, কাইয়ুম চৌধুরী তাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশের চিত্রশিল্পের সমৃদ্ধির পেছনে তাঁর বিপুল ভূমিকা তাই বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। তাঁর চিত্রকর্মের স্বতন্ত্র ডিজাইন, মোটিফ বা নকশা যাই বলি না কেন, তা চিত্রপটে নিজস্বতা ও আকর্ষণীয় মাত্রা দান করে। কাইয়ুম চৌধুরী সবসময়েই তাঁর শিল্পকর্মে সন্ধান করেছেন নিজস্ব শিল্পীসত্তা, জাতির ঐতিহ্য ও জাতিসত্তার নিবিড় অধ্যয়ন। অনুশীলন ও চর্চার মধ্য দিয়েই যে নিজস্ব ও দেশজ শিল্পীসত্তা গড়ে তোলা যায় সেটা নিয়ে কাইয়ুম চৌধুরীর মধ্যে কোনো দ্বিধা ছিল না।[৩]

১৯৫৪ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কাইয়ুম চৌধুরী ফাইন আর্টস বিভাগের পাঠ সমাপ্তি করেন। নবগঠিত আর্ট কলেজে যেসব ছাত্র ভর্তি হয়েছিলেন তাঁদের কারোরই পরবর্তীকালে পেশা কী হবে, সে সম্পর্কে খুব একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তাঁদের একমাত্র অভিলাষ ছিল শিল্পী হয়ে ওঠা। ছাত্রজীবনেই কাইয়ুম চৌধুরী বইয়ের প্রচ্ছদ ও ইলাস্ট্রেশন কাজে সুনাম অর্জন করেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে কাইয়ুম চৌধুরী নানা ধরনের ব্যবহারিক কাজ ও বিজ্ঞাপনী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, করেছেন বইয়ের প্রচ্ছদ ও সচিত্রকরণের কাজ। তখন পূর্ববঙ্গে প্রকাশনার সূচনাকাল মাত্র। পাঠ্যবইয়ের বাইরে সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশনা খুব কমই হতো। তখন মুদ্রণ পদ্ধতি ও রঙিন প্রচ্ছদ ছাপার রীতিও ছিল সেকেলে ধাঁচের। ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণ বাংলা সাহিত্য ও প্রকাশনায় আশার আলো তৈরি করেছিল। কিছুকাল ছায়াছবি নামে একটি চলচ্চিত্র সাময়িকী যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত জহুরুল হকের সাত-সাঁতার গ্রন্থের প্রচ্ছদে একটি পালাবদল ঘটালেন। সচিত্র সন্ধানী পত্রিকাতে তাঁর অঙ্কন, টাইপোগ্রাফিবোধ ও ডিজাইনে প্রতিফলিত হচ্ছিল আস্থার ভাব ও নতুনত্ব।[৪] পেশাগত জীবনে অঙ্কন শিল্পী হিসেবে ইংরেজি দৈনিক অবজারভার-এ চাকরিরত অবস্থায় কবি জসীমউদদীনের জীবন কথা (১৯৬৪) বইয়ের প্রচ্ছদ করেন এবং একই বছরে এই বইয়ের জন্য জাতীয়

গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদ শিল্পীর পুরস্কার লাভ করেন। এই বইতে কাইয়ুম চৌধুরী বাংলার লোকসংস্কৃতির জামদানি শাড়ির ডিজাইন ব্যবহার করে প্রচ্ছদ শিল্পে এক নতুন বার্তা দিলেন। বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণের সূত্রে এদেশের বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এদের মধ্যে কবি জসীমউদদীন, শওকত ওসমান, ফররুখ আহমেদ, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৫] ১৯৯৮ সাল থেকে আমৃত্যু কাইয়ুম চৌধুরী দৈনিক প্রথম আলোর শিল্প উপদেষ্টা ছিলেন। দেশের প্রকাশনাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় তুলে ধরার জন্য তাঁর অবদান অসামান্য।

চিত্র-১ : বইয়ের প্রচ্ছদ, পোস্টার ও গানের সিডি কভার ডিজাইন

ব্যবহারিক শিল্পের নানাবিধ কর্মে বিচরণ করলেও কাইয়ুম চৌধুরী কিন্তু হাঁটছিলেন ছবি আঁকার পথে। তিনি যতই শিল্পের গভীরে নিমগ্ন হচ্ছিলেন, ততই তাঁর নিজস্ব শৈলীর বিচ্ছুরণ ঘটে। কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলায় ব্যবহারিক শিল্পের নানাদিক তাঁর নিজস্ব স্টাইল বা বৈশিষ্ট্য তৈরিতে সহায়ক হয়েছিল। কাইয়ুম চৌধুরীর ছবিতে মানুষ নিসর্গ বেষ্টিত। কখনো তিনি দৃষ্টিনন্দন বৃক্ষলতার মোটিফের স্নিগ্ধ পরিমার্জনায় শিল্পের নান্দনিক সিদ্ধি অনুসন্ধান করেন। তাঁর কাজে সুবিন্যস্ত মোটিফগুলো শূন্য স্পেসে দ্বিমাত্রিক ডিজাইনের শর্ত স্পষ্ট করে তোলে।[৬] তাঁর কাজের বিষয়সমূহ গাছপালা, পশু-পাখি, নদী, নৌকা, ঘর-গৃহস্থালি, মানুষের শরীরের বিপরীতে ইলাস্ট্রেশন। তাঁর চিত্রে চারপাশের চাপের অভিজ্ঞতা শরীর বহন করে। তিনি চেনা বিষয়ের মধ্যে শরীরকে প্রকাশভঙ্গিম করে তোলেন। তাঁর ক্যানভাসে ফিগার শুদ্ধ রঙে উচ্চকিত, কিন্তু চারপাশের বিষয় নয়।[৭]

কাইয়ুম চৌধুরী তাঁর চিত্রকলায় স্পেসের বিভাজনে যে ডিজাইন বা নকশার সমন্বয়ে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করেন তা আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক। প্রতিটি বস্তুর সরলীকরণে একধরনের কাঠামোগত আভাস ও ডিজাইনিক।

চিত্র-২ : প্রতিবাদ ও পালতোলা

আদলে দ্বিমাত্রিক রঙের সন্নিবেশ ঘটান। আবার একই সাথে তাঁর চিত্রকলায় সমতল রঙের উপর অন্য রঙের বিরোধাভাস ঘটান।

যে কোনো চিত্রকর্মে রেখাঙ্কন অথবা বর্ণবিভা, আলো এবং অন্ধকার একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। শিল্পীও তাঁর শিল্পের অভিব্যক্তিকে কোনো একটি ক্রমধারার বোধ্যগম্যতার মধ্যে আনেন না। শিল্পকর্মে প্রকাশময়তার পরিতৃপ্তির জন্য কোনও শিল্পীর কাছে একটিমাত্র উপকরণই সামগ্রীক বোধের উৎসাহ হতে পারে, তখন অন্য উপকরণগুলো আনুষঙ্গিকরূপে বিদ্যমান থাকবে।[৮] তদ্রূপ কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলায় বিষয়বস্তুর সাথে অন্য উপকরণগুলো আনুষঙ্গিক হিসেবে ডিজাইন মোটিফে উপস্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে তাঁর 'জীবন তৃষ্ণা' পেইন্টিংএ সেল্ফ পোর্ট্রেটের সাথে গাছপালা, পাখি, মাছ, নদী ও নৌকাকে ডিজাইনিক ফর্মে বিন্যস্ত করেছেন। কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্র হচ্ছে ঐকতানের মতো যেখানে রংই প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং রঙের সাহায্যেই ডিজাইনিক ফর্ম উদ্ভাসিত হচ্ছে। আমরা ফবিষ্ট শিল্পী মাতিসের অনেক চিত্রকর্মেই রংকে সকল উপকরণের সর্বস্ব হিসেবে দেখি। শিল্পী হেনরি মাতিসের The sorrows of the king, 1952, gouache on canvas চিত্রকলায় দ্বিমাত্রিক ফর্মের যে ডিজাইন ও উচ্চকিত রঙের ব্যবহার দেখতে

পাই, তা কাইয়ুম চৌধুরীর অনেক চিত্রকর্মের সাথে সাদৃশ্যের ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়া মাতিসের ১৯০৮ সালে করা Red Room চিত্রকর্মে সমতল রঙের উপর যে ডিজাইনিক ফিগার, জানালা ও বস্তুগত উপাদানকে এক সুতোয় গেঁথেছেন, তেমনি কাইয়ুম চৌধুরীও তাঁর চিত্রকলার সাবজেক্টকে নানারকম মোটিফ, আল্পনা ও দেশীয় লোকজ উপাদানের সমন্বয়ে বিন্যাস করেন। লোককলাকে আশ্রয় করে যাঁদের ঐতিহ্যিক চেতনা আবর্তিত ও নির্মিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে কাইয়ুম চৌধুরী অন্যতম। তবে এক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক রশিদ চৌধুরী থেকে তাঁর ভিন্নতা দৃশ্যমান। রশিদ চৌধুরী ঐতিহ্যের সন্ধান করেন লোকজীবনের উপচার, মূর্তিকলা, গল্পগাথা ও শৈশবস্মৃতির রূপায়ণ করেন প্রতীকী উপস্থাপনায়। অন্যদিকে কাইয়ুম চৌধুরীর কাছে লোককলার বিষয়বস্তু মূল্যবান নয়। তিনি বিষয় থেকে বিযুক্ত করে নেন এর মোটিফ ও নকশা এবং তাকে প্রয়োগ করেন তাঁর নিজস্ব প্রেক্ষাপটে। লোকশিল্পের কারুকাজ যেখানে প্রোজ্জ্বলভাবে উপস্থিত–হাতপাখা, নকশিকাঁথা, আল্পনা, মাটি ও কাঠের পুতুল, বাঁশ-বেতের কারুকাজ, নৌকার গলুই কিংবা পিঠার ছাঁচ, শাড়ির পাড়, শখের হাঁড়ি–এ সবই তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে, লোকশিল্পের ডিজাইনের জ্যামিতিকতাকে তিনি দ্বিমাত্রিক চিত্রতলে সংহত করেন এবং লৌকিক ফর্ম ও নকশাকে একটি নির্বস্তুক সংগঠনের মাত্রায় ব্যবহার করেন। নিসর্গই তাঁর বিষয়ের মৌলরূপ। বাংলার নিসর্গ থেকে তিনি উপাদান চয়ন করেন। গাছ, পাতা, সূর্য, পাখি, নৌকা, মাছ, সাঁকো ইত্যাদি চিরায়ত গ্রামীণ নৈসর্গিক উপাদানকে তিনি নিজস্ব জ্যামিতিক বিন্যাসে গড়ে নেন এবং লোকশিল্পের মোটিফ ও নকশায় জড়িয়ে গড়ে তোলেন নিজস্ব কারুকাজ। তাঁর প্রথম দিকের বর্ণবিন্যাস নমিত ও পেলব, দৃষ্টিতে এনে দেয় স্নিগ্ধতা ও গীতলতা। নৌকা ও জলের পারস্পরিক সম্পর্ক তাঁর প্রিয় বিষয়, নৌকার গলুই-এ অঙ্কিত চোখ তাঁর প্রিয় প্রতীক।[৯] তাঁর ১৯৬৩তে "পালতোলা নৌকা" ও ১৯৬৭তে "নৌকা" ছবিতে নানারকম আল্পনার সমন্বয়ে যেভাবে নৌকা গলুই ও তার পালকে চিত্রিত করেছেন তা তাঁর নিজস্বতাকে বহুগুনে প্রসারিত করেছে। তিনি স্পেসে রং, ফর্ম ও ডিজাইনকে সমন্বিত করে এক ধরনের ঐকতান সৃষ্টি করেছেন। ১৯৫৬ সালে আঁকা কাইয়ুম চৌধুরীর চন্দ্রালোকে নৌকা ছবিতে স্পেস থেকে ডিজাইনিক কাঠামোতে নৌকা, চাঁদ, মাছ, পাতা, পানিতে চাঁদ ও নৌকার প্রতিবিম্ব ও ভাসমান পাতাকে সংগঠিত করে যে আবহ তৈরি করেছেন

তা তাঁর চিত্রকলাকে ডিজাইনিক বিন্যাসের পরিপূর্ণতা দান করে। ২০১৪ সালের ১২ই মে শিল্পকলা বিষয়ক ম্যাগাজিন 'শিল্পপ্রভা'র পক্ষ থেকে মাহাবুব রেজা শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি বলেন, মানুষের জীবনের অন্য আরেক নাম রং। পৃথিবীতে যত রং আছে আমি মনে করি তার চেয়েও বেশি রং আমাদের লোকশিল্পে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমাদের লোকশিল্প পৃথিবীর যে কোনো লোকশিল্পের চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। বাংলার লোকশিল্প আমাকে শিল্পী করেছে। তাঁদের রং ব্যবহারের দিকটি ও ফর্মকে আমি অনুধাবন করি। তাদের কাজের মধ্যে সিমপ্লিফিকেশন-এর বহুমাত্রিক ব্যবহার আমাকে খুবই আকৃষ্ট করে।[১০]

চিত্র-৩ : ৭ই মার্চ'৭১ ও দুপুরের নদী

নকশা বা ডিজাইন কী করে পেইন্টিং হয়ে উঠে, এর অনন্য দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই তাঁর নকশা চিত্রকর্মটিতে। এই ছবিতে বর্ণের পরতে নকশার উপস্থাপনায় বৃক্ষ, পাতা ও পাখিকে বিমূর্ততার চিত্রভাষা সৃষ্টি করেছেন তা স্মরণীয়। এ ধরনের আরেকটি চিত্রকর্ম কাইয়ুম চৌধুরীর ১৯৬৭ সালে অঙ্কিত গোধূলি-২ এবং ১৯৭২ সালে ৭ই মার্চ ৭১, ও শহীদ ৭১, ১৯৭৪ সালে শেষ গ্রীষ্মের লাল ছবিতে অত্যন্ত কৌশলে ও সুনিপুণভাবে তিনি বিষয়বস্তুকে ডিজাইনের নানাবিধ অনুষঙ্গে কোথাও ভারী বর্ণলেপনে প্রতীকী রূপে উপস্থাপন করেছেন, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও নিজস্বতার দাবি রাখে। এ প্রসঙ্গে আমরা জার্মান শিল্পী পল ক্লি'র কিছু চিত্রকর্মকে তাঁর সাথে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি। পল ক্লি তার চিত্রকর্মে কালার ও

ফর্মকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু কাইয়ুম চৌধুরী কালার ও ফর্মের সাথে দেশজ উপাদানের সমন্বয়ে নকশাকে প্রধান্য দিয়েছেন।

সৈয়দ আলী আহসান তার শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য গ্রন্থে লিখেছেন–পল ক্লির চিত্রকর্মকে সুর সঙ্গতি হিসেবে বিবেচনা করা চলে অথবা সংগীতের তরঙ্গায়িত উচ্ছলতার সঙ্গে–মনে হয় তিনি যেন সংগীতের সুর সাম্যকে রেখাঙ্কনের মাধ্যমে পরিদৃশ্যমান করেছেন। কখনো এগুলোকে শিশু কল্পনার অভিনিবেশ বলেও মনে হয়–মনে হয় একটি অত্যাশ্চর্য পবিত্রতার অত্যন্ত সহজ রূপকর্মে সর্বজনীন কোনো সত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। ক্লীর চিত্রকর্মকে বলতে পারি কবিতার দৃশ্যলোক। পল ক্লি এক সময় লিখেছেন, "পাখিরা যেভাবে গান গায় আমি সেই স্বচ্ছলতার চিত্র আঁকি।" তাঁর চিত্রের পৃথিবীতে আমরা ফুল দেখি, মাছ দেখি, তরঙ্গ দেখি, গাছ দেখি, গৃহাঙ্গন দেখি এবং সর্বস্বের মধ্যে আবার দেখি মানুষকে। কখনো বিমূর্ততায়, কখনো দ্বিমাত্রিক স্বাক্ষরে তারা জীবন্ত সচলতার রশ্মিরেখার মতো।

কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকর্মে এক ধরনের সরলতা আছে। নকশা আছে, আছে দেশপ্রেম, লোকশিল্প ও ঐতিহ্যের শেকড়। আছে সুরেরও ঐক্য। তিনি ছিলেন সংগীত অন্তঃপ্রাণ। শচীন দেববর্মন ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরীর পিতৃবন্ধু। কাইয়ুম চৌধুরীর শৈশবকালেই তাঁর বাবা কিনেছিলেন স্যুটকেস আকৃতির এক গ্রামোফোন। রাতের বেলা সন্তানদের পড়াশোনা শেষে সেই গ্রামোফোনে গান শোনা ছিল পুরো পরিবারের এক নিয়মিত অভ্যাস। পারিবারিকভাবেই কাইয়ুম চৌধুরীর গানের সাথে সখ্যতা এবং তাঁর কাছে অনেক দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড সংগ্রহে ছিল। এসব রেকর্ডের গানই শুধু তাকে আকৃষ্ট করেনি। তিনি রেকর্ডের ওপরকার স্লিভ বা লেভেলের ডিজাইনেও আকৃষ্ট হয়েছিলেন কৈশোর থেকেই।[১১] কাইয়ুম চৌধুরীর ১৯৭৬ সালে তেল রঙে আঁকা শৈশব স্মৃতি-২, উষা, শৈশব স্মৃতি-৩ এবং ১৯৭৭ সালে কার্তিকের অপরাহ্ণ, ১৯৭৮ সালে আমার গ্রাম-১, ১৯৭৯তে আমার গ্রাম-৩, ১৯৮১ সালে জলমগ্ন গ্রাম-১, জলমগ্ন গ্রাম-২, ১৯৮৩তে জলমগ্ন গ্রাম-৩, ১৯৮৭ সালে দুপুরের নদী, ১৯৯০তে জোয়ার উল্লেখযোগ্য। এ পর্বের সমস্ত ছবিতেই তিনি নানাভাবে ডিজাইন বা নকশার সমন্বয়ে চিত্রকর্মকে বিষয়বস্তু ও বর্ণ মাধুরীর আবহে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ছবির ডিজাইন দর্শককে আকর্ষণ করে, বর্ণবিভা বিমোহিত করে।

চিত্র-৪: শহীদ ৭১ ও গহনা নৌকা

তিনি সংগীতকে যেমন ভালোবেসে অন্তরে ধারণ করতেন, তেমনি তাঁর ছবিতেও তৈরি করতেন একধরনের সুরের মূর্ছনা, তাঁর ছবির কাঠামো বা ডিজাইন কাঠখোট্টা নয়, বরং রোমান্টিকতার আবেশে আবেগের স্তুতি তৈরি করে।

তাঁর ১৯৭২ সালে ক্যানভাসে তেল রঙে আঁকা 'প্রতিবাদ' ছবিতে মানুষের মুখের অভিব্যক্তি বিশেষ করে চোখ ও তাঁদের সাথে বিভিন্ন রকমের ফেস্টুন ও প্লাকার্ড এবং পাতা, গাছপালা, দূরে দিগন্ত ও আকাশকে খণ্ড খণ্ড ডিজাইনের আদলে চিত্রে যে রস সঞ্চার করেছেন, তা আলোচনার দাবিদার।

১৯৯১ পরবর্তী কাজে কাইয়ুম চৌধুরী ডিজাইনকে বর্ণ পর্দায় মিলেমিশে একাকার করেছেন। কোথায়ও হালকা নীলাভ ধূসর কালারের বিপরীতে মূল সাবজেক্টের কোনো কোনো অংশকে প্রাথমিক রং লাল, নীল, হলুদ বা সবুজে ভাসিয়েছেন। ১৯৯৯ সালে তেলরঙে আঁকা বেদেনী, মধ্যদুপুর ও ২০০০ সালে মুক্তিযোদ্ধা, ২০০১ সালে শরতের দুপুর, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ, পরিবার এবং ২০০২ সালে মাছ ধরা ও ২০০৩ সালে প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য। মফিদুল হক তাঁর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত কাইয়ুম চৌধুরী Art of Bangladesh Series-6 গ্রন্থে উল্লেখ করেন–ষাটের দশকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্পীসত্তা বিকশিত হচ্ছিল তার একটি মূল্যায়ন মেলে পাকিস্তান কোয়ার্টারলিতে এস. আমজাদ আলী রচিত দীর্ঘ প্রবন্ধে, ১৯৬৫ সালের শরৎ ও শীত যুগ্ম সংখ্যা সাময়িকীতে 'ঢাকা আর্টিস্টস্' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধে। কাইয়ুম চৌধুরীর কাজে শুরুতে যে জটিল

ডিজাইন ও আলো-আঁধারির রহস্যময় খেলা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এখন তার স্থলে দেখছেন নতুন উত্তরণ। তাঁর মতে, 'Now he uses simple squares and circle for his broad designs and fills them up with simple decorative patterns derived from Bengali folk art, as the fish bone pattern, or the ear of corn, rosettes, heart shapes, zigzags, hachuring, or simply a repetition of P.c.aralleled lines drawn vertically or horizontally or both. A human or bird or animal form is introduced into the composition as just another element of design, dawn in the rudimentary folk style.

১৯৬৬ সালে কাইয়ুম চৌধুরী পঞ্চম তেহরান বিয়েনালে 'রাজকীয় দরবার পুরস্কার' লাভ করেন। এই একই সময়ে মর্নিং নিউজ পত্রিকায় বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর দীর্ঘ নিবন্ধ লিখেন। লেখার শিরোনাম ছিল–A world of Line, Colour and Design. তিনি এই নিবন্ধে লিখেন : "Qayyum is just not translating folk pattern and design in his works. He is using folk tradition for solving some pictorial problems. In him one palette, colour harmonies that are not only lyrical but of rare beauty, drawing that is more precise and a more conscious approach to volume. His use of design is a way of organizing his feelings and he is not ashamed of expressing sweetness, grace and pettiness. Qayyum is intensely aware of abstract elements in his art and it is interesting to note his tentative formulation of this problem.

লোকমোটিফ ও ডিজাইনের সংস্থান দ্বারা কাইয়ুম চৌধুরী অঙ্কিত এসব ক্যানভাসে ফিগারেটিভ উপস্থিতি বিশেষ ছিল না। তিনি মানুষের জীবনসামগ্রী তুলে এনেছেন জীবনকে সাজিয়ে তোলার লোকায়ত শিল্পধারা থেকে, আর তাঁর এই শিল্পরূপায়ণে প্রায়শ অবলম্বন হয়েছে প্রকৃতি-গাছ, বৃক্ষ, লতাপাতা, সূর্য, পাখি ইত্যাদি। মাছ বা নৌকো যখন তাঁর ছবিতে এসেছে তখন নৌকোর ফর্ম বা মাছকে ফর্মের মধ্যে দিয়ে দেখার প্রচেষ্টাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। একদিকে জ্যামিতিকতা, অন্যদিকে লৌকিক পেলবতা, এই দুইয়ের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস ফুটে ওঠে তাঁর কাজে। এটিও

স্মরণ রাখা দরকার, আইয়ুবী স্বৈরশাসনের সেই দিনগুলোতে কঠোর নিগড়ে বাঁধা ছিল সমাজ, মুক্তচিন্তা ও অধিকার-সচেতন রাজনীতি ছিল অবদমিত এবং চিন্তার দমনমূলক পরিস্থিতিতে রূপক ও ইঙ্গিতধর্মিতার মধ্য দিয়ে শিল্পীরা বক্তব্য প্রকাশের উপায় খুঁজছিলেন। যদিও নব্বই-পরবর্তী কাজে আমরা কাইয়ুম চৌধুরীর ক্যানভাসে ফিগারের উপস্থিতি দেখতে পাই। কমার্শিয়াল কাজের মধ্য দিয়ে ডিজাইন ও ফর্ম নিয়ে তাঁর বিবিধ ভাবনা ছিল এই সৃষ্টিশীল অনুসন্ধানেরই সম্প্রসারিত রূপ। একই ভাবনা তিনি দুই ধারাতে প্রবাহিত করেছেন। ফলে তাঁর ডিজাইন, পোস্টার, ইলাস্ট্রেশন, প্রচ্ছদ এসব কমার্শিয়াল কাজের ছাপ ক্যানভাসে খুঁজে পাওয়া যায়। আবার ক্যানভাসের শিল্পচিন্তা কমার্শিয়াল আর্টে প্রভাব ছড়িয়েছে।[১২]

কাইয়ুম চৌধুরী ব্যবহারিক শিল্পকলার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁর শিক্ষক কামরুল হাসানের দ্বারা, লোকজীবন থেকে শিল্পের পাঠ নেয়া এই শিক্ষাটা নিয়েছেন তিনি জয়নুল আবেদিনের কাছ থেকে। তাঁর দুই গুরুর কাছ থেকে তিনি দুটো জিনিস পেয়েছেন। শুধু তাঁর ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রেই নয়, জলরং কিংবা তেলরঙের ছবিতে সর্বত্রই এক ধরনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সেইসব ছবিতে প্রচ্ছদের নকশাধর্মিতা যেমন–এসেছে তেমনি আবার লোকজীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সেটাতে তাঁর রং, তাঁর ভঙ্গিগুলো নিয়ে তিনি তাঁর শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। জয়নুল আবেদিন তাকে শিক্ষা দিয়েছেন যখন তিনি পত্রিকার কাজ করেছেন, পত্রিকার ইলাস্ট্রেশন করেছেন, অলংকরণ করেছেন। সেই অলংকরণের মধ্যে নৌকা চলে এসেছে, জয়নুল আবেদিন বলেছেন যে, এই নৌকাকে কীভাবে নকশা হিসেবে ব্যবহার করা যায়, শিল্পে পরিণত করা যায়। নৌকার গলুই, গলুইয়ের চোখ এটা কাইয়ুম চৌধুরী ভাবেননি কিন্তু জয়নুল আবেদিন যখন দেখিয়ে দিলেন বিষয়টা এরকম হতে পারে তখন কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্পের পাঠ অন্যধারায় প্রবাহিত হলো এবং তাঁর চিত্রকলা লোকজীবন ও লোকঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে একটা নতুন পথের নিশানা পেল।

উল্লেখ্য যে কাইয়ুম চৌধুরী চারুকলায় যেখানে পড়াশুনা করেছেন–সেখানে জয়নুল আবেদিনের সহায়তায় তিনি শিক্ষকতায় প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আরেক প্রিয় শিক্ষক কামরুল হাসানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দিয়ে

চলে গিয়েছিলেন Design Centre বা নকশা কেন্দ্রে। কামরুল হাসানের সাথে মতের মিল না হওয়ার কারণে ডিজাইন সেন্টারে তিনি বেশি দিন থাকতে পারেননি। তিনি আবার পত্রিকার জগতে চলে যান। পরবর্তীকালে তার গুরু জয়নুল আবেদিন আবার তাঁকে আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে ডেকে আনলেন।[১৩] তিনি গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। আর তার এই পথচলার মধ্য দিয়েই কাইয়ুম চৌধুরী চিত্রকর্মকে ডিজাইনের আদলে দাঁড় করিয়েছেন।

আধুনিকতার সমরূপ হিসেবে কিউবিজম তখন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছিল। জয়নুল আবেদিনের ঐতিহ্য সচেতনতা ও কামরুল হাসানের কিউবিজমের মিশ্রণ যা ছিল জয়নুল পরবর্তী আধুনিকতার চিত্রভাষা তৈরিতে সমসাময়িক শিল্পে অভিনব, আর এই দুই ভাষাকে একত্রিত করে গ্রহণ করলেন কাইয়ুম চৌধুরী। যে ব্যাপারটি কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকর্মে নতুন ছিল তা হলো ভারতীয় শিল্পের আদর্শকে ছবির মধ্যে যুক্ত করা, ভারতীয় শিল্পের যে ডিজাইন কোয়ালিটি সে সম্পর্কে কাইয়ুম চৌধুরী বলেছেন–I think the composition of painting is itself a design. A major aspect of folk art is design. In the Indian tradition the construction of painting is primarily design based, line based.[১৪]

কাইয়ুম চৌধুরীর প্রতিটি ছবির রচনাই এক প্রকার ডিজাইন। এই নকশাধর্মিতা লোকজশিল্পেরও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বাস্তবতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজের কর্মধারা চিত্রশিল্পী ও ডিজাইনার হিসেবে তাঁর দুই সত্তাকে পরস্পরের পরিপূরক করে তুলেছে। ছবির জমিনে অবয়ব ভাঙার যেসব কলাকৌশল বা রঙের ওভারল্যাপিংয়ের আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেন তা একইভাবে প্রচ্ছদ ও অলংকরণেও অনুসরণ করেন। ফলে চিত্রশিল্পী ও ডিজাইনার হিসেবে তাঁর দুই সত্তাকে আর পৃথক করা যায় না।[১৫] স্পেসে নানা ফর্ম ও ডিজাইনের ব্যবহারে লোকরীতি, জ্যামিতিকতা ও উজ্জ্বল চড়া রং আবার কোথাও শীতল নীলের ব্যবহার তার ছবির কাঠামোগত ডিজাইনকে দর্শক আকর্ষণ করে। দৃশ্যমান অভিজ্ঞতা, আর স্মৃতির রূপকল্পে প্রকৃতি আর ঐতিহ্যের আবাহনে উৎসারিত হয় কাইয়ুম চৌধুরীর ছবির জগৎ।[১৬] আর এভাবেই কাইয়ুম চৌধুরী একের পর এক সৃষ্টি করেছেন তাঁর চিত্রকলার ভুবন। যে ভুবনে ডিজাইনের নানা রকম অনুষঙ্গ মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র :

১. আবুল মনসুর, শিল্পী দর্শক সমালোচক, মুক্তধারা (ঢাকা, ১৯৮৭), পৃ. ২০

২. আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৩. মফিদুল হক, কাইয়ুম চৌধুরীর বিশ্ববীক্ষণ, দেশপ্রসঙ্গ, সম্পাদক : ইমদাদুল হক সুফী (ঢাকা, ২০১৫), পৃ. ১১

৪. মফিদুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী, Art of Bangladesh Series-6, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (ঢাকা, ২০০৩), পৃ. ২৭

৫. সৈয়দ আজিজুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী (শিল্পীর একান্ত জীবন কথা), প্রথমা প্রকাশন (ঢাকা, ২০১৫), পৃ. ৮৩-৮৪

৬. মইনুদ্দীন খালেদ, বাংলাদেশের চিত্রশিল্প, দিব্য প্রকাশ (ঢাকা, ২০০০), পৃ. ৮৩

৭. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, শিল্পীর চোখ, তরফদার প্রকাশনী, (ঢাকা, ২০০৭) পৃ. ৪৩

৮. সৈয়দ আলী আহসান, শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (ঢাকা, ২০০৪), পৃ. ৪৮

৯. আবুল মনসুর, ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল, চারু ও কারুকলা, সম্পাদক : লালা রুখ সেলিম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (ঢাকা, ২০০৭), পৃ. ৩৮

১০. বাংলার লোকশিল্প আমাকে শিল্পী বানিয়েছে–কাইয়ুম চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মাহবুব রেজা, শিল্পপ্রভা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (ঢাকা, ২০১৪), প্রকাশক, অঞ্জন চৌধুরী, সম্পাদক : রফি হক, পৃ. ১৫-১৬

১১. সৈয়দ আজিজুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী (শিল্পীর একান্ত জীবন কথা), প্রথমা প্রকাশন (ঢাকা, ২০১৫), পৃ. ৫৭, ৫৮, ৫৯

১২. মফিদুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

১৩. সৈয়দ আজিজুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী নান্দনিকতা, দেশপ্রসঙ্গ, সম্পাদক: ইমদাদুল হক সুফী (ঢাকা, ২০১৫), পৃ. ৮

১৪. সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, কাইয়ুম চিত্রকথা, দেশপ্রসঙ্গ, সম্পাদক : ইমদাদুল হক সুফী (ঢাকা, ২০১৫), পৃ.২৯

১৫. সৈয়দ আজিজুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী, চারু ও কারুকলা, সম্পাদক : লালা রুখ সেলিম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ৩৮২-৩৮৩

১৬. মফিদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

চিত্র : ১, ২, ৩, ৪

সৌজন্যে :

মফিদুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী, Art of Bangladesh Series-6, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, (ঢাকা, ২০০৩)

সৈয়দ আজিজুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী (শিল্পীর একান্ত জীবন কথা), প্রথমা প্রকাশন (ঢাকা, ২০১৫)

শিল্পপ্রভা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (ঢাকা, ২০১৪)

শিল্পী মন্দ্রিয়ানের চিত্রকর্মে বিমূর্ততা : জ্যামিতিক নকশার রূপান্তর

সাবরিনা শাহনাজ*

সারসংক্ষেপ : *পিয়েট মন্দ্রিয়ান (Piet Mondrian) নেদারল্যান্ডের একজন চিত্রশিল্পী।[১] প্রাথমিকভাবে প্রকৃতিকে অনুসরণ করে ছবি আঁকা আরম্ভ করলেও পরবর্তীকালে প্রকৃতিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে মূর্ত থেকে বিমূর্ততায় যাওয়ার নতুন ধারা শিল্পীকে আকৃষ্ট করে। এ প্রবন্ধে মন্দ্রিয়ান কীভাবে ক্রমাগত তাঁর শিল্পচর্চায় নতুন ধারার বিমূর্ত ধরনকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং জ্যামিতিক নকশার ধারণাকে চিত্রকলায় রূপান্তর করে ঋদ্ধ করেছেন তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে সমসাময়িক জীবন ধারায় তাঁর কাজ ব্যবহারিক শিল্পজগতে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা বর্ণিত হয়েছে। চিত্রশিল্পের বিমূর্তয়ানের মাধ্যমে তিনি যে বাস্তবতা তৈরি করেছেন তা একটা সময়ে সমাজে গৃহীত হয় দৃশ্যগত নতুন সুরেলা নকশা রূপে। তাঁর কাজগুলো শুধু চিত্রকলায় নয়, দৈনন্দিন জীবনাচারের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হয়। যেমন–স্থাপত্য, অভ্যন্তরীণ নকশা, আসবাবপত্র, পোশাক, অলংকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর সরলীকৃত প্রাথমিক রং ও রেখার ব্যবহার ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। শিল্পকলার বিকাশে তাঁর অবদান এখানে মূল্যায়ন করা হয়েছে।*

শিল্পের সর্বজনীনতা অনেক শিল্পীরই আরাধ্য থাকে, তবে পিয়েট মন্দ্রিয়ানের কাছে বিষয়ের অন্তর্নিহিত ভারসাম্য বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। তিনি নান্দনিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ বিমূর্ততার প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন।

বিমূর্ত শিল্প হলো আকার, আকৃতি, রং এবং রেখার এক দৃশ্যগত প্রকাশ, যা আমাদের চারপাশের দেখার অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন এবং স্বাধীন। রেনেসাঁ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পশ্চিমা শিল্প ছিল দৃশ্যমান বাস্তবতার একটি ইমেজ

*সহকারী অধ্যাপক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। উনিশ শতকের শেষের দিকে অনেক শিল্পী এক নতুন ধারার শিল্প তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যা প্রযুক্তি, বিজ্ঞান এবং দর্শনে ঘটে যাওয়া মৌলিক পরিবর্তনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বিমূর্ত শিল্প অবয়ববিহীন, সুনির্দিষ্ট বিষয়কে বাদ দিয়ে হতে পারে। বাস্তবতা থেকে এই উপেক্ষা আংশিক বা সম্পূর্ণ হতে পারে। সেই অর্থে প্রাচীন শিলালিপি বা শিলাচিত্রের সহজ, জ্যামিতিক এবং রৈখিক ফর্মের ব্যবহার (যা আলংকারিক উদ্দেশে হতে পারে), চীনা বা ইসলামি ক্যালিগ্রাফি বিমূর্ততার প্রাচীন উদাহরণ হয়ে আছে।

১৯ শতকে পল গগাঁ (Paul Gauguin), জর্জেস স্যুরাট (Georges Seurat), ভিনসেন্ট ভ্যান গগ (Vincent van Gogh) এবং পল সেজানের (Paul Cezanne) দ্বারা চর্চা করা পোস্ট ইম্প্রেশনিজম বিংশ শতাব্দীর শিল্পকলায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তাদের কিছু কিছু কাজে আংশিক বিমূর্ততার আভাস মেলে। আংশিক বিমূর্ততাকে প্রকাশ করে এমন অনেকগুলো শিল্পান্দোলনের একটি হলো ফভিজম (Fauvism)। যার মধ্যে বাস্তবতার সাথে স্পষ্টভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে রংকে পরিবর্তিত করা হয়, এছাড়া আছে কিউবিজম (Cubism) যা চিত্রিত বাস্তব জীবনের সত্তার রূপগুলোকে ত্রিমাত্রিক আকারে পরিবর্তন করে। বিশ শতকের শুরুতে হেনরি মাতিস এবং প্রাক কিউবিস্ট শিল্পী জর্জেস ব্রাক (Georges Braque), আন্দ্রে ডরেইন (Andre Derain), রাউল ডুফি (Raoul Dufy) এবং মরিস ভ্লমিঙ্ক (Maurice de Vlaminck) সহ আরও কিছু তরুণ শিল্পী বহু রঙের অভিব্যক্তিপূর্ণ প্রকৃতি চিত্র এবং অবয়ব চিত্র দিয়ে প্যারিসের শিল্পজগতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, যাকে সমালোচকরা Fauvism (বন্য) বলে অভিহিত করেছেন।

পরবর্তীকালে পাবলো পিকাসো তার প্রথম কিউবিস্ট ছবিগুলো সেজানের ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেন, যেখানে প্রকৃতিকে ঘনক, গোলক এবং শঙ্ক–এই জ্যামিতিক বিভাজনে ভাগ করে বিমূর্ততার এক নতুন রূপ দেন।

ভাসিলি কান্দিনস্কি (Wassily Kandinsky) নিজে একজন চিত্রকর এবং অপেশাদার সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় বিভিন্ন

উদ্দীপনায় সাড়া দেয় এবং তা রেখা, আকার এবং রঙের নান্দনিক সমন্বয় তৈরি করতে পারে এবং সেই চিত্র হতে পারে সম্পূর্ণ বিমূর্ত।[১]

এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আরেকটি ধারণা হলো শিল্পে আধ্যাত্মিক মাত্রা। থিউসোফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society) বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারত এবং চীনের পবিত্র গ্রন্থগুলোর প্রাচীন জ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে পিয়েট মন্দ্রিয়ান, ভাসিলি কান্দিনস্কি, হিলমা ক্লিন্ট (Hilma Klint)সহ আরও কয়েকজন শিল্পী দৃশ্যমান বাস্তবতার অন্তর্নিহিত সত্তাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, এতে সর্বজনীন আকারে বৃত্ত, বর্গক্ষেত্র, ত্রিভুজ বিমূর্ত শিল্পের এক উপাদান হয়ে উঠে।[২]

পিয়েট মন্দ্রিয়ান নেদারল্যান্ডের একটি ছোট শহর আর্মসফোর্টে ৭ই মার্চ ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা-মাতার দুই সন্তানের মধ্যে ছোট ছিলেন এবং একটি কঠোর প্রোটেস্টান পরিবারে বেড়ে উঠেন। তার পিতা পিটার কর্নেলিয়াস মন্দ্রিয়ান স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি আঁকাও শেখাতেন। মন্দ্রিয়ান ছোটবেলা থেকে বাবা এবং চাচার সান্নিধ্যে থেকে প্রকৃতিকে অনুসরণ করে যে ছবি আঁকা য়ায় তা অনুধাবন করেন। ১৮৯২ সালে বিশ বছর বয়সে মন্দ্রিয়ান আমস্টারডামে একাডেমি অব ফাইন আর্ট–এ অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৭ সালে উক্ত আর্ট স্কুল থেকে স্নাতক হওয়ার পর প্রায় এক দশক ধরে মন্দ্রিয়ান প্রাথমিকভাবে প্রকৃতির চিত্র অঙ্কনে নিজেকে নিবেদিত করেন। এই সময়ের কাজে ইম্প্রেশনিজম চিত্রধারাও তাকে প্রভাবিত করে। সেখানে তিনি চিত্রকলার ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদি কৌশল আয়ত্ত করেন। স্কুল থেকে স্নাতক হবার পর পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম চিত্রধারা তাকে প্রভাবিত করে। যা খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় তার থেকে বেশি কিছু যেমন–আলোর পরিবর্তন, রঙের অভিজ্ঞতার প্রকাশ এসবই তাকে বেশি টানে। তিনি জর্জ স্যুরাট এবং পল সেজানের কাজের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে এক প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্রকলা চর্চার ধারা বা শৈলীর প্রচলন করেন। ছবিতে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম উপাদানগুলো দর্শকের মধ্যে যে তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে তা ছিল শিল্পীর লক্ষ্য। তিনি শুরুতে বাস্তবসম্মত রং এবং আকারকে বাদ দিয়ে একই বিষয়কে সিরিজ আকারে উপস্থাপন করেন।[৩]

চিত্র : ১-ক (১৯০৬)

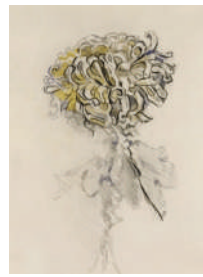

চিত্র : ১-খ (১৯০৬)

চিত্র : ১-গ (১৯০৯)

এই শৈলীটি তাঁর ১৯০৬ হতে ১৯০৯ সালের মধ্যে অঙ্কিত উপর্যুক্ত ক্রিসেনথিমাম (Chrysanthemum) ফুলের সিরিজ ছবিতে লক্ষ করা যায়। ছবিগুলোর মাধ্যম : ক্যানভাসে তেল রং, মাপ: ২৫.৪ x ২৮.৪ সে.মি. যা বর্তমানে Guggenheim Museum, New York-এ সংরক্ষিত আছে। তিনি এরকম প্রায় ১৫০টি ছবি আঁকেন। শিল্পীর আগ্রহ ছিল ফুলের তোড়ার প্রতি নয়, একটি একক ফুলের প্রতি। উপর্যুক্ত চিত্রকর্মগুলো সমীক্ষা করলে দেখা যায়, ফুলটি ফ্রেমের মাঝে তির্যকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর পেছনে কারণ ছিল ফুলের যথার্থ ত্রিমাত্রিক রূপ দেওয়া। এক অর্থে দ্বিমাত্রিক চিত্রতলে ত্রিমাত্রিক প্যাটার্ন বা রূপ ফুটিয়ে তোলা, সেই সাথে ফুলের রেখা আর পাপড়িগুলোতে পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট প্রভাব দেখা যায়, যেখানে বিশেষভাবে ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের কাজের মিল পাওয়া যায়। এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ মন্দ্রিয়ানের পরবর্তী তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে আধুনিক চিত্রকলার প্রতি তার আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল।[৪]

রাশিয়ান গুপ্তবিদ্যা চর্চাকারী হেলেনা ব্লাভৎস্কি (Helena Blavatsky) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি আধ্যাত্মিক সংগঠনের সাথে তিনি যুক্ত হন। সংগঠনটি ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংগঠনের সদস্যরা প্রকৃতির রহস্যগুলোকে গভীরভাবে অনুধাবন করে তা বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই সংঘের নীতি ছিল 'সত্যের চেয়ে উচ্চতর কোনো ধর্ম নেই।' থিউসফিতে[৫] (Theosophy) বিভিন্ন মহাজাগতিক গ্রহ-নক্ষত্র এবং মানব বিবর্তনের পাশাপাশি বিজ্ঞান, ধর্ম এবং পুরাণকে ব্যাখ্যা করে তা শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সবাইকে বিষয়গুলো জানিয়ে দেওয়ার

একটা চেষ্টা ছিল। পক্ষান্তরে এসবই শিল্পীকে মূর্ত থেকে বিমূর্ততায় অবগাহনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মন্দিয়ানের প্রেরণা ছিল ফুলকে তার ভেতরের সৌন্দর্যসহ উপস্থাপন করা। অভিব্যক্তির আরও রহস্যময় দিকগুলো অনুসন্ধান করে তার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে ব্যাখ্যা করা। অসংখ্য ফুল অধ্যয়ন এবং ক্রিসেনথিমাম তথা চন্দ্রমল্লিকা নিয়ে তার আগ্রহ বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্য এবং ইতিহাস থেকে পাওয়া মানব মৃত্যুর প্রতীকী চিত্র থেকে তা উদ্ভূত হতে পারে। উপরন্তু দূর প্রাচ্যে ক্রিসেনথিমাম দীর্ঘ দিন ধরে সম্রাটদের মর্যাদা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির গুণাবলির সাথে যুক্ত। মন্দ্রিয়ান সম্ভবত 'থিউসফি' চর্চার মাধ্যমে দূর প্রাচ্যের দর্শনের এবং এর প্রভাবের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁর কর্মজীবন থিউসফিক্যাল সোসাইটির সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। যেখানে লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভেদাভেদ বাদ দিয়ে ধর্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞানের অধ্যয়নকে উৎসাহিত করা হতো এবং গুরুত্ব দেওয়া হতো, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির পাশাপাশি মহাবিশ্বের এবং মানুষ–উভয়ের অজানা দিকগুলো অধ্যয়ন করা। একজন শিল্পী হিসেবে মদ্রিয়ান তার চারপাশের জগতের সারমর্মকে সেভাবে চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন যেভাবে Blavatsky তার চারপাশে দেখা এবং অদেখা বিশ্বের অন্বেষণ করেছিলেন। মন্দ্রিয়ান এবং ব্লাভৎস্কি উভয়ই সত্য খুঁজে পেতে এবং কীভাবে নতুন আবিষ্কৃত সত্যকে বাকি বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় সে সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম দিকের প্রতীকী বা সিম্বলিস্ট (Symbolist) কাজের মাধ্যমে মন্দ্রিয়ান আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে সত্য অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন।[৬]

মন্দ্রিয়ানের হেগ (Hague) শহরের স্কুলে পড়ার সময়কাল ১৮৯৮-১৯১১ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যা মূলত ছিল শিল্পীর পরীক্ষামূলক পর্যায়। সেখানে তিনি তাঁর নিজস্ব শৈলী গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। এই প্রাথমিক সময়ের কাজগুলো বিষয়বস্তুভিত্তিক কাজের প্রতিনিধিত্ব করে, যা পরিপূর্ণ বিমূর্ত নয়। সিরিজভিত্তিক এসব কাজের মাধ্যমে তিনি বিশ্লেষণাত্মক এক ধারাতে মনোযোগী হন। গাছের বিভিন্ন সিরিজভিত্তিক ছবিগুলো তার একটি প্রমাণ। বৃক্ষ চিত্র ছাড়াও flower, still life, portrait, windmill, landscape-এর অনেক ছবি তিনি এঁকেছেন। তথাপি একটা সময় পর্যন্ত বৃক্ষ নিয়ে প্রকৃতির সুরেলা ফর্ম এবং জ্যামিতিক নকশা

ও কম্পোজিশন নিয়ে নিরীক্ষা তাকে ধাপে ধাপে বিমূর্ত বিশুদ্ধ রূপ রচনায় বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল। বৃক্ষ নিয়ে অঙ্কিত এসব ছবিসমূহে প্রকৃতির অপরিহার্য ভারসাম্য, সরল সত্য এবং সৌন্দর্যের অনুসন্ধান–এসবই প্রধান্য পেয়েছে। জটিল এবং আপাত বিশৃঙ্খল কাঠামোর কারণে তিনি বৃক্ষ চিত্রনে আকৃষ্ট হন। মন্দ্রিয়ান গাছের ডালগুলোকে এক সময় সমতলভাবে চিত্রিত করেছেন, যা একটি ফুলকে বইয়ের মধ্যে চাপা দেওয়ার মতো। ফুলটি আগের মতোই বিদ্যমান থাকবে, কিন্তু এর তাৎক্ষণিক চেহারা ত্রিমাত্রিক থেকে দ্বিমাত্রিক হয়ে উঠবে।[৭]

সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতি কীভাবে সাড়া দেয় এবং তা চিত্রে কীভাবে উঠে আসে তা মন্দ্রিয়ানের কিছু বৃক্ষ চিত্র আলোচনায় আমরা বুঝতে চেষ্টা করব।

চিত্র : ২-ক ট্রি অন ক্যালফি Tree on Calfy

চিত্র : ২-খ ট্রি অন ক্যালফি Tree on Calfy

চিত্র : ২-গ ট্রি অন ক্যালফি Tree on Calfy

চিত্র : ৩ রিভার গাইড River Guide

১৯০১-১৯০২ মন্দ্রিয়ানের 'ট্রি অন ক্যালফি (Tree on Calfy)' চিত্রে ক্যালফি (Calfy) নদী বয়ে চলেছে দূরবর্তী অপস্রিয়মাণ বিন্দুতে। সেখানে দিগন্তরেখা অনেকটা উপরে এবং সামনে একটি পাতাবিহীন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। যা ছবিটির উপর এবং নিচের অংশকে যুক্ত করে ছবির মাঝখান থেকে খুব সচেতনভাবে নদীকে বড় করে ছবির শেষে নিয়ে আসেন। আমরা দেখতে পাই যে, এই সময় থেকে শিল্পী চিত্রতলকে নিজস্ব কম্পোজিশনে জ্যামিতিক বিভাজন করার চেষ্টা করেছেন।[৮]

চিত্র : ৪ অ্যালং দি অ্যামস্টেল Along the Amstel

তাঁর ১৯৯৮ সালে আঁকা নদী-তীরের দৃশ্য, যেখানে দিগন্তরেখার প্রতিচ্ছবি একটি ছন্দ তৈরি করে। এখানে গাছের গতিময়তার প্রতিচ্ছবি যেন চিত্রপটকে স্পষ্টভাবে দ্বিখণ্ডিত করে পরিমিত এক নকশা তৈরি করেছে।

১৯০৩ সালে ইম্প্রেশনিজম স্টাইলে আঁকা নদীর দিগন্তরেখা থেকে শুরু করে গাছের ব্যাপক উপস্থিতি ও পানিতে গাছের প্রতিচ্ছায়া মূল বিষয়। গাছের ফাঁক দিয়ে

আসা আলো পানিতে প্রতিবিম্বিত হয়ে আলো-আঁধারীর কাব্যময় উপস্থাপন তৈরি করেছে।[৯]

চিত্র : ৫ শেড Shed

মন্দ্রিয়ানের ১৯০৫ সালের Shed চিত্রটিতে দেখা যায় নিচু দিগন্তরেখায় মূলত চারটি বৃক্ষ একটি ফার্ম হাউসকে ঘিরে আছে। যা আকাশ এবং মাটিকে একই সূত্রে বেঁধে একটি একক পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে একীভূত একক সত্তায় রূপান্তরিত হয়, যাতে অর্গানিক এবং জিওমেট্রিক্যাল ফর্মের সমন্বিত একটা রূপ দেখা যায়। শিল্পী প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি যেন ক্রমান্বয়ে জ্যামিতিক ও অর্গানিক ফর্মকে অবলম্বন করে প্রকৃতির চিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে বিমূর্ততার দিকে এগিয়ে যান।[১০]

চিত্র : ৬ ট্রিস বাই দি গেইন অফ মুনরাইস Trees by the Gein of Moonrise, 1908

ফভিজম ধারায় তেলরঙে চিত্রিত উপরের ছবিটিতে গাছ যেন এক ধরনের জীবন্ত সত্তা। যার মধ্যে বৃক্ষ বাতাস, আলো, পানি এবং মাটির মধ্যে বেড়ে উঠেছে এবং একই সাথে ক্ষয়িত হচ্ছে ধূসর সবুজের বিপরীতে লাল আকাশ এবং তার মধ্যে হলুদ চাঁদের আলো, যা পত্ররাজির চলমানতার একটি জীবন্ত সত্তার প্রকাশমান

প্রতীক স্বরূপ। দৃশ্যমান বাস্তবতার বাইরে বৃক্ষের স্বাভাবিক রূপকে বিমূর্তরূপে প্রকাশ করার প্রবণতা এখানে লক্ষ করা যায়।[১১]

চিত্র : ৭-ক

চিত্র : ৭-খ

ফার্ম নেয়ার দি ডুইভেন্ড্রেক্ট Farm Near Duivendrecht-1907

পত্রহীন গাছের ছায়ার বিপরীতে ছন্দময় আকাশ, প্যাঁচানো গাছের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ও ছোট ছোট বাঁক যা কোষের ন্যায় আকৃতিতে বিমূর্ত আবহ সৃষ্টি করেছে। এভাবেও বলা যায়, কনট্যুর রেখার বিপরীতে আলো এবং রং খোলা স্পেসে ক্ষুদ্র জালের মতো খোপ খোপ এক ধরনের ফর্ম সৃষ্টি করেছে।[১২]

চিত্র : ৮ হরাইজোন্টাল ট্রি Horizontal Tree- 1911-1912

ছবিটির পটভূমিতে অনেকগুলো ছোট ছোট অংশে বিভক্ত দিগন্ত রেখা এবং উলম্ব রেখার গঠন তৈরি করা হয়েছে। এর মাঝের কেন্দ্র থেকে ঘূর্ণায়মান রেখার আদলে বৃক্ষের ছন্দায়িত বিমূর্ত রূপ ধরা দিয়েছে। পরিমিত রং এবং রেখার সমন্বয়ে পরিপূর্ণ এক জ্যামিতিক বিমূর্ততা বৃক্ষের আদলে অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে।

পরবর্তীকালে মন্দ্রিয়ান দৃশ্যগত বাস্তবতাকে ক্রমাগত এক ধরনের নকশা, প্রতীক এবং বিমূর্ত কম্পোজিশনে রূপ দিতে থাকেন।[১৩]

চিত্র : ৯ ইভেনিং রেড ট্রি Evening Red Tree, 1910

উপর্যুক্ত ছবিটি ক্যানভাসে তেলরং মাধ্যমে আঁকা। যেভাবে ইম্প্রেশনিস্টরা ক্যানভাস জুড়ে বিশদ বিবরণগুলো ধারণ করার পরিবর্তে উপলব্ধি করার গুরুত্ব দেন একইভাবে মন্দ্রিয়ান এই ছবিতে গাছের অপ্রয়োজনীয় ডালপালা বাদ দিয়ে রং, রেখা এবং আকৃতির এক সামগ্রীক ছন্দময় বিমূর্ত রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

১৯১০ সালে একদল ডাচ শিল্পীদের নিয়ে চিত্রশিল্পী এবং চিত্র সমালোচক কনরাড কিক্কার্ট (Conrad Kikkert) একটি গ্রুপ সংগঠিত করেন যার নাম দেন Moderne Kunstkring। উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন চিত্র যা প্যারিসে দেখা যাচ্ছিল তা হল্যান্ডের Museum of Amsterdam–এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে মেলবন্ধন তৈরি করে। ব্যাক, সেজান এবং পিকাসোর কিউবিস্ট (cubist) ধারার ছবির সাথে মন্দ্রিয়ানদের কাজও প্রদর্শিত হয়।

Analitical Cubism নিয়ে এই ফরাসি শিল্পীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মন্দ্রিয়ানকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু তারা যখন স্টিল লাইফ (Still Life) নিয়ে কাজ করছিল মন্দ্রিয়ান তখন প্রকৃতি থেকে অনুপ্রেরণা নিচ্ছিলেন। এখানেই তাঁর কিউবিজমের কাজ অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল।

এই সময়ের ছবিতে প্রকৃতির অপরিহার্য ভারসাম্য, সরল সত্যের অনুসন্ধান এবং সৌন্দর্যের অন্বেষণ–এসবই প্রধান্য লাভ করে। মন্দ্রিয়ান বৃক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে

প্রকৃতির সুরেলা ফর্ম এবং জ্যামিতিক বিভাজনের একটা সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। জটিল এবং প্রায়শ বিশৃঙ্খল কাঠামোর কারণে তিনি বৃক্ষের বিমূর্ত রূপের প্রতি আকৃষ্ট হন। সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতি কীভাবে সাড়া দেয় তা এসব চিত্রে প্রতিফলিত হয়। পাশাপাশি অন্তর্নিহিত ফর্মগুলোকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য বারবার একই বৃক্ষের দৃশ্য তিনি এঁকেছেন। "ইভিনিং রেড ট্রি" হচ্ছে ক্যানভাস মাধ্যমে আঁকা এরকমই একটি ছবি।[১৪]

চিত্র : ১০ গ্রে ট্রি Grey Tree, 1911

এই ছবি আঁকতে তিনি সীমিত রং ব্যবহার করেছেন। ছবিটির মাঝ বরাবর একটি দিগন্ত রেখা কল্পনা করা যায়। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার রেখাগুলো উপরের দিকে কৌণিকভাবে ছড়িয়েছে। পক্ষান্তরে নিচের রেখাগুলো আনুভূমিকভাবে ছড়িয়েছে। তিনি বিখ্যাত অপর এক শিল্পী মেলভিচ্ (Malvitch)–এর কাজের ধারার অনুরূপ ক্রমান্বয়ে অপস্রিয়মাণ এবং সংক্ষিপ্তকরণের প্রক্রিয়ায় গেছেন। রঙের ক্ষেত্রে শিল্পী সাদা-কালো এবং প্রাথমিক রংসমূহকে বেছে নিয়েছেন, যা প্রাথমিক কিউবিজমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ছবিতে পিকাসোর মতো তিনি গাছের জন্য কিছু ডিম্বাকৃতি ফর্ম বা oval shape পুনর্ব্যবহার করেছেন। যা বাঁকা, প্রশস্ত গাড় রেখায় নকশার মতো করে রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ধূসর পটভূমিতে বিমূর্ত ঘনক্ষেত্রের আকারগুলো এখানে স্পষ্ট। এর মধ্য থেকে গাছের রূপটিও এখানে ফুটে উঠেছে। চিত্রকর্মটি কিউবিজমের নীতিগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১৫]

চিত্র : ১১ অ্যাপেল ট্রি পয়েন্টিলিস্ট ভার্সন Apple Tree Pointilist version,1908-1909

এ ছবিতে মন্দ্রিয়ান প্রকৃতির গতিশীল শক্তিময়তাকে রেখা এবং রঙে বিমূর্তভাবে চিত্রিত করেছেন। যেখানে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল অনেকটা মানবিকতার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতার ঐক্য খুঁজে দেখা। ছবিতে নীল রঙের আধিপত্য এবং ত্রিকোনাকার নকশার কম্পোজিশন দেখা যায়, যা একটি ধর্মীয় আধ্যাত্মিক চেতনার অন্তর্নিহিত ভাব উপস্থাপন করে। ছবিটিতে নীল রঙের সাদা বিন্দুর ছড়িয়ে দেওয়া, যা পয়েন্টিলিজম ধারাকে অনুসরণ করে। [১৬]

চিত্র : ১২ অ্যাপেল ট্রি ইন ব্লুম Apple tree in Bloom, 1912

এই ছবি থেকেই শিল্পী চূড়ান্ত বিমূর্ত শিল্পের দিকে এগিয়েছেন। এটি সম্ভবত ১৯১২ সনের বসন্তকালে আঁকা। ঐ বছরের অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে Moderne-Kunstkring আমস্টারডাম প্রদর্শন হয়েছিল। ছবিটি বর্ণনামূলক প্রক্রিয়াকে বাতিল করে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ফর্ম এবং রেখায় বিমূর্ত নকশায় উপস্থাপিত হয়েছে। চার বছর আগে আঁকা The Red Tree থেকে ছবিটি অনেক বেশি সরলীকৃত করে আঁকা হয়েছে, যা বৃক্ষের অন্তর্নিহিত মৌলিক রূপকেই

উপস্থাপন করে। এই চিত্রটিতে সম্পূর্ণভাবে গাছের আকৃতিকে বর্জন করে সবুজ, ধূসর এবং বেগুনি রঙের টোনে আঁকা হয়েছে। শিল্পী এখানে রংকে ফর্মের সুবিধার জন্য পরিমিতরূপে ব্যবহার করেছেন। ছবিটি কেবল প্রকৃতির একটি অংশকেই প্রকাশ করে না বরং শিল্পীর নিজস্ব ঢঙের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবতার একটি নিয়ন্ত্রিত রূপান্তর উপস্থাপন করে। গঠনগতভাবে এতে কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়।[১৭]

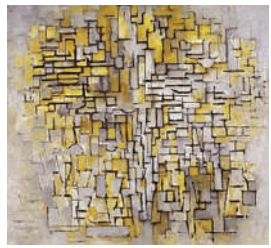

চিত্র : ১৩-ক কম্পোজিশন নং ৭
Composition No. VII, 1913

চিত্র : ১৩-খ লা ইনডিপেন্ডেন্ট
L'Independent, 1911, Pablo Picaso

মন্দ্রিয়ান কিউবিস্টদের এবং তাদের কাজকে খুব ভালোভাবে জানতেন। পাবলো পিকাসোর L'Independent ছবিটি অ্যানালিটিকাল কিউবিজমের একটি উদাহরণ। যেখানে বিমূর্ততার মধ্য দিয়ে শিল্পী জড়জীবনকে মূর্ত করেছেন। কিন্তু মন্দ্রিয়ানের এই সময়ের ছবি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এক পৃথক এবং একক পথ অনুসরণ করেছিল। উক্ত ছবিটি (Composition No. VII) প্রান্তে ক্রমশই ম্লান হয়ে যাচ্ছে এবং তা এতটাই বিমূর্ত ছিল যে যেখানে বিষয়বস্তু কোনোভাবেই শনাক্ত করা যায় না। এগুলো প্রায়শই ছিল কিউবিস্টদের বিষয়বস্তুর বিপরীতে প্রাকৃতিক বা Organic কাঠামোগত আকার, যেমন–গাছ। সম্ভবত এ কারণেই তা গতিশীল, তাই কাছাকাছি টেক্সারযুক্ত এবং প্রাণবন্ত। তিনি লিখেছেন, "আমার অনেক সময় লেগেছে আকৃতি এবং প্রাকৃতিক রঙের বৈশিষ্ট্যগুলো আবিষ্কার করতে যা অনুভূতির বিষয়গত অবস্থার উদ্রেক করে এবং যা বিশুদ্ধ বাস্তবতাকে অস্পষ্ট করে। প্রাকৃতিক রূপ পরিবর্তিত হয় কিন্তু বাস্তবতা থেকে যায়। মন্দ্রিয়ান বিশুদ্ধ বাস্তবতা তৈরি করার জন্য প্রাকৃতিক

ফর্মগুলোকে কমিয়ে দিয়ে এবং প্রকৃতির রংকে প্রাথমিক রঙে পরিবর্তিত করার মধ্য দিয়ে চিত্র রচনার চেষ্টা করেছিলেন যা এক সর্বজনীন বিমূর্ততার দিকে যাচ্ছিল।

চিত্র : ১৪ ওভাল কম্পোজিশন Oval Composition with Tree, 1913

অনেকগুলো বিলীয়মান রেখায় আর ফ্যাকাসে হলদে রঙে ছবিটি আঁকা। যেখানে বৃক্ষ এবং প্রকৃতির চলমানতার এক শৈল্পিক ছন্দবদ্ধ বিমূর্ত রূপ ধরা দিয়েছে।

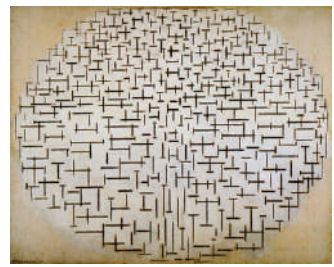

চিত্র : ১৫ পিয়ার অ্যান্ড ওশেন কম্পোজিশন Peir and Ocean Composition Number 10, 1915

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছবি Peir and Ocean Composition, Number-10 ১৯১৫তে আঁকা এই ছবিতে ইমেজগুলো কোনো নির্দিষ্ট চতুষ্কোণ তৈরি করেনি এবং তা প্রাথমিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণও মনে হয় না। তথাপি সাদা প্রেক্ষাপটে আনুভূমিক এবং উলম্ব কালো রেখার পুনঃপুনঃ ব্যবহারে যে বিমূর্ত নকশা ফুটে উঠে তা যেন বহমান সমুদ্রের বিমূর্ত ঢেউয়ের মতো, যেন ছবির সামনে থেকে দূরে ক্রম বিলীয়মান একটি বিমূর্ত নকশারই এক ধরনের প্রকাশ।[১৮]

১৯১৭ সাল মন্দ্রিয়ান-চিত্রকলার ইতিহাসের জন্য স্মরণীয় (যা ১৯১৭ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল)। এই সময় De Stijl (The Style) নামে একটি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। De Stijl ছিল মূলত একটি জার্নালের নাম, যা ডাচ চিত্রকর, ডিজাইনার, লেখক ও সমালোচক থিও ভ্যান ডয়েসবার্গ (Theo van Doesburg) দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর সাথে গ্রুপের প্রধান সদস্যরা ছিলেন মন্দ্রিয়ান, ভিলমোস হুজার (Vilmos Huszar), বার্ট ভ্যান ডের লেক (Bart van der Leck) এবং স্থপতি গেরিট রিটভেল্ড (Gerrit Rietveld), রবার্ট ভ্যান টি হফ (Robert van Ôt Hoff) এবং জে. জে. পি. IDW (J.J.P. Oud) । তাঁদের কাজের ভিত্তিতে যে শৈল্পিক দর্শনের উদ্ভব হয় তা নিওপ্লাস্টিসিজম (Neoplasticism) নামে পরিচিত।[১৯]

তারা বিমূর্ততার একটি পদ্ধতি খুঁজছিলেন যা তাঁদের দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে সঠিকভাবে চিত্রিত করতে পারে। ফর্ম এবং রঙের অপরিহার্য উপাদানগুলোকে হ্রাস করে বিশুদ্ধ বিমূর্ততা এবং সর্বজনীন রূপ দেওয়াই ছিল এদের লক্ষ্য। যা পরবর্তীকালে জ্যামিতিক নকশার সাথে ব্যবহারিক নকশার মেলবন্ধন তৈরি করে।[২০]

মন্দ্রিয়ান এ সময় দৃশ্যমান জগতের অন্তর্নিহিত সত্তাকে প্রতিফলিত করার জন্য তাঁর চিত্রগুলোকে আমূলভাবে সরলীকৃত করার মধ্য দিয়ে এক স্পষ্ট সর্বজনীন নান্দনিক দৃশ্যগত ভাষা তৈরি করেছিলেন।

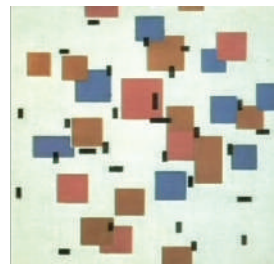

চিত্র : ১৬ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কম্পোজিশন Black and White Composition, 1917

উদাহরণস্বরূপ ১৯১৭ সালে আঁকা এই ছবিতে সাদার বিপরীতে লাল, নীল এবং হলুদ চতুষ্কোণকে ছোট ছোট কালো রেখায় এক ভারসাম্যপূর্ণ বিমূর্ত ছন্দে এঁকেছেন।

১৯২০-এর দশক থেকে তার সবচেয়ে পরিচিত চিত্রগুলোতে আকার, রেখা এবং রঙের বিশুদ্ধ মৌলিক বিষয়কে সম্পূর্ণ বিমূর্ত কাঠামোতে নিয়ে আসেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, বিমূর্ততা একটি সর্বজনীন চিত্র ভাষা হিসেবে কাজ করতে পারে যা গতিশীল, বিবর্তনীয় এক শক্তিময়তার প্রতিনিধিত্ব করে এবং যা আমাদের দেখার অভিজ্ঞতাকে ঋদ্ধ করে। ছবি একই সাথে গতিশীল এবং ছান্দিক হবে, কখনই স্থবির হবে না।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দৃশ্যমান জগতের চেয়ে বিমূর্ত বাস্তবতা আরেকটি সত্য চিত্ররূপ প্রদান করে। মৌলিক কাঠামোগত উপাদানগুলোর উপর ভিত্তি করে আনুভূমিক এবং উলম্ব রেখাকে ভিত্তি করে তিনি শিল্পের এক নিজস্ব ফর্ম তৈরি করতে চেয়েছেন।

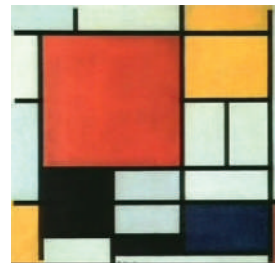

চিত্র : ১৭ কম্পোজিশন উইথ লার্জ রেড প্লেন; ইয়েলো, ব্ল্যাক, গ্রে অ্যান্ড ব্লুস Composition with Large Red Plane; Yellow, black, gray and blues 1921

১৯২১-এ আঁকা লাল রঙের আধিক্যের বিপরীতে ছোট চতুষ্কোণগুলোর ভারসাম্য কালো রেখার এক গতিময়তার সৃষ্টি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে তাঁর সাথে যোগাযোগ হয় চিত্রশিল্পী বার্ট ভন ডে লীক (Bart van der Leck)-এর সাথে। শুধু প্রাথমিক রং ব্যবহার করার উপর তাঁর চিন্তা মন্দ্রিয়ানের উপর এর প্রভাব বিস্তার করেছিল। থিওসফিতে তাঁর বিশ্বাসের পাশাপাশি নব্য-প্লাস্টিকবাদ কিউবিজমের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। এই সকল প্রভাব এবং প্রাক-যুদ্ধের মূল্যবোধ তাঁর

যুক্তির অসন্তোষকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিশেষত ইম্প্রেশনিজম, আর্ট নভো (Art Nouveau) এবং ফভিজমের মতো শৈলীগুলোর আলংকারিক বাহুল্য থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন।[২১]

তিনি বিশ্বাস করেছিলেন বিমূর্ত শিল্পই প্রকাশময়তার সবচেয়ে ভালো উপায়। নিউপ্লাস্টিসিজমকে (Neoplasticism) দাদাবাদের প্রাথমিক রূপ বলা যেতে পারে। দু ধারাই যুদ্ধাবস্থার মূল্যবোধের অবক্ষয়কে প্রত্যাখ্যান করে নতুন সৃজনশীলতাকে খুঁজেছিল।

এই সময়ে মন্দ্রিয়ানের নতুন ছবির ভিত্তি ছিল নিউপ্লাস্টিসিজম ধারার নিম্নোক্ত মৌলিক ধারণাগুলো :

১. শুধু জ্যামিতিক আকার ব্যবহার করা, প্রাকৃতির রূপ, রং উপেক্ষা করা।

২. প্রধান composition সোজা এবং চতুষ্কোণ হতে হবে।

৩. ছবির উপরিভাগ হতে হবে সমতল।

৪. বক্ররেখা, তির্যক রেখা, বৃত্তীয়রেখা বর্জিত হতে হবে।

৫. প্রাথমিক রঙের (লাল, নীল, হলুদ) ব্যাপ্তি বেশি হবে, তার সাথে কালো, ছাই রং এবং সাদা।

৬. প্রতিসাম্য থাকবে না, পরিবর্তে জোরালো অসাম্য থাকবে।

৭. জ্যামিতিক গঠন এবং উপাদানের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করতে হবে।

৮. জোরালো রঙের মাধ্যমে জোরালো রেখার ভারসাম্য তৈরি করতে হবে।

বলা যায় যে, নিউপ্লাস্টিসিজমের নিয়মগুলো বিশুদ্ধ, আপোসহীন ভারী কাঠামোগত বিমূর্ততা তৈরির পথ বাতলে দিয়েছিল।[২২]

উক্ত গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ভ্যান ডয়েসবার্গ (Theo van Doesburg) চিন্তার ভিন্নতার করনে ১৯২০ সালে ডি সিজল (De Stijl) গ্রুপ থেকে মন্দ্রিয়ান সরে এসেছিলেন।

চিত্র : ১৮ কম্পোজিশন ১ Composition 1 (Composition with Blue and Yellow), 1925

১৯২৫ হতে ১৯২৬ এই সময়কালে মন্দ্রিয়ান ৪৫ ডিগ্রি কোণে ঘুরানো বর্গাকৃতির বেশ কিছু ছবি আঁকেন যেখানে খুবই অল্প রেখা এবং রঙে সাদা ক্যানভাসের বিপরীতে এক তির্যক ছন্দবদ্ধ ভারসাম্যপূর্ণ বিমূর্ততা প্রকাশ পেয়েছে।

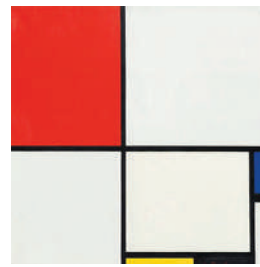

চিত্র : ১৯ কম্পোজিশন নং ৩ উইথ রেড, ব্লু, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক Composition No. III, with red, blue, yellow and black, 1929

১৯২৯-এ আঁকা তার লাল, নীল, হলুদ রঙের চতুষ্কোণাকৃতির ফর্মগুলো স্পষ্ট কালো রেখায় সাদার বিপরীতে অনেকগুলো ভারসাম্যপূর্ণ, ছন্দবদ্ধ কম্পোজিশনে মূর্ত হয়েছিল।

চিত্র : ২০ নিউ ইয়র্ক সিটি ১ New York City 1, 1942

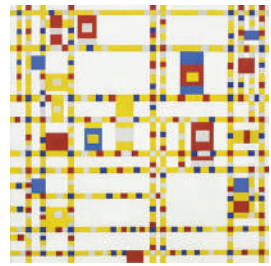

চিত্র : ২১ ব্রডওয়ে বুগি উগি Broadway Boogie Woogie, 1943

১৯৩৮ সালে সেপ্টেম্বরে মন্দ্রিয়ান প্যারিস ছেড়ে লন্ডনে চলে যান। ১৯৪০ সালের দিকে প্যারিস যুদ্ধে আক্রান্ত হলে তিনি আমেরিকা গমন করেন। এ সময় তাঁর ছবি আরও বিশদ বর্ণনাময় হয়ে উঠে। আগের চেয়ে বেশি overlapping রেখার এবং আলংকারিক ঢঙে এক নতুন ধরনের বিমূর্ততায় পৌঁছায়। উদাহরণস্বরূপ New York City 1 (1942), যা প্রাথমিক রং এবং রেখার এক জটিল মেলবন্ধন।

উপরের ছবিটি আলোচ্য ধারার চূড়ান্ত রূপ। নিয়ন আলোর মতো চকচকে বর্গাকৃতির ছোট ছোট গতিশীল আকৃতিগুলো সাদার বিপরীতে ভারসাম্যের চূড়ান্ত রূপ। নিউ ইয়র্ক সিটির গগনচুম্বী অট্টালিকা এবং রাস্তাগুলোর গ্রিড প্যাটার্ন অনুকরণ করে বৃহত্তর লাইনগুলোকে ভেঙে ফেলে রঙের অসংখ্য ব্লককে শহরের ট্রাফিকের স্টপ-অ্যান্ড-গো, এই বাস্তবতাকে বিমূর্ততায় তিনি প্রকাশ করেছেন। এই ধারার ছবিগুলো শিল্প ইতিহাসবিদদের কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়িত হয়েছে।

১৯২০ এবং ৩০ দশকের নিওপ্লাস্টিকবাদের তুলনায় এই চূড়ান্ত চিত্রগুলোর জোরালো প্রকাশময়তা রয়েছে। নিঃসন্দেহে ম্যানহাটনের স্থাপত্য এবং শহুরে পরিবেশ তাঁকে প্রভাবিত করেছে, যেখানে ১৯৪৪-এ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অবস্থান করেছিলেন।

উপর থেকে ম্যানহাটনের জালির ন্যায় রাস্তার দৃশ্য বা জ্যাজ সংগীতের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, নিউ ইয়র্ক নাইট ক্লাবগুলোতে সুরের যে গতিশীল সমন্বিত ছন্দ তার সাথে বৃক্ষের যে ক্রম রূপান্তরিত বিমূর্ততা–এসবের মধ্য দিয়েই বর্তমান সময় পেল এক যথার্থ বিমূর্ত শিল্প এবং শিল্পী।[২৩]

মন্দ্রিয়ানের একটি উদ্ধৃতি ছিল–"আমি যতটা সম্ভব সত্যের কাছে যেতে চাই এবং তাই আমি বস্তুর মৌলিক গুণে না আসা পর্যন্ত সবকিছু বিমূর্ত করি।"[২৪] তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন শিল্প হতে হবে বাস্তবতার ঊর্ধ্বে, তবেই শিল্পকলায় আধ্যাত্মিক রূপ যোগ হবে।

প্রায় ১৯১১ সালের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জ্যামিতিক বিমূর্তকরণের ধারা তৈরিতে মন্দ্রিয়ান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জ্যামিতিক বিমূর্তকরণের প্রতিষ্ঠায় তিনিই প্রধান ব্যক্তিত্ব, কারণ De Stijl-এর ধারণায় এবং তাঁর যৌক্তিক বিকাশ ছিল প্রাথমিকভাবে তার অর্জন। মন্দ্রিয়ানের প্রভাব কেবল বিমূর্ত চিত্রকলায় এবং ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেই নয় বরং স্থাপত্যের আন্তর্জাতিক শৈলী (Style)রূপেও প্রসারিত হয়েছিল। জার্মানিতে Bauhaus এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Bauhaus-এর শাখাগুলোতে শিক্ষাদানের মাধ্যমে তার তত্ত্বগুলো পশ্চিমা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্যারিসে ১৯২০ এবং ৩০-এর দশকে অন্য যে কোনো একক ব্যক্তির চেয়ে মন্দ্রিয়ান সম্ভবত সব চাইতে বেশি অবদান রেখেছিলেন জ্যামিতিক বিমূর্ততাকে এগিয়ে নিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্দ্রিয়ান একজন কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যিনি কেবল জ্যামিতিক বিমূর্ততাবাদীদেরই অনুপ্রাণিত করেননি, সেই সাথে তরুণ শিল্পীদেরও অনুপ্রাণিত করেছিলেন।[২৫]

মন্দ্রিয়ানের প্রাথমিক রঙের কম্পোজিশনগুলো আধুনিক ইতিহাসে ফিরে আসার এক প্রভাব বিস্তারকারী নকশা যা আমাদের মনে গভীরভাবে স্পর্শ করে। পণ্য সাজানো

তো তাঁর কাজের থিমগুলো অন্তর্বাস থেকে শুরু করে কেক তৈরি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ব্যক্তি এবং পণ্যের মাঝে তাঁর চিত্র নকশাগুলো একটা সেতুর মতো কাজ করে। স্থাপত্যে তাঁর ভারসাম্যপূর্ণ রেখা, গ্রিড এবং রঙের প্রভাব দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, City Hall Building in The Hague by StudioVZ, Villa Mandrian by vasily klyukin স্থাপনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সমসাময়িককালে মস্কোর মেট্রো স্টেশন Rumyantsevo যা ১৯১৬ সালের জানুয়ারিতে উদ্বোধন হয়েছে।[২৬]

ফ্যাশন জগতে Yves Saint Laurent-এর পোশাকগুলোতে (১৯৬৫ সালে) মন্দ্রিয়ানের বিমূর্ত চিত্রসমূহের নকশা ব্যবহার করা হয়। পোশাকগুলো হয়ে উঠে যেন পরিধানযোগ্য এক রঙিন ক্যানভাস। যে ছবিটি বিখ্যাত lusa.com; ৫ফ্যাশন ডিজাইনার সেন্ট লরেন্টকে অনুপ্রাণিত করেছিল সেটি হলো 'Red Blue and Yellow Composition – 11 (1929)'। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ পোশাকটি আসলে হয়ে উঠে গঠনমূলক জটিল এবং এক সূক্ষ্ম শিল্প, যা ফ্যাশন জগতে এক নিখুঁত উপস্থাপন।[২৭] মন্দ্রিয়ানের কম্পোজিশন পিটার রোজেনমেইজার্স (Peter Rozenmeijers)-এর শীতের পোশাকে প্রভাব ফেলে ১৯৮০ সালের দিকে।[২৮] নাইকের (Nike) ২০০৪ সালের সংগ্রহে প্রাডা'র মতো বিখ্যাত ফ্যাশন হাউজও মন্দ্রিয়ানের বিমূর্ত চিত্রকর্মের কম্পোজিশন ও জ্যামিতিক ফর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বিখ্যাত বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো তাঁর চিত্রকর্মের নকশাগুলো তাদের পণ্যে ব্যবহারিক নকশা হিসেবে প্রয়োগ করেন। এছাড়াও মন্দ্রিয়ান জনপ্রিয় ফ্যাশন ম্যাগাজিনে ফ্যাশন ফটোশুটের জন্য তাঁর চিত্রকর্মকে আলংকারিক পটভূমিতে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন।

মন্দ্রিয়ানের ছবির গঠন এবং নকশাকে নির্ভর করে অনেক ইন্টরিয়র ডিজাইনের কাজ করা হয়েছে। প্রাথমিক রঙের সাথে সাদা, কালো, ধূসর রংকে প্রধান্য দিয়ে ব্যাংক, কর্পোরেট অফিস থেকে শুরু করে ড্রয়িং-ডাইনিং-বেডরুম এবং বাচ্চাদের রুম পর্যন্ত সজ্জিত করা হয়েছে। রং এবং রেখার একটা ছবি কীভাবে স্থান ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে আনন্দদায়ক এবং রঙিন ছন্দময় রূপে প্রকাশিত হয়ে এখনো চলছে তা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। মূলত আমাদের দৃষ্টি যে দিগন্ত এবং উলম্ব

রেখার গতিশীল ভারসাম্যপূর্ণ রূপ চায় সেই রহস্যটি যেন মন্দ্রিয়ান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।[২৯]

The after life of Piet Mondrian গ্রন্থে ন্যান্সি জে. ট্রয় (স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির আধুনিক ইউরোপীয় এবং আমেরিকার শিল্পের অধ্যাপক) ১৯৪৪ সালে মন্দ্রিয়ানের মৃত্যুর পর কীভাবে তাঁর নকশার বাণিজ্যিকীকরণ করা হয়েছিল তা অনুসন্ধান করেন। তিনি লিখেছেন, যখন মন্দ্রিয়ান নামটি ফ্যাশন, গ্রাফিক ডিজাইন এবং স্থাপত্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়, তখন এটি তাঁকে একজন স্বতন্ত্র শিল্পীতে পরিণত করে।[৩০]

নিম্নে মন্দ্রিয়ানের নকশার আলোকে ডিজাইন করা কিছু পণ্যের ছবি দেওয়া হলো :

চিত্র : ২২ : স্থাপত্য

চিত্র : ২৩ : গৃহ অভ্যন্তরীণ সজ্জা

চিত্র : ২৪ : টি-শার্ট

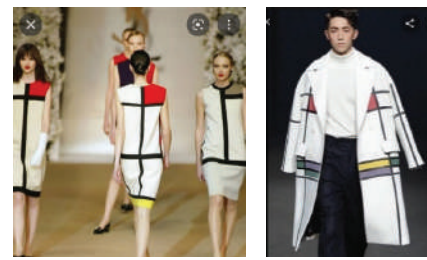

চিত্র : ২৫ : পোশাক

চিত্র : ২৬ : আসবাবপত্র

চিত্র : ২৭ : কেক

চিত্র : ২৮ : ঘড়ি

চিত্র : ২৯ : কানে দুল

চিত্র : ৩০ : স্নিকার

চিত্র : ৩১ : লেডিস স্যান্ডেল

মন্দ্রিয়ান বিশ্বাস করতেন যে, আধুনিক শিল্প সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কৃতিতে বিভাজন অতিক্রম করবে এবং পরিচ্ছন্ন প্রাথমিক রং, ফর্মের সমতা এবং ক্যানভাসে গতিশীলতা শিল্পের একটি নতুন সাধারণ ভাষা হয়ে উঠবে। শত বছর পরও শিল্পী পিয়েট মন্দ্রিয়ানের বিভিন্ন পর্বে চিত্ররচনার ধারাবাহিকতায় জ্যামিতিক ফর্মের চিত্রসমূহ পপ কালচার ঘরানার নকশায় পরিবর্তিত হয়ে অসংখ্য হ্যান্ড ব্যাগ, জুতা, ফার্নিচার, গাড়ি, গৃহ, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, অ্যালবাম কভার, ব্যবহারিক অলংকারের ডিজাইনসহ অসংখ্য ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। যখন কেউ আমেরিকার সাম্প্রতিক শিল্পকলা চর্চার প্রবণতাগুলো নিয়ে গবেষণা করেন, যেমন–Abstract PaintingHard–Edge Abstraction, OP Art অথবা Color Field Painting তখন প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মন্দ্রিয়ানের কিছু প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিংশ শতাব্দীর গতিপথে তার প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে পিকাসো, ব্র্যাক বা মাতিসকেও ছাড়িয়ে যায়।

তথ্যনির্দেশ :

[1] www.theartstory.org, 16-9-2022)

[2] http://www.guggenheim.org, 16-9-2022.

[3] Alaston, Isabella (2014). Piet Mondrian. Taj Book International LLc., Charlotte, North Carolina, U.S.A., p. 4-5.

[4] Piet Mondrian, op. cit., pp. 6-7

[৫] থিওসফি বলতে ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মকে বুঝায় যেটি রাশিয়ান প্রবাসী হেলেনা ব্লাভৎস্কি-র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তার এই ধর্মের শিক্ষা মূলত তার লেখা থেকে উদ্ভূত। ১৮৭৫ সালে নিউইয়র্কে ব্লাভৎস্কি এবং আমেরিকান Henry Olcott I William Quan Judge-এর থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে থিওসফির ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মূলত এশিয়ার হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং নিউ প্লেটোনিজমের মতো প্রাক-ইউরোপীয় দর্শন বা মতোদর্শের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। থিওসফির শিক্ষা হলো আধ্যাত্মিতায় পারদর্শী ব্যক্তিদের প্রাচীন এবং গোপনীয় ভ্রাতৃত্ব, যাদের মাস্টার বা গুরু বলা হয় তারা বিশ্বজুড়ে থাকলেও তিব্বতকেন্দ্রিক। এসব গুরু মহাপ্রজ্ঞা এবং আধ্যাত্মিক শক্তি লালন করে। থিওসফিস্টরা মনে করে এসব গুরু ব্লাভৎস্কি-র দ্বারা তাদের শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে আধুনিক থিওসফিক্যাল আন্দোলন শুরু করেছিল। থিওসফি

এটা শেখায় যে মানব জীবনের উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং মানবের শারীরিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নতুন শরীরে পুনর্জন্মের (reincarnation) অভিজ্ঞতা লাভ করে। যদিও এটা কোনো নির্দিষ্ট নৈতিক বিধিতে আবদ্ধ নয় তবুও এটি বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক উৎকর্ষতার মূল্যবোধ প্রচার করে।

[6] Piet Mondrian, op. cit., p. 7

[7] www.mondriantrust.com; Piet Mondrian – From Figurative to Abstract; 18-9-22, youtube.

[8] www.mondriantrust.com; Piet Mondrian – From Figurative to Abstract; 18-9-22, youtube.

[9] www.mondriantrust.com; Piet Mondrian – From Figurative to Abstract; 18-9-22, youtube.

[10] www.mondriantrust.com; Piet Mondrian – From Figurative to Abstract; 20-9-22, youtube.

[11] www.mondriantrust.com; Piet Mondrian – From Figurative to Abstract; 20-9-22, youtube.

[12] www.mondriantrust.com; Piet Mondrian – From Figurative to Abstract; 20-9-22, youtube.

[13] https:/medium.com/signifier/piet-mondrians-tree-paintings-cef4ccac881; 21-9-22.

[14] https:/medium.com/signifier/piet-mondrians-tree-paintings-cef4ccac881; 30-9-22.

[15] www.piet-mondrian.org; 2-10-22.

[16] www.piet-mondrian.com; 2-10-22.

[17] https:/medium.com/signifier/piet-mondrians-tree-paintings-cef4ccac881; 2-10-22.

[18] https://www.mondriantrust.com; Piet Mondrian – From Figurative to Abstract; 2-10-22, youtube.

[19] https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/later-europe-and-americas/modernity-ap/a/mondrian-composition; 3-10-22.

[20] Hugh Honour & John Fleming, A World History of Art, Laurence King, 1984, p. 671.

[21] www.mondriantrust.com; Piet Mondrian – From Figurative to Abstract; 3-10-22, youtube.

[22] www.visual-art-cork.com; 3-10-22.

[23] www.mondriantrust.com; 3-10-22.

[24] Piet Mondrian, op. cit., p. 13.

[25] Arnason, H. Harvard (1969). A History of Modern Art. Thames and Hudson, London p. 334, 335

[26] https://weburbanist.com; 3-10-22.

[27] https://www.lofficielu sa.com; 3-10-22.

[28] https://www.lofficielusa.com; 3-10-22.

[29] www.home-desingning.com; 3-10-22.

[30] www.fastcompany.com; 4-10-12.

Qwei Drm: https://www.ifitshipitshere.com/mondrian-inspired; https://weburbanist.com/2019/04/17/mondrian-lives-on-theartists-influence-on-architecture-design; https://www.sleek-mag.com/article/mondrian-100-years

ছবির উৎস :

চিত্র : ১-ক

https://images.app.goo.gl/6NWUKzyJ5XMiqjdt9

চিত্র : ১-খ

https://images.app.goo.gl/EDvNWCwFuayTY1zg6

চিত্র : ১-গ

https://images.app.goo.gl/9gWEHUmLeVYnc6e19

চিত্র : ২-ক, চিত্র : ২-খ, চিত্র : ২-গ

https://images.app.goo.gl/jCTYy5xUDXL7UK7q7

চিত্র : ৩

https://images.app.goo.gl/X4sUPPrbnWPnmxsD9

চিত্র : ৪

https://images.app.goo.gl/oC7kD5ieSdFVFuJ37

চিত্র : ৫

https://images.app.goo.gl/XaJq23m63nueurdT6

চিত্র : ৬

https://images.app.goo.gl/GmEtxJnHBQwSzdqC7

চিত্র : ৭-ক, চিত্র : ৭-খ

https://images.app.goo.gl/hPr7eX6PEz6FKTJX8

চিত্র : ৮

https://images.app.goo.gl/N39RJqEXpwfp2Ub89

চিত্র : ৯

Alaston, Isabella (2014). Piet Mondrian. Taj Book International LLc., Charlotte, North Carolina, U.S.A., p. 52

চিত্র : ১০

Alaston, Isabella (2014). Piet Mondrian. Taj Book International LLc., Charlotte, North Carolina, U.S.A., p. 62

চিত্র : ১১

https://images.app.goo.gl/Nzqr21531VBPMKAR6

চিত্র : ১২

Alaston, Isabella (2014). Piet Mondrian. Taj Book International LLc., Charlotte, North Carolina, U.S.A., p. 63

চিত্র : ১৩-ক

https://images.app.goo.gl/q8LKW2bRNHYyQNyh9

চিত্র : ১৩-খ

https://images.app.goo.gl/TGRDu9CcUnQTNfvf9

চিত্র : ১৪

https://images.app.goo.gl/HGN2cBcNwdanaNZp9

চিত্র : ১৫

https://images.app.goo.gl/78DTn8sfzWBz47eeA

চিত্র : ১৬

https://images.app.goo.gl/2LBcyko2AzRPYs6cA

চিত্র : ১৭

https://images.app.goo.gl/HekDXiUopamnFcgz5

চিত্র : ১৮

https://images.app.goo.gl/1pewH2KRPJEro5BK7

চিত্র : ১৯

https://images.app.goo.gl/gdYnVnjukCdJjx9w5

চিত্র : ২০

Alaston, Isabella (2014). Piet Mondrian. Taj Book International LLc., Charlotte, North Carolina, U.S.A., p. 90

চিত্র : ২১

Alaston, Isabella (2014). Piet Mondrian. Taj Book International LLc., Charlotte, North Carolina, U.S.A., p. 91

চিত্র : ২২

https://images.app.goo.gl/TZgQPZ8d3S6SYzx48

চিত্র : ২৩

http://www.home-designing.com/piet-mondrian-de-stijl-style-interior-design-tips-inspiration-pictures-home-accessories

চিত্র : ২৫

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/models-present-dresses-by-french-designer-yves-saint-news-photo/859682032

চিত্র : ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

https://www-ifitshipitshere-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.ifitshipitshere.com/mondrian-inspired-products/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_agsa_csa=49326498&amp_ct=1668145458595&amp_tf=From%20%251%24s&ao=16681451120085&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.ifitshipitshere.com%2F

বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের চিত্রের বিষয়বৈচিত্র্য, মাধ্যম, উপকরণ ও শৈলী

নিফাত সুলতানা*

সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশে শিল্পরূপ সৃষ্টি করা হয়। একজন শিল্পী তাঁর অনুভূতি, বোধ, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে তাঁর শিল্পের জগৎ সৃষ্টি করেন। শিল্পীর সৃষ্টি নানা রূপে প্রমূর্ত হয়। তাঁর ভাবনা-কল্পনার জগৎটি চিত্রকলায় উন্মোচিত হয় বস্তুজাগতিক উপাদান-উপকরণের আশ্রয়ে। শিল্পের জগৎটি প্রকাশিত হয় বস্তুজগৎকে কেন্দ্র করেই, যদিও শিল্পবস্তু বস্তুজগতের নিয়মকানুনের অধীন নয়। আর এ কারণেই যুগ যুগ ধরে শিল্পীরা ব্যবহার করেছেন এবং করে চলেছেন নানা উপাদান-উপকরণ; আশ্রয় নিয়েছেন বিচিত্র করণকৌশলের। একটি চিত্রকর্ম গড়ে তুলতে হলে কী ধরনের উপকরণ নির্বাচন করতে হবে এবং কীভাবে তার প্রয়োগ ও সংরক্ষণ করতে হবে এসব বিষয় শিল্পীদের কাছে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যুগে যুগে আহরিত নানা ক্ষেত্রের নানা জ্ঞানকে মানুষ কাজে লাগিয়ে চিত্রশিল্পের উপকরণের ভান্ডারকে করে তুলেছে বিচিত্র ও সমৃদ্ধ। চিত্রকলার আদিতম নিদর্শন যে গুহাচিত্র তার নির্মাণ প্রক্রিয়া ও উপকরণ নির্বাচন এবং প্রয়োগের অভিজ্ঞতাকে সম্ভবত মানুষ আজও ধারণ করে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে, শৈল্পিক চেতনার যে বিকাশ তার পরিধি আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত যতটুকু বিস্তৃত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তার লাভ করেছে উপকরণ ও করণকৌশলের নানামুখী বিকাশের ধারা।

চিত্র বা মূর্তি মানেই একটি বিশেষ রূপকল্পের বহিঃপ্রকাশ। আর এই রূপকল্প সার্থক হয় শিল্পীর চিন্তাশক্তি ও মননের মাধ্যমে। শিল্পীর চিত্র-অঙ্কনে ফুটে উঠে বিষয়বৈচিত্র্য, আশ্রয় নেন বিভিন্ন মাধ্যম, উপকরণ এবং অঙ্কনশৈলীর। বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের চিত্রের বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করেছেন।

*প্রভাষক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাস্তবধর্মী ও বিমূর্ত দুই ধরনের চিত্রই পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রথম দিকে বাস্তবধর্মী চিত্রই বেশি করত। এই চিত্রগুলোতে আমরা সমাজচিত্র বা সংস্কৃতির প্রতিফলন পাই। এই ধরনের বাস্তবধর্মী কোনো চিত্র যখন কোনো প্রকাশনায় প্রকাশিত হয় তখন সেই চিত্রকে ইলাস্ট্রেশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের অনেক চিত্রই পরবর্তীসময়ে বিভিন্ন প্রকাশনায়, ডাকটিকেটে, পোস্টারে এবং ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন–জয়নুল আবেদিনের 'মই দেওয়া', কামরুল হাসানের 'তিন কন্যা' ও 'নাইওর' ইত্যাদি চিত্রসমূহ বাংলাদেশের ডাকটিকেটে প্রকাশিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে। এস.এম. সুলতানের চটের উপর তেলরং-এ করা একটি শিরোনামহীন চিত্র প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'কালি ও কলম' নামক সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকায়। এসব চিত্রশিল্প বেশকিছু রীতিনীতি, উপাদান, উপকরণ ও করণকৌশলের সমন্বিত রূপ। চিত্রশিল্পের জগৎ তৈরিতে তথা ছবি আঁকতে কিংবা বুঝতে হলে এসব রীতিনীতি, উপাদান, উপকরণ ও করণকৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হয়।

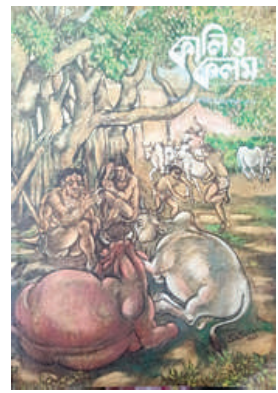

চিত্র-১ : (উপরে বামে) বাংলাদেশ ১০ টাকা ডাকটিকেট (১৯৮৬), জয়নুল আবেদিন, মই দেওয়া
চিত্র-২ : (নিচে বামে) বাংলাদেশ ৫ টাকা ডাকটিকেট (১৯৮৬), কামরুল হাসান, নাইওর
চিত্র-৩ : (ডানে) প্রচ্ছদ, কালি ও কলম, এস.এম. সুলতান, শিরোনামহীন

শিল্পের উপকরণ বলতে শিল্প সৃষ্টির জন্য যেসব জিনিস ব্যবহৃত হয় তা বোঝায়। কোনো একক উপাদান নিয়ে চিত্রশিল্পের জগৎ গড়ে উঠতে পারে না। বহুবিধ উপাদান-উপকরণের সমন্বয়েই চিত্রশিল্পের বহুমাত্রিক জগৎ গড়ে ওঠে। শিল্পীর ভাবনা পরিকল্পনা ও রীতিনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয় এই উপকরণসমূহ। প্রত্যেক

শিল্পীর ভাবনার জগৎটি ভিন্ন বলেই তাঁদের উপকরণ নির্বাচনে বৈপরীত্য দেখা দেয়। সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিল্পী যে শিল্পকর্ম নির্মাণের পরিকল্পনা করেন, তা বাস্তবায়িত হয় উপকরণের আশ্রয়ে। একইভাবে সহজলভ্য উপকরণও সঠিক নিয়মে ব্যবহার করলে ছবির স্থায়িত্ব বেড়ে যায়। উপকরণ ব্যবহারের প্রক্রিয়া যদি সঠিক না হয় এবং উপকরণের মান ভালো না হলে উপকরণের ভেতর থেকে ছবি নষ্ট হতে থাকে। বাইরের আবহাওয়ায় যে ক্ষতি হয় তা নানা উপায়ে রক্ষা করা যায়, কিন্তু উপকরণের ক্ষতি ঠেকানো যায় না। মানবদেহের মতো তাই চিত্রকলার উপকরণের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। এ প্রসঙ্গে Jonathan Stephenson বলেছেন–

> Paintings should always be treated as objects of value and as living things, which, like human beings, can only survive comfortably in certain conditions; they dislike intense cold and extreme heat, and are unhappy in damp or excessively dry conditions. Most of all, they do not like abrupt fluctuations in temperature and humidity, as this causes sudden physical changes which over a period of time fatigue both the paint and its support, resulting in damage. All though paintings cannot be allowed to dictate the conditions of life, as they might in the controlled atmosphere of a gallery, they should be accommodated thoughtfully within them. (Stephenson, 1993:185)

উপকরণের ব্যবহার সেই আদিকালের গুহাবাসীদের সময় থেকেই ছিল, কিন্তু উপকরণাদি ছিল অত্যন্ত সীমিত ও সাদামাটা। চিত্র শুধু এক টুকরো সমতল জমি মাত্র যার উপরে রং ছড়ানো থাকে। এই সমতল জমিকে শিল্পী বিভিন্ন উপকরণ ও শৈলীর মাধ্যমে ধাপে ধাপে হারিয়ে যাওয়া বিষয়কে সাধারণের সামনে উপস্থাপন করে। ...শিল্পকলার মূল কথাই হচ্ছে অনেক অসংলগ্ন গৌণ উপকরণ ফেলে দিয়ে মূল জিনিসটি বাছাই করতে পারা,... যা কিছু মুখ্য এবং উল্লেখযোগ্য তাকে ফুটিয়ে তোলা। কারিগর তখনই শিল্পী হন যখন তিনি ছবির নানাবিধ উপকরণ রূপসৃষ্টির কাজে লাগান তার নিজস্ব কৌশলে (মিত্র, ১৯৮৮ : ৫৮-৫৯)।

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের, বিশেষ করে প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের কাজ বিশ্লেষণ করতে গেলে এর প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা আবশ্যক হয়ে যায়। প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যেহেতু ভারতে, তাই ভারতীয় শিল্পের প্রভাব অথবা অনুপ্রেরণা তাঁদের কাজে বিদ্যমান বলে বিবেচনা করা যায়।

ভারতবর্ষের গুপ্ত যুগে সর্বপ্রাচীন চিত্রকলার চিন্তাভাবনা ও উপকরণের প্রয়োগ পদ্ধতি এক ধ্রুপদি ধারার সূচনা করে, যা চিত্রশৈলী ও মাধ্যমে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। ইউরোপীয় ফ্রেস্কো পদ্ধতি বা সমসাময়িক বাইজেন্টাইনীয় পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এর নির্মাণশৈলী। বলা যায় এটি টেম্পারা এবং ফ্রেস্কো এর মাঝামাঝি নির্মিত একটি নতুন ধরনের পদ্ধতি।

পাল যুগের পুথিচিত্র (চিত্র-৪) পরীক্ষা করে দেখা গেছে উপকরণ হিসেবে তাল ও তেরেট দুই ধরনের তালপাতা এই পুথিচিত্রগুলোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ তালপাতা পুরু, অমসৃণ, দৈর্ঘ্য কম ও সহজেই ভঙ্গুর, যা পচনশীল বলে কম ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে তেরেট পাতা সূক্ষ্ম, পাতলা, লম্বা এবং দীর্ঘস্থায়ী বলে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। তালপাতাকে পোকা ও পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং একে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার জন্য পাতাগুলোকে গোছা অবস্থায় মাসখানেক ডুবিয়ে রেখে পরবর্তীসময়ে পানি ঝরে গেলে পাতাগুলো আলাদা করে ছায়াতে শুকানো হতো। প্রতিটি পাতার দুদিক শঙ্খ দিয়ে ঘষে মসৃণ করে সাজিয়ে সমান করে কাটা হতো। সাদা রং অর্থাৎ শঙ্খের গুঁড়া ছাড়াও এক ধরনের সাদা মাটি পাওয়া যেত, যা চিত্র-উপযোগী ক্ষেত্রান্তরণের জন্য ব্যবহৃত হতো বলে মনে করা হয়। পাল চিত্রগুলো গোয়াশ পদ্ধতিতে করা। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত রঙের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের জন্য জানা যায় কতবেল ও নিমের নির্যাস রঙের সাথে মিশ্রিত করা হতো। শঙ্খের গুঁড়া থেকে সাদা রং এবং কাজল থেকে তৈরি কালো রঙের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পালযুগে চিত্রকররা কী ধরনের তুলির ব্যবহার করেছে তা আমাদের জানা নেই, তার কোনো নিদর্শনও বর্তমানে বিদ্যমান নেই (সরস্বতী, ১৯৭৮ : ১১১)। পুথির দুদিকে যে কাঠের পাটা সংযুক্ত হতো, তার ভিতরে ও বাইরে চিত্র অঙ্কিত হতো।

চিত্র-৪ : পাল পুথিচিত্র, অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা

মোগল চিত্ররীতি ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র (আলম, ২০০৮ : ৯৩)। এ সময়ে মিনিয়েচার ও প্রতিকৃতি চিত্রণ উন্নতির শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছিল (আলী, ২০০৬ : ২৩৯)। চিত্রকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একাধিক শিল্পী দ্বারা মিনিয়েচার অঙ্কন হতো (আকন্দ, ১৯৯৪ : ১৬৯)। কাগজের উপর ছবি আঁকার সময় প্রথমে খুব যত্ন করে বার্নিশ লাগিয়ে লাল কালি দ্বারা প্রাথমিক রেখা আঁকা হতো। এরপর কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে শিল্পী তা কালো কালিতে আঁকতেন। তারপর কাগজের উপর পাতলা করে একটি সাদা রঙের আস্তরণ দেওয়া হতো। সবশেষে রাজকীয় জাঁকজমকের কারণে এ সময় সোনার জল, টার্কিস নীল এবং মূল্যবান পাথরের গুঁড়ার ব্যবহারও দেখা যায়। অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখার জন্য তারা একটি চুল দ্বারা বিশেষ ধরনের তুলি তৈরি করতেন যাকে তারা বলতেন এক বলাকা তুলি। ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেলে বাড়তি উজ্জ্বলতা আনার জন্য প্রচলিত ছিল বার্নিশ লাগানোর রেওয়াজ।

মুর্শিদাবাদ সময়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটি মিশ্রিত পদ্ধতি চিত্রকলায় দেখা যায়। ইংরেজ কর্মচারীদের অভিপ্রায় অনুযায়ী আঁকা এসব চিত্রে ঘন জলরঙের বদলে ব্রিটিশদের অনুকরণে জলরং এবং পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পরবর্তীসময়ে টিলি কেটল, জন জোফানী, আর্থার ডেভিস প্রমুখ প্রায় ষাটজনের অধিক ইংরেজ শিল্পী ভারতবর্ষে আসেন এবং তেলরং ও জলরংকে চিত্রকলার মাধ্যম হিসেবে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ ঘটান (গুহ, ১৯৭৮ : ১৪-১৫)।

ব্রিটিশদের জলরং পদ্ধতি ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে উদ্ভাবিত বাংলার লোকশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোলকাতার কালিঘাটের পটচিত্রে প্রভাব ফেলে। পট অঙ্কিত হতো কাপড়ের উপর। কাপড়ের ওপর কখনো কেবল কাদামাটি বা গোবর মিশ্রিত প্রলেপ

দিয়ে তার ওপর তেঁতুল বিচির আঠা লাগিয়ে পট আঁকার জন্য মসৃণ ও দীর্ঘস্থায়ী জমিন তৈরি করা হতো। ইটের গুঁড়োর সঙ্গে তেঁতুল বিচির আঠা মিশিয়েও জমিন এবং কখনো কাপড়ের উপর কাগজ লাগিয়েও অঙ্কন করা হতো (আহমেদ, ১৯৯৮ : ১-৯)। পরবর্তীকালে এই পটুয়ারা বিলেতি কাগজে অস্বচ্ছ জলরং ব্যবহার করতেন, যা ভারতীয় চিত্র মাধ্যমে আরেকটি নতুন দিকের উন্মেষ ঘটায়। কেবল লোকশিল্পে নয়, পাশ্চাত্যের রীতিতে নতুন মাধ্যম প্রয়োগ কোলকাতার শিল্পচর্চায় অত্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শেষ অংশে হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ ওয়াশ পদ্ধতির সঙ্গে নিজস্ব পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কাব্যিক, ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে চিত্রাঙ্কন করেন (চিত্র-৫)। এ সময় ভারতীয় মিনিয়েচার চিত্রের করণকৌশল ও অজন্তার ভিত্তি চিত্রের রূপবিন্যাস ও নরনারীর রূপ সৌষ্ঠব আদর্শ হিসেবে গৃহীত হলো (ভট্টাচার্য, ২০১০ : ১২৯)।

যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথের এই অতীতচারিতাকে মেনে নিতে পারেননি, তিনি চেয়েছিলেন উদার আন্তর্জাতিকতা। ছবি আঁকার রীতি একান্তই তাঁর নিজস্ব (চিত্র-৬)। পদ্ধতিগত কৌশল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য–

> "আমি ছবিতে একবারেই রং দেই না, আগে পেন্সিল দিয়ে ঘসে ঘষে একটা রং তৈরি করি মানানসই করে, তারপরে তার উপরে রং চাপাই। তাতে রংটা বেশ জোরালো হয়।... রঙের উপর রং চাপাতে হয়, তবেই না ছবি হয়। .....আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, তখন আমি তা নষ্ট করে দিই। খানিকটা কালি ঢেলে দিই বা এলোমেলো আঁচড় কাটি। যখন ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার উদ্ধার করি। এমন করে তার এক একটা রূপ বের হয়, আমি মানুষের জীবনটাও এমন করে দেখি। (রফিক, ২০১২ : ১১৩)

চিত্র-৫ : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
ভারতমাতা, জলরং, ১৯০৫

চিত্র-৬ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
আত্মপ্রতিকৃতি

ভারতীয় চিত্রকলার পরিসর ব্যাপক ও বহুমুখী। ভারতীয় চিত্রকলার ধারাবাহিকতায়ই মূলত বাংলাদেশের চিত্রকলায় নবতরঙ্গের সূচনা ঘটে। ফলে বাংলাদেশের চিত্রকলা রূপ-রীতির আলোচনায় তা হয়ে ওঠে একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক। ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা পরবর্তীসময়ে ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলার ঢাকায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে "গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট" স্থাপিত হয় এবং বাংলাদেশের শিল্পচর্চার সূচনা ঘটে (সেলিম, ২০০৭ : ২৬)। জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬), কামরুল হাসান (১৯২১-৮৮), সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯২২-২০১২), এস. এম. সুলতানের (১৯২৩-১৯৯৪) হাত ধরে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা চর্চা (জুঁই, ২০১২)। কোলকাতার ইউরোপীয় একাডেমিক রীতিতেই এঁদের চিত্রচর্চার সূচনা, পরে ক্রমশ বিভিন্ন লোকশিল্পের অনুষঙ্গ ও পাশ্চাত্যের আধুনিক নানান রীতির প্রভাবসমূহ এসেছে। এ সময়ে জলরং, গোয়াশ, তেলরং, অ্যাক্রেলিক, ছাপচিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্পীরা চর্চা করেন। এছাড়াও শিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন নির্বস্তুক নিরীক্ষাধর্মী ছবিও এঁকেছেন। যেখানে উপকরণে ও কৌশলে এসেছে বৈচিত্র। তাদের ছবিতে রেখা এবং রং, প্রধানত রঙের প্রলেপনগুলো অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পকৌশলকে সর্বতোভাবে বোধের আয়ত্তে এনে বিমূর্ত ফর্মের মাধ্যমে নিজেদের কলাকৌশলকে প্রকাশ করেছেন (আহসান, ১৯৮৩ : ২৩১)।

মানবতাবাদী শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) এ উপমহাদেশের পূর্ব শিল্পকর্ম থেকে ভিন্ন মেজাজের দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন চিত্রসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্প নিছক শিল্পের জন্য নয়, শিল্প সর্বাংশে জীবনের জন্য। আর এ কারণে জীবনধর্মিতাই তাঁর শিল্পকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি বিভিন্ন সময় জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। মানুষ ও প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করেছেন। যার ফলে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ভিন্নতা তাঁর কাজের মধ্যে অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। তাঁর শৈশবের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্প মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বিভিন্ন স্বল্প রং ও বলিষ্ঠ রেখায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন সমগ্র বাংলার লোকজীবন। বিষয়বস্তুতে যেমন–বিচিত্রতা ছিল, তেমনি উপকরণ ও শৈলীগত বৈচিত্রসমৃদ্ধ জয়নুলের শিল্পকর্ম। তিনি কাঠপেন্সিল, চারকোল, কালি তুলি, কালি কলম, রঙিন পেন্সিল, খাগের কলম ও কালি, বিভিন্ন ধরনের আর্ট পেপার এবং সাধারণ কাগজে মূল ড্রইং ও স্কেচগুলো সম্পন্ন করেছেন। অপেক্ষাকৃত মোটা বোর্ড কাগজও ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায় (চিত্র-৭) উপকরণ ব্যবহারে পরিবর্তন আসে। তিনি তুলিকে কখনো কোমল কখনো শুষ্ক-কর্কশ, রঙের ঘনত্বের তারতম্য এবং কাগজের পটভূমিকে কাজে লাগিয়েছেন (হোসেন, ২০০৭ : ২৭৫)। এখানে তিনি অত্যন্ত সস্তা কাগজে

চিত্র-৭ : জয়নুল আবেদিন, দুর্ভিক্ষ, কালি ও তুলি, ১৯৪৩

চিত্র-৮ : জয়নুল আবেদিন, সাঁওতাল দম্পতি, জলরং, ১৯৫১

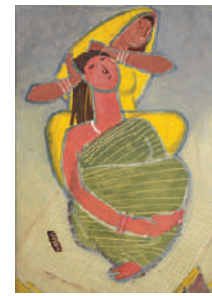

চিত্র-৯ : জয়নুল আবেদিন, প্রসাধন

কাল-কালি ও ক্ষিপ্রতার সাথে তুলি চালনার মাধ্যমে বাংলার সাধারণ মানুষের করুণ পরিণতি ফুটিয়ে তোলেন।

স্বচ্ছ জল রঙে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। যদিও শিক্ষাজীবনে ভারতীয় শৈলীর পরিবর্তে পাশ্চাত্য ধাঁচে তেলরঙে ছবি আঁকাকে বেছে নিয়েছিলেন। জলরং ও তুলি-কালি মাধ্যম দুটি ছাত্রাবস্থা থেকেই ছবি আঁকার প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে। প্যারিস ফেরত শিক্ষক বসন্ত গাঙ্গুলীর কৌশল জয়নুলকে আকৃষ্ট করেছিল (হোসেন, ২০০৭ : ২৭৩, ২৭৫)। এক্ষেত্রে জয়নুল আবেদিন নিজস্ব পদ্ধতিগত কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাঁর বিদ্রোহী (১৯৫১), মই দেয়া (১৯৫১), কালবৈশাখী (১৯৫১), গ্রাম্য মহিলা (১৯৫৩), কৃষক (১৯৫৩), সাঁওতাল, সাঁওতাল দম্পতি (১৯৫১) প্রভৃতি জলরঙের চিত্রকর্মগুলো উল্লেখযোগ্য। টেম্পারা (এগ টেম্পারা), গোয়াশ ও পোস্টার রং ইত্যাদি মাধ্যমেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। দুই মহিলা (১৯৫৩), পাইন্যার মা (১৯৫৩), গুন টানা (১৯৫৩), পটুয়া ইত্যাদি চিত্রকর্ম গোয়াশ মাধ্যমের সাক্ষ্য বহন করছে। এসব চিত্রের রূপ, বিষয়বস্তু, রং প্রয়োগ, রেখার ব্যবহার প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাংলার লোকরীতির সাথে পাশ্চাত্য রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়।

শিল্পী জয়নুল তেলরঙে প্রচুর কাজ করেছেন। সাপোর্ট হিসেবে ক্যানভাস, ক্যানভাস

চিত্র-১০ : জয়নুল আবেদিন, মনপুরা ৭০, তুলি কালি ও মোম, ১৯৭০

কাগজ, চট, হার্ডবোর্ড, মাউন্টবোর্ড ইত্যাদি নির্বাচন করেছেন। তেলরঙে তাঁর যেসব কাজ বেশি সমাদৃত হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য–চায়ের স্টল (১৯৪৩), পাঠরত (১৯৫৩), প্রসাধন (১৯৬৭), রমণীরা (১৯৭৩), স্নানরতা (১৯৭৬)। অ্যাক্রেলিক-এ শিল্পী জয়নুলের কাজের মধ্যে দুই মুখ (১৯৭০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জয়নুলের চিত্রে তেলরং ও টেম্পারা; মোম, কালি ও জলরং; কালি ও মোম; রঙিন কালি ও কলম প্রভৃতি মিশ্র মাধ্যমগুলোর উপস্থিতি রয়েছে, অন্যদিকে ছবি আঁকার পাশাপাশি শিক্ষক জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রচ্ছদ-অঙ্কন এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত

ইলাস্ট্রেশনের কাজেও যুক্ত হতে দেখা যায় (হোসেন, ২০০৭ : ২৭৬)। সংগ্রাম (তেল ও টেম্পারা), নবান্ন (মোম, কালি ও জলরং), মনপুরা ৭০ (কালি ও মোম), ট্রাফিক পুলিশ (১৯৪৯), মুক্তিযোদ্ধা (কালি ও ওয়াশ) প্রভৃতি বিখ্যাত কিছু শিল্পকর্ম মিশ্রমাধ্যমে সৃষ্টি। জয়নুলের 'নবান্ন' ও 'মনপুরা ৭০' শীর্ষক স্ক্রোলচিত্রে বাংলার মানুষের সংগ্রামী স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। 'নবান্ন' চিত্রটিতে কাগজের উপর মোম, কালি ও জলরঙের মাধ্যমে তিঁনি বাংলার গ্রামজীবনের একটি চিরকালীন বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছেন (আজিজুল, ২০০৪ : ২২)। বিষয়গতভাবে নবান্ন যেমন–বাঙালির সর্বজনীন ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য, তেমনি এই চিত্রের উপকরণ এবং আয়োজনেও আছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী জড়ানো-পটচিত্রের আবহ (হোসেন, ২০০৭ : ২৮২)। অন্যদিকে 'মনপুরা ৭০' স্ক্রোলচিত্রে তিনি তুলে ধরেছেন কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞের এক করুণ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা (আজিজুল, ২০০৪ : ২২)। দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার মতো এখানেও বিষয়ের সাথে সংহতি রেখে শুধু কালোরং ব্যবহার করা হলেও এতে তুলির আঁচড় ততটা সুনির্দিষ্ট ও তীক্ষ্ণ নয়। বরং ফুলে-ফেঁপে যাওয়া লাশের মতোই কিছুটা নমনীয় ও আলগা ধরনের (হোসেন, ২০০৭ : ২৮৩)। শিল্পী জয়নুল আবেদিন জীবনকে সাধারণ মানুষের মৃত্তিকা ও জলপ্রবাহের মধ্যে আবিষ্কার করে তিনি আমাদের দেশের প্রাণকেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের মতোই খুব সাধারণ ছিল চিত্রের ভাষা-উপকরণশৈলী।

পটুয়া কামরুল হাসানের (১৯২১-১৯৮৮) এপিটাফে উদ্ধৃত আছে–"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছো ঠাঁই"। চরণদ্বয়ের সত্যতা নিরূপিত হয়েছে আজ ও আগামী দিনে তাঁর অবস্থানের সূত্র ধরে। কেননা তিনি তাঁর কর্মের মধ্যেই চিরজীবী হয়ে আছেন ও থাকবেন। বাংলার লোকঐতিহ্য চেতনা ছিল কামরুল হাসানের শিল্প-সৃষ্টির আদর্শ। তিনি পটুয়াদের শিল্পরীতি ও রং গ্রহণ করেছিলেন (আজিজুল, ২০০৩ : ২৩)। সত্তর-আশির দশকে এসে তিনি লোককলার সঙ্গে আধুনিক শিল্পবৈশিষ্ট্যের সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে শিল্পরীতির প্রদর্শন করেন, তা যেন যামিনী রায়কে অতিক্রম করে এসেছে অনেক দূর। বলা হয়ে থাকে, "যামিনী রায়ের যেখানে শেষ কামরুল হাসানের শুরু ঐখান থেকেই।" (আজিজুল, ২০০৩ : ২৪)। তিনি প্রাথমিক রং হলুদ, লাল, নীলসহ উজ্জ্বল রং ব্যবহার করেছেন। মাতিস

আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রাচ্যের আলংকারিক নকশায়–উজ্জ্বল লাল, হলুদ, নীল ও সবুজ রঙে তেমনি কামরুলের ছবিতে ও নকশার উপস্থাপনাতে সমমনতা লক্ষ করা যায় (জামান, ১৯৯৮ : ১১৪)। তিনি মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন তেল রং, জল রং, গোয়াশ, টেমপারা, প্যাস্টেল ও পোস্টার রং। ড্রইংয়ের ক্ষেত্রে কালি, তুলি, পেন্সিল, চারকোল ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। ক্যানভাস, হার্ডবোর্ড, কাগজ ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন চিত্রের সাপোর্ট হিসেবে। এছাড়া কাঠখোদাই, লিনোকাট, এচিং, সেরিগ্রাফ, লিথোগ্রাফ প্রভৃতি ছাপচিত্রের পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন।

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে কমার্শিয়াল কাজের অগ্রদূত কামরুল হাসান। তিনি বাংলাদেশের

চিত্র-১১ : কামরুল হাসান, উঁকি, গোয়াশ, ১৯৬৭ ও মোম, ১৯৭০

চিত্র-১২ : কামরুল হাসান, স্নান, তেলরং, ১৯৬৬

জাতীয় পতাকার নকশা যেমন–করেছেন তেমনি দেশের জাতীয় প্রতীক, বাংলাদেশ ব্যাংক, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, পর্যটন কর্পোরেশন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ইত্যাদির মনোগ্রাম এঁকেছেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক তাই যথার্থই বলেছেন,

> বইয়ের প্রচ্ছদ কিংবা অঙ্গসজ্জা কিংবা পত্রিকার অলংকরণ সবকিছুতে বিষয়ানুযায়ী ড্রইং, তদনুরূপ মোটিফ ও রং ব্যবহারের ফলে কামরুল হাসানের ব্যবহারিক শিল্পচর্চাও তাৎপর্য অর্জন করেছে। ক্যালিগ্রাফিতেও

> তিনি সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই না, প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জাও যে চিত্রকলার পাশাপাশি ভিন্ন একটি মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে গ্রাফিক গুণই মুখ্য, সেই বোধটিও এদেশে কামরুল হাসানই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন। (আজিজুল, ২০০৭ : ২৯৬)

গুণটানা (জলরং, পঞ্চাশের দশক), তিন কন্যা (তেলরং, ১৯৫৫), স্নান (লিথোগ্রাফ, ১৯৫৮; তেলরং, ১৯৬৬), সুখী প্রত্যাবর্তন (তেলরং, ১৯৬০; নাইওর নামে ১৯৭৫-এ অঙ্কিত), উঁকি (গোয়াশ, ১৯৬৭), বাউল (জলরং, ১৯৬৭; লিনোকাট, ১৯৭৪; তেলরং, ১৯৭৭), জেলে (জলরং, ১৯৬৭; তেলরং, ১৯৮২), গরুর স্নান (জলরং, ১৯৬৭), মৎস্য স্বপ্ন (লিনোকাট, ১৯৭৪), মীন ও বিড়াল (গোয়াশ, ১৯৭৪), নবান্ন (জলরং, ১৯৭৭) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু চিত্রের নাম (আজিজুল, ২০০৭ : ২৯১-২৯২)।

চিত্র-১৩ : কামরুল হাসান, তিন কন্যা, তেলরং, ১৯৫৫

মাধ্যম হিসেবে স্কেচ এবং কালো-কালি প্রধান্য পেয়েছে তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এবং বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক প্রতিবাদমূলক কার্টুনচিত্রে, যেমন–মুক্তিযোদ্ধা (স্কেচ, ১৯৭১), মুক্তিযোদ্ধা রমণী (কালো কালি, ১৯৭১), ১৯৭১-এর সেইসব জানোয়ারের জের টেনে (স্কেচ, ১৯৭২), দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে (স্কেচ, ১৯৮৮)। দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতা কামরুল হাসানের মধ্যে সর্বদা অটুট ছিল, যার অন্যতম নিদর্শন হলো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর আঁকা ইয়াহিয়ার দানবাকৃতি সংবলিত পোস্টারচিত্র "এই জানোয়ারদের হত্যো করতে হবে"। স্বাধীনতা পরবর্তীসময়ে বাংলাদেশের কিছু শ্রেণির মানুষের ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রতিযোগিতার প্রতিবাদসরূপ যে প্রতীকী চিত্রমালার সৃষ্টি করেছেন তাতে ব্যবহার করেছেন সাপ, গিরগিটি, শৃগাল, কচ্ছপ প্রভৃতি। কামরুল হাসানের খেরো খাতাও তাঁর শিল্পকর্মের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বিভিন্ন রঙিন কলমের ছোঁয়ায় তাঁর সুন্দর লেখনী

শিল্পের রূপ ধারণ করেছে নানান রং, ড্রইং ও ডিজাইনের মাধ্যমে। তিনি বর্ণ, রেখা ও গড়ন এই উপাদানের কোনো একটিকে প্রধান্য দিয়ে ছবি রচনা করেন, কখনো প্রতীকের মিছিলের আয়োজনে আমৃত্যু স্বদেশের অপশাসকের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন শিল্পী কামরুল (খালেদ, ২০০০ : ৪৭)।

কামরুল হাসানের চিত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে নারী। তাঁর চিত্রে নারীকে বিভিন্ন রূপে উপস্থাপন করেছেন, ফুটিয়ে তুলেছেন নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিক। নারীসৌন্দর্য ও প্রকৃতির মাঝে তিনি মিল খুঁজে পেয়েছেন। শিল্পী তাঁর সৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি, জনজীবন, নিসর্গ ও নারীর একাত্মতা, প্রতীকায়ন ও প্রতিবাদ প্রভৃতি উপস্থাপন করেছেন অবলীলায়।

দীর্ঘদিনের একব্রতী বিরামহীন শিল্প সাধনায় সৃজন উদ্যানকে সমৃদ্ধ করেছেন শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯২২-২০১২)। তাঁর নানা মাধ্যমের কাজে আমরা যে সৃজনী উৎকর্ষ ও পরিশীলিত আবেগ প্রত্যক্ষ করেছি, নানা দিক থেকে আমাদের চিত্রকলার ভুবনে তা হয়ে উঠেছে ব্যতিক্রমী ও বিদিত হবার মতো ঘটনা। ধীরস্থির শান্ত স্বভাবের এই প্রকৃতি প্রেমিক শিল্পীর কাজে লোকশিল্পের শান্ত-স্নিগ্ধ রূপটি ফুটে ওঠে। তার কাজে আমরা দেখি ফরমের বিমূর্ত রূপায়ণ। পঞ্চাশ দশকের শিল্পী বেশ কিছুদিন ইউরোপে কাটান। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তাঁর শিল্পকলায় আন্তর্জাতিক পাশ্চাত্য প্রভাব পড়ে।

শিল্পী শফিউদ্দিন এচিং আর উড এনগ্রেভিংয়ের জন্য বিখ্যাত হলেও তিনি প্রথম সম্মান পেয়েছিলেন তেল চিত্রের জন্য। দুমকা-১ (তেলরং, ১৯৪৬), দুমকা-২ (তেলরং, ১৯৪৬), শালবন দুমকা (তেলরং, ১৯৪৬), থ্রেশিং প্যাডি (তেলরং, ১৯৫২), মাছ ধরা (তেলরং, ১৯৫৬) কাঠমিস্ত্রি (তেলরং, ১৯৫৬) প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত তেলরং চিত্র। তাঁর তেলরঙে আঁকা চিত্রাবলীতে কখনো ইমপ্রেশনিস্টদের মতো ছোপ দিয়ে দিয়ে রঙের ব্যবহার আবার কখনো আলো ছায়ার মাধ্যমে আকারগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়াস পায় (সোম, ২০০৭ : ৩০২-৩০৩)। তিনি যতক্ষণ না মনে করেন ছবি পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করেছে ততক্ষণ এ ছবিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়, সৃষ্টির অপূর্ণতা ও পূর্ণতা আনয়নে ক্রমাগত কাজ করেই যান। সে চিত্র হোক কিংবা তাম্রতক্ষণ (জামান, ২০০৮ : ৩)। তিনি ছবিতে ফ্লাটভাবে রং ব্যবহার করেন। রং দিয়ে বিভিন্ন ফর্ম ও

শেপ তৈরি করেন। সাপোর্ট হিসেবে চিত্রে তিনি ক্যানভাস, হার্ডবোর্ড, কাগজ ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তিনি চারকোলে বহুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর তেল রং ও এনগ্রেভিং সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি মাধ্যম হলেও একটি আরেকটির সম্পূরক। তামার প্লেটে কিংবা কাঠে শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ তাঁর কুশলী হাতের স্ট্রোকে চিত্রের বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলেন অসামান্য দক্ষতায়। গৃহাভিমুখী (উড এনগ্রেভিং, ১৯৪৪) ছাপচিত্রটিতে আকাশে বাহারি মেঘ ও ধানগাছের ডগায় আলো এনেছেন কাঠের রৈখিক খোদাই-এর মাধ্যমে। সাঁওতাল রমণী (উড এনগ্রেভিং, ১৯৪৬), গুনটানা (এনগ্রেভিং, ১৯৫৮), বন্যা, মাছ ধরার সময়, নেমে যাওয়া বান, সেতু পারাপার (এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৫৯) ইত্যাদি তাঁর চমৎকারিত্বের কিছু উদাহরণ।

''তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও-আমি এই বাংলার পারে র'য়ে যাব'' শিল্পী শেখ মোহাম্মদ সুলতানের (১৯২৩-১৯৯৪) জীবনদর্শন ও শিল্পদর্শনের মূলনীতিই ছিল এটি। কেননা শিল্পী এস.এম. সুলতানের চিত্রের বিষয়বস্তু বাংলার শ্রমজীবী মানুষ। বাংলার সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বকে নয় বরং তাদের তেজদীপ্ত প্রতিমূর্তি আবিষ্কার করা যায় তাঁর চিত্রে। চিত্রশিল্পে একমাত্র তিনিই এরূপ ভিন্ন ধাঁচে মানুষের রূপকল্প নির্মাণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর ভাষ্য '...জয়নুল, তুমি আমার জাতিকে রুগ্নক্লিষ্ট রূপ দিয়েছো। আমি তাদের মাসল্‌স্ দেব, ঐশ্বর্য ও শক্তি দেব' (আকন্দ, ২০০৭ : ৩১৩)। এই নিভৃতচারী শিল্পী বহুদিন ধরে দেশীয় ভেজষ উপকরণ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। ছোটবেলায় সুযোগ পেলেই কাঠ কয়লা, কাচা হলুদ ও পুঁই গাছের ফলের রস টিপে টিপে ছবি আঁকার অভিজ্ঞতাই হয়তো পরবর্তীকালে রং নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়াস জুগিয়েছে (ছফা, ১৯৯৫ : ১০১-১০২)। তাঁর চিত্রের মূলে রয়েছিল বাংলার মানুষ, মানুষের জীবনযাপন প্রক্রিয়া। বাংলার খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষকে অসাধারণ শক্তির অধিকারী করে দেখেছিলেন। তিনি বৃহদাকার ছবি নির্মাণ করতেন। বেশ বড় বড় কাজেও তিনি স্বল্পস্থায়ী চিত্রাঙ্কন উপাদান ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো তাঁর ছবির ক্যানভাস উন্নতমানের নয়। তাঁর জন্য যে বড় বহরের ক্যানভাসের দরকার হতো সেটা ক্যানভাসে সম্ভব ছিল না বলেই তিনি চটও বেছে নিয়েছিলেন। সাপোর্টে তিনি নিজস্ব কায়দায় গ্রাউন্ড তৈরি করতেন। এ গ্রাউন্ড তৈরির কাজে তিনি গাবের আঠাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করতেন। এরপর

যে কাজটি আসে সেটা হলো ছবি অঙ্কন। মাঝে মাঝে তিনি নিজেই ছবির জন্য রং তৈরি করে নিতেন। এসব রং শেষ পর্যন্ত হয়তো স্থায়ী হয় না (ইসলাম, ১৯৯৫ : ৬১)। তিনি কাঠ কয়লা দিয়েই বড় সাপোর্টের উপর ড্রইং করে নিতেন। সুলতান বহুদিন ভেষজ আর দেশীয় রং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। গুঁড়া রঙের সঙ্গে কপার বার্নিশ, লিনসিড তেল মিশিয়ে রং তৈরি করার প্রক্রিয়াটি একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। তিনি পঁচিশ-তিরিশ ফুট দীর্ঘ এবং পাঁচ-সাত ফুট প্রস্থ-বিশিষ্ট বিশাল পটভূমিসহ ক্যানভাসে মানুষের জীবন্ত ছবি এঁকেছেন তেলরঙে (ইসলাম, ১৯৯৫ : ৫৭)। তিনি জলরঙে চমৎকার নিসর্গ-দৃশ্য রচনায় পারদর্শী, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯৮৭-র প্রদর্শনীতে। এছাড়া ১৯৮৭ সালেই জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত একক প্রদর্শনীতে প্যাস্টেল মাধ্যমে আঁকা চিত্রকর্ম তাঁর মাধ্যমগত বিচিত্রতা বহন করছে। মার্কার পেন ও পেন্সিলেও সুলতানের ড্রইং ছিল অনবদ্য (ইসলাম, ১৯৯৫ : ৫৭-৫৮)। নিসর্গ-২ (১৯৫১), প্রথম বৃক্ষরোপণ (১৯৭৫), গাঁতায় কৃষক (১৯৭৫), চর দখল (১৯৭৬), সচল সবাক ইতিহাস (১৯৭৬), হত্যোযজ্ঞ (১৯৭৬), নবান্ন (১৯৭৬), ধানভানা (১৯৮৬), গ্রামের দুপুর (১৯৮৭), জমি কর্ষণ (১৯৮৭), কৃষকের দাঙ্গা (১৯৮৭), মাছ-কাটা-২ (১৯৮৯), মাছ ধরা-৩ (১৯৯১), জমি কর্ষণে যাত্রা (১৯৯২), ধান কাটা (১৯৯২) ইত্যাদি তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী চিত্রকর্ম।

প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তারা যে বিষয়গুলো নিয়ে এসেছে সেখানে আমরা সমাজচিত্র, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবনধারা ইত্যাদি পাচ্ছি। সুতরাং ঐ সময়কালের সমাজচিত্র যদি কোনো পাবলিকেশন প্রকাশিত হয় সেখানে এই চিত্রগুলো ইলাস্ট্রেশন হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার খুবই উপযোগী। ডকুমেন্টারি হিসেবে এই চিত্রগুলোর অনেক মূল্য রয়েছে। এই ডকুমেন্টারি চিত্রগুলো বর্তমান শিল্পীদের পথপ্রদর্শক। বর্তমানে শিল্পীদের প্রতিবাদী ইচ্ছার যে প্রকাশ তা থেকে উপকরণ ও শিল্প স্বভাবের নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে বলা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে সমসাময়িককালে তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের উপকরণের বৈচিত্র্যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চিত্রকলার স্বভাবের উপকরণ ও করণকৌশলে দেখা দিয়েছে নতুনত্ব। বিশ্বশিল্প আঙ্গিকের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের চিত্রকলারও ক্রমরূপান্তর ঘটেছে। ক্রমবিকাশের এই ধারায়

বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পকলার প্রতিটি শাখার মধ্যে চিত্রকলার স্থান হয়ে উঠেছে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও বৈচিত্র্যময়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে আমাদের সমকালীন চিত্রকলা দ্রুতই নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তার পূর্বতন অবস্থার বদল ঘটিয়ে যুগোপযোগী ও আধুনিক রূপ লাভ করছে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূলমন্ত্র অথবা পথপ্রদর্শন করেছে প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা, যা বাংলাদেশের সমকালীন চিত্রকলার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

তথ্যসূত্র :

১. Jonathan Stephenson, The Materials and Techniques of Paintings, Thames and Hudson, 1993.

২. অশোক মিত্র, ছবি কাকে বলে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা : লি :, কলকতা, ২য় প্র : ১৯৮৮।

৩. ড. রফিকুল আলম, উপমহাদেশের শিল্পকলা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

৪. সরসীকুমার সরস্বতী, পাল যুগের চিত্রকলা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, ১৯৭৮।

৫. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা, আধুনা প্রকাশনা, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৬।

৬. কবির আহমেদ আকন্দ, মুসলিম শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।

৭. প্রদ্যোৎ গুহ, কোম্পানি আমলের বিদেশি চিত্রকর, কোলকাতা, ১৯৭৮।

৮. তোফায়েল আহমেদ, "পট ও পটুয়া," শিল্পকলা ষাণ্মাষিক বাংলা পত্রিকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, অষ্টাদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৯৯৮।

৯. অশোক ভট্টাচার্য, বাংলার চিত্রকলা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কোলকাতা, ৩য় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

১০. আহমদ রফিক, রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প, আনন্দ প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

১১. লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

১২. সৈয়দ আলী আহসান, শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় প্র: আগস্ট ১৯৮৩।

১৩. রফিক হোসেন, বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের ইতিহাস, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, আগস্ট ২০০৭।

১৪. সৈয়দ আজিজুল হক, কামরুল হাসান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৩।

১৫. ফরিদা জামান, আধুনিক চিত্রকলায় লোকশিল্পের প্রভাব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৮।

১৬. মইনুদ্দীন খালেদ, বাংলাদেশের চিত্রশিল্প, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০।

১৭. শাওন আকন্দ, 'এস. এম. সুলতান', লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

১৮. মাহমুদ আল জামান, কাজী আবদুল বাসেত, আর্ট অফ বাংলাদেশ সিরিজ ১২, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন ২০০৪।

১৯. মাসুদা খাতুন জুঁই, বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার প্রথম পর্যায় : একটি পর্যবেক্ষণ, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ : ৪৯, সংখ্যা : ২, ফাল্গুন ১৪১৮, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

২০. নজরুল ইসলাম, সুলতানের শিল্পকর্ম, এস এম সুলতান স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন ১৯৯৫।

২১. সৈয়দ আজিজুল হক, নিসর্গ ও মানবের গাথা : জয়নুল আবেদিনের চিত্রভুবন, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০০৪।

২২. নিসার হোসেন, জয়নুল আবেদিন, লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

২৩. সৈয়দ আজিজুল হক, কামরুল হাসান, লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

২৪. শোভন সোম, সফিউদ্দিন আহমেদ, লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

২৫. আহমদ ছফা, অভিনব উদ্ভাসন, এস এম সুলতান স্মারকগ্রন্থ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও সুবীর চৌধুরী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জুন ১৯৯৫।

হাতপাখার নকশা উপকরণ, করণকৌশল ও আঞ্চলিক ভিন্নতা

মোসাঃ তাসলিমা বেগম*

সারসংক্ষেপ : *হাতপাখা বাংলাদেশে আবহমানকাল থেকে সাধারণ মানুষের খুব প্রয়োজনীয় ও দৈনন্দিন ব্যবহৃত পণ্য। প্রাচীনকাল থেকে হাতপাখা তৈরি করছে গ্রামের সাধারণ মানুষ। কখনো কখনো এই হাতপাখা নকশা ও করণকৌশলের কারণে শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ফলে লোকশিল্পের সব গুণ ও শর্ত অনুসারে এই নকশি হাতপাখা একটি লোকশিল্প। এই লোকশিল্পের নকশা জ্যামিতিক, বিন্যাস বিমূর্ত শিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। হাতপাখা নকশা বিভিন্ন পোস্টার ডিজাইন বিশেষ করে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে তৈরি ব্যানার ফেস্টুনে ব্যবহৃত হয়। হাতপাখার নকশা, উপকরণ, করণকৌশলে রয়েছে অঞ্চলভেদে ভিন্নতা। এই প্রবন্ধে নকশি পাখার এই বিভিন্নতা, মটিফ, নকশা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া পাখার বিপণন, পাখা তৈরি ও নান্দনিকতা পাখা শিল্পীদের উন্নতিকরণের প্রস্তাবনা রয়েছে।*

কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষের নিজস্ব সৃজনশীল কর্মকৌশল ও ঐতিহ্য লোকশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঐ জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, পারস্পরিক যোগাযোগ, বস্তুকেন্দ্রিক সৃষ্টি ও তার প্রক্রিয়া লোকশিল্পের অংশ, লোকাচার সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে জন লিল্যান্ড (১৫০৩-৫২), উইলিয়াম ক্যামডেন (১৫৫১-১৬২৩), জন অবেরি (১৬২৬-৯৭) প্রমুখ ব্যক্তি একটি ধারা শুরু করেছিলেন। ষোল শতকের পরবর্তীসময়ে বিভিন্ন জাতি তাদের লোকাচার বিদ্যার করণকৌশল ও উপাদান নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কথা বলেছেন (তারিকুল আহসান, ২০২০ : ১২)। বাংলার এই অঞ্চলের লোকাচারকে যারা পরিচিত করেছেন তাদের মধ্যে গুরুসদয় দত্ত অন্যতম। তিনি বলেছেন, "চিত্রকলার ও বর্ণবিন্যাসের প্রতিষ্ঠা বাংলার পল্লির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারীর মধ্যে এখনো যে

*খণ্ডকালীন শিক্ষক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রকম ব্যাপকভাবে বর্তমান আছে, এবং শুধু ব্যাপকভাবে বর্তমান নয়, এই প্রতিষ্ঠা এত উচ্চস্তরের যে, এরকম বোধ হয় আজকাল এই পণ্যতন্ত্রের দিনে খুম কম দেশেই আছে।" আর লোক শিল্পকলা এমন এক ধরনের শিল্পকলা যা আনুষ্ঠানিক বা একাডেমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পকলা থেকে সব সময় আলাদা। সাবেকি কায়দায় সৃষ্ট কোনো শিল্পকর্ম বা অলংকরণ যা সৃষ্টি হয়েছে অনাগত কাল থেকে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে। এছাড়া জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি লগ্নের প্রয়োজনে এই শিল্পের জন্ম (রফিকুল আলম, ২০১৫ : ১৪৫)।

মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই নিজ হাতে দেবমূর্তি কাঠের বা পাথরের কিংবা মাটির, মৃৎপাত্র ও চিত্রিত মৃৎফলক, দেওয়াল চিত্র, আলপনা, পুতুল, মুখোশ, বয়নশিল্প ও অলংকারশিল্প ইত্যাদি তৈরি করেছে। এগুলো পৃথিবীর সর্বত্রই কম-বেশি লোকশিল্পীদের দ্বারা রূপায়িত হয়েছে। চরিত্র লক্ষণে এসব শিল্পের মধ্যে একটি বিশ্বস্ত সামঞ্জস্য দেখা গেলেও নিতান্ত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থেকে গেছে। লোকশিল্প গড়ে উঠে উন্নত কৃষিজীবী মানুষের মাঝে। এরা লাঙলের সাহায্যে জমি চাষ করে ফসল ফলায় শহরের মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহ করে। এই কৃষিজীবী শ্রেণি তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে তৈরি করে বিলাসী শিল্পদ্রব্য যা লোকশিল্পের উপায়। এসব বিলাসী পণ্য নিজেদের জন্য তৈরি করলেও তা শিল্পমানসম্পন্ন হয়ে শহরেও পৌঁছে যায়।

Folk Art-এর বাংলা প্রতিশব্দ "লোক শিল্প"। লোকশিল্পের নৃতাত্ত্বিক দর্শন হলো প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে সৌন্দর্য বোধের অনুভূতির, যার রূপায়ণ বস্তু সংস্কৃতিতে। তাই বলা যায়, আবহমান বাংলার লোকসমাজের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস, লৌকিক আচার-আচরণ এবং উৎসবকে কেন্দ্র করে যে চারু-কারুশিল্প সৃষ্টি হয়েছে তাই লোকশিল্প (গোলাম সামাদ, ২০০৬ : ১৬৯)।

লোকশিল্পীরা নিজেদের শিল্পী হিসেবে দাবি করে না। এরা কাজ শিখে বংশপরম্পরায়। এ শিল্পকলা বিশেষভাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট লোকশিল্পী বা কারিগররা সবকিছুর রূপকেই সরল করে তুলেন। গ্রামকেন্দ্রিক বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কৃষি, কারুশিল্প, লোকাচার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় রূপান্তর এবং ক্রমবিকশিত হয়ে চলেছে।

বর্তমান বাংলাদেশের এ অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কখনো তীব্রশীত আবার কখনো প্রচণ্ড তাপদাহ কিংবা বৈরী ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজমান। গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম অনুভূত হওয়ায় মানুষ স্বস্তির বাতাস পাওয়ার উপায় উপকরণ খুঁজে ফেরে। যান্ত্রিক তথা বৈদ্যুতিক সুবিধা যখন ছিল না মানুষ গরমের তাপদাহ ও শীত নিবারণের জন্য ছাতা, কাঁথা ও হাতপাখার ব্যবহার শুরু করেছিল। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে গরমের আরাম খুঁজতে নানারকম কৌশল উদ্ভাবিত হলেও বাংলার লোকশিল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ হাতপাখার আবেদন হারিয়ে যায়নি। এখনো এর ব্যবহার বিপণন হচ্ছে গ্রামে-গঞ্জে।

ঠিক কোনো সময়ে হাতপাখার প্রচলন হয়েছিল তা জানা না গেলেও মানুষ নিজের প্রয়োজনে খুব প্রাচীন কালেই এর ব্যবহার করত। যান্ত্রিক পাখা ১৮৬০ সালে আমেরিকায় শুরু হওয়ার আগে হাতপাখার উপরই নির্ভরশীল ছিল মানুষ। অতি গরমে বাতাসকে চলমান করে গরম হাওয়া সরিয়ে অপেক্ষাকৃত শীতল হাওয়ার প্রবাহের জন্য হাতপাখার ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীকালে রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় এই পাখা একটি আলংকারিক শিল্পে রূপলাভ করেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে প্রথমে এক হাতে সঞ্চালন করে বাতাস করা হতো, তারপর একটি বড় পাতার ব্যবহার হতো এবং পর্যায়ক্রমে ব্যবহার উপযোগিতার সাথে শোভাবর্ধন করতে পাখায় নকশা ও অলংকরণ যুক্ত হয়।

সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত নানাভাবে পাখার ব্যবহার চলছে। উষ্ণ আবহাওয়ায় সর্বজনীনভাবে পাখা ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তবে আজও ধর্মীয় ও রাজকীয় অনুষ্ঠানাদিতে অলংকৃত হাতপাখার ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। পাখার উদ্ভাবন সম্পর্কে নিউজার্সির "ওয়েল ফ্লিটবুক" (ISBN-155521-546-7) প্রকাশনার ১৯৯০ সালে "এ কালেকটর'স গাইড টুফেন"-এর আর্টিকেল দা অরজিন অফ দা ফ্যান" এ উল্লেখ আছে (FANS ARE AS OLD AS HOT WEATHER IT IS IMPOSSIBLE TO PIN POINT WHERE AND WHEN THE FAN ORIGINATED. IN HOT CLIMATING IT MUST ALWAYS HAVE BEEN INVALUABLE-IN CREATING A BREEZE AND KEEPING FILES AWAY. AFTER ALL THE EARLIEST KNOWN MAN COMES FROM NEAR THE EQUATOR. LETER IT BECAME A WORK OF ART AND WAS USED IN RELIGIOUS AND ROYAL CEREMONIES. LATER STILL IT BECOMES THE DECORATIVE ACCESSORY THAT WE KNOW TO DAY.) হাতপাখার প্রাচীনত্ব এবং

এর সংজ্ঞা সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার ভলিয়ুম-৪-এ উল্লেখ রয়েছে যে, FAN: HAND BHELD COOLIN DEVICE FOR PRODUCTINFG A CURRENT OF AIR THAT HAS BEEN USED THROUGHOUT THE WORLD SICNE ANCIENT TIME" এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকায় পাখার দুটি বিভাগ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। "এর মধ্যে প্রথমটি বাংলাদেশের হাত পাখার মতো ফ্ল্যাট সারফেসের উপর নকশাকৃত এবং লম্বা হাতল যুক্ত চারদিক মাউন্ড করা। অন্যটি ফোল্ডিং পাখা অনেকগুলো শলা কিংবা কাঠিতে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। সুতা, তার, কিংবা আঠার সাহায্যে একটি অন্যটির সঙ্গে সংযুক্ত দিয়ে আটকানো হয়, এই ধরনের পাখা তৈরির ক্ষেত্রে চীন ও জাপান উৎকর্ষতা দেখিয়ে আসছে।" (রবীন্দ্র গোপ, ২০১৪ : ২৩১, ২৩২)

যদিও নকশি পাখায় ব্যবহৃত মোটিফ নকশিকাঁথা বা আলপনার মতোই উন্নত ও নকশা-নির্ভর। তবু সৃজনশীলতায় ও নান্দনিকতায় তা বিশেষ মর্যাদা পেতে পারে। পাখা নিয়ে চমৎকার ছড়া প্রচলিত আছে, বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত দুটি ছড়া উদ্ধৃত করা হলো–তালগাছ জন্ম তোমার/নামটি তোমার পাখা/শীতকালে শত্রু তুমি/গ্রীষ্মকালে সখা'। আরেকটি ছড়ায় বলা হচ্ছে–'শীতে তুমি লুকিয়ে থাকো/ গরমে দাও দেখা/আদর করে নাম রেখেছি/তাই তো তোমায় পাখা'। (শাওন আকন্দ, ২০১৩ : ১৪৭)

বাংলাদেশের হাতপাখা সম্পর্কে জনাব তোফায়েল আহম্মদ বাংলা একাডেমির ভাষা শহীদ গ্রন্থমালার লোকশিল্প গ্রন্থে নকশি পাখা তথা হাতপাখা সম্পর্কে বলেছেন যে, "উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত এদেশে খর বৈশাখের দাবদাহে এবং ভাদ্রের আর্দ্রতা মিশ্রিত গরমে হাত পাখা মানুষের নিত্য সাথী। মেয়েদের হাতে তৈরি পাখার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। কবি বিষ্ণু পালের "বেহুলা লখীন্দর" পালায় বেহুলা মরা স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার পর ডোমনী নারীর ছদ্মবেশে পাখা বেচতে চাঁদ সওদাগরের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছিলেন বলে কথিত আছে। এইসব পাখার নানান নকশার বেহুলা লখিন্দর আর মনসার ছবি চিত্রিত থাকত। এছাড়া প্রাচীন লোকগাথাও চিত্রিত পাখা নিয়ে বহু উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সে কালের মেয়েরা ছেঁড়া ন্যাকড়া, বাঁশের কঞ্চি, কাশফুলের ডাঁটা চিরে চিরে নানা ধরনের পাখা তৈরি করতেন। বীরভূমের গোবিন্দপুর গ্রামের এক বৃদ্ধার মুখে শোনা যায়–অল্প বয়সে এঁরা নানা ধরনের পাখা তৈরি করতেন। আর নামকরণ করা হতো মজার মজার যেমন

গঙ্গাগোবিন্দ পাখা, মনমোহিনী পাখা ইত্যাদি। সেকালে একটি মেয়ে অন্য একটি মেয়েকে মনমিষ্টি নামের পাখা তৈরির কৌশল শিখিয়ে মনমিষ্টি সই পাতাত। ছেঁড়া শাড়ির পাড়, ছেঁড়া সুতো দিয়ে পাখার গায়ে কত নকশা আঁকা হতো তার হিসাব নেই (দুলাল চৌধুরী, পল্লব সেন গুপ্ত, ২০১৩ : ৩৯৫)। পাখা তৈরি করতে আলাদা পাখার ভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন হয়। অঞ্চলভেদে পাখার উপকরণে বিভিন্নতা দেখা যায় হাতপাখা কোথাও বিছুইন ও পাংখা নামেও বিভিন্ন স্থানে পরিচিত। নকশি পাখার আকার সাধারণত গোলাকার আকৃতির হলেও অর্ধবৃত্তাকার, ভাঁজ করা বা ফোল্ডিং, চৌকোনাকার পানপাতাসহ, নানা রকমের হয়ে থাকে। জ্যামিতিক, ফুল, লতাপাতাসহ বিচিত্র নকশা পাখায় ফুটিয়ে তুলেন নারীরা।

গ্রামের সাধারণ মানুষ হাতের কাছে পাওয়া সহজ এমন উপকরণ দিয়ে শিল্পবস্তু তৈরি করে চলেছেন বংশপরম্পরায়। এ নিত্য ব্যবহার্য বস্তুটি বিশেষ করে মেয়েদের হাতে পরে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সুতা, সুতি কাপড়, বাঁশ, চুলের ফিতা, বেত, খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, তালপাতা, সন, কলার শুকনো খোল, পাখির পালক, সুপারির খোল, শোলতা, কাঁশ, বিন্না ও গমের ডাঁটা চন্দন কাঠ মোটা কাগজ প্রভৃতি পাখার উপাদান। নকশা অনুসারে নকশি পাখার নাম পালংপোষ, সুজনে ফুল, বলদের চোখ, শঙ্খলতা, কাঞ্চন মালা, ছিটাফুল, তারাফুল, মনবিলাসী, মনবাহার, ময়ূরপঙ্খী বাগবন্দি, ষোলকড়ির ঘর, মন সুন্দরী লেখা, সাগর দিঘি, হাতি, ফুল ও মানুষ (ওয়াকিল আহমেদ, ১৯৭৪ : ৫২)। সুতা বাঁশ সরতা বেত ও কলার খোলের শুকনো বেতি দিয়ে পাখা বোনা হয় পাটি বা মেদ বোনার কায়দায়। কিউবিজমের কায়দায় জ্যামিতিক নকশায় বিভিন্ন মোটিফের রূপদান করা হয়। মোটিফ বা ডিজাইনের বিভিন্ন নামও রয়েছে। এর মধ্যে পান গুছি, তারাজো, কেচিকাটা, পুকুইরাজো, ধানছড়ি, ফলং ঠেইঙ্গা বা ফড়িং-এর ঠেং, রাবন কোডা, নবকোডা, চা বাগানের বেড়া, কবুতর কোপ, মাকড়ের জাল, পদ্মাজো, ধাইড়া জো, কামরাঙ্গাজো, পাবনাইয়া জো, জিঞ্জিরা জো, নারায়ণগঞ্জ জো, সুজনীজো, চারতা ফুল, শঙ্খলতা ইত্যাদি (ওয়াকিল আহমেদ, ২০০৭ : ১৮২, ৮৩)।

তালপাতার নকশি পাখা :

তালপাতার পাখা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাত করে একটি পরিপূর্ণ পাখা তৈরি করা হয়। তালপাতার পাখা চট্টগ্রাম ও বরিশাল অঞ্চলে বেশি চোখে পড়ে। তালপাতা সংগ্রহ করে দা দিয়ে কেটে ডাঁটা থেকে পাতা ছাড়ানো হয় ফিতার আকৃতিতে। এখানে শিল্পীর কর্মদক্ষতার প্রয়োজন (ওয়াকিল আহমেদ, ২০১৭ : ১২৮)। পাতার ডাঁটা বা কাণ্ডের মধ্যে থাকে অসংখ্য আঁশ। ডাঁটাটিকে দু-একদিন ভিজিয়ে রাখলেই সুতার মতো লম্বা আঁশ বের হয়। এ আঁশটি পাখার চারদিকে বাধার কাজে লাগে। ডাঁটা থেকে পাতার বেতি বের করে সমান দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আটি বেঁধে তা শুকিয়ে রং করতে হয়। ১টি পাতা থেকে প্রকারভেদে প্রায় ৪/৫টি পাখা তৈরি হয়। তালপাতার পাখার নকশায় লাল, নীল, সবুজ, হলুদ এবং পাতার স্বাভাবিক রং করা হয়। প্রাচীনকালে ভেষজ রং ব্যবহার হলেও বর্তমানে বাজারে পাওয়া কৃত্রিম পাওয়ার রং মিশিয়ে সিদ্ধ করে বেতি রং করা হয়। ফ্রেমের ফাঁকে রঙের ভিন্নতার জন্য কন্ট্রাস্ট রঙের বেতি ঢুকিয়ে বুনতে হয়। শলার পিছনের ফাঁকে বেতি আটকিয়ে সুইয়ের সেলাইয়ের মতো বেতি ঢোকানো হয়। নকশার প্রকারভেদে বেতিকে চারদিক থেকে বিভিন্ন রং এ ছকে স্থাপন করা হয়। সম্পূর্ণ বোনা হয়ে যাওয়ার পর চারদিকে শিরদাঁড়াসহ তালপাতা দিয়ে মুড়ে ডাঁটার আঁশ দিয়ে সেলাই করা হয়। প্রাথমিক ছক থেকে বুননের শেষ পর্যন্ত বৈচিত্র্যময় নকশা মোটিফ তৈরি হয়। মোটিফের মধ্যে মৌচাক মোটিফটির স্থানীয় নাম তারাফুল। আরও আছে শাপলা ফুল, বুটি ফুল, হাজার বুটি, এক ডেইল্লা, দুই ডেইল্লা, পাঁচ ডেইল্লা এছাড়া নাম না জানা হাজার রকমের জ্যামিতিক ফর্ম (রবীন্দ্র গোপ, ২০১৪ : ২৩৫)। আবার আস্ত পাতাকে বৃত্তাকারে কেটে চারপাশে বাঁশের চিকন শলাকা দিয়ে বাঁধাই অথবা কাপড় দিয়ে মুড়ে চারপাশে সেলাই করে তালপাতার পাখা বানানোর প্রচলন আছে। এভাবে তৈরি তালপাতার পাখায় শ্রম কম ও আলাদা হাতল লাগানোর প্রয়োজন হয় না। পাতার ডাঁটায় হাতল হিসেবে কাজ করে।

(চিত্র-১ : তালপাতার ফোল্ডিং পাখা)

বাঁশের নকশি পাখা :

বাঁশের বেতি দ্বারা তৈরি নকশাযুক্ত পাখা নোয়াখালীর হাতিয়ায় এ পাখার প্রচলন রয়েছে। বাঁশের সরু চিকন বেতি আড়া ও খাড়াভাবে বসিয়ে এ পাখা তৈরি করা হয়। গাছের বেতি একটু পাতলা ও সরু হয়ে থাকে। ডালা, চালুন, ডোলায় যেরকম বেতি ব্যবহার হয় সেরকম বেতিই পাখা তৈরিতেও ব্যবহার করা হয়। সবুজ, নীল, মিনা, লাল, বেগুনি নানা রকম রং করে বেতি চৌকোনা খোপ ছোট থেকে ক্রমশ বড় আকারে সূক্ষ্ম ডিজাইন করা হয়। জ্যামিতিক নকশা ছাড়াও কলমিফুল, গাছে হাতি ও ফুল, সূর্যমুখী, নানারকম বৃত্ত ও ফুলের নকশা আবার কবিতা বা শ্লোক ও নকশা করা হয়।

চিত্র-২ : বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি পাখা, প্রাপ্তিস্থান : হাতিয়া, নোয়াখালী।

কাপড়ের পাখা :

নকশি সুতার ও কাপড়ের পাখা চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, টাঙ্গাইল অঞ্চলে বোনা হয় বেশি, পাখার মোটিফের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও শিল্পীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, কাপড়ের পাখার নকশা শৈলীতে স্বাভাবিক সৃষ্টিশীলতা রয়েছে। সুতা দিয়ে ফুল তোলার পূর্বে আউট লাইন ড্রইং করে নিয়ে ফর্ম তৈরি করার জন্য কারুশিল্পী নিজেই কাজ করেন। এই পাখায় ফুল তোলার পূর্বে গোলাকৃতি ফ্রেম করে কাপড় মুড়ে নেয়া হয়। ফুল তোলার পরে চারদিকে লালশালুর ঝালর দিয়ে আর্কষণীয় করা হয়। কিছুটা রাজকীয় করার জন্য সুশোভিত হাতল বানানো হয়। হাতলের উপরে পেছন দিক ধনুকাকৃতি করা হয় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য।

সুতার নকশি পাখা :

সবচেয়ে বেশি শিল্পগুণসমৃদ্ধ নকশিপাখা সুতা দিয়ে বোনা গোলাকার পাখা। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলে সুতার নকশি পাখা বেশি দেখা যায়। নানা ডিজাইন বিচিত্র রঙের সুতার পাখার জ্যামিতিক নকশা দিয়ে নানারকমের মটিফ ফুটিয়ে তুলা হয়। বাংলা অক্ষরে শ্লোক লেখা থাকে আবার কবিতার লাইন উৎকীর্ণও করা হয় এসব পাখায়। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ফুল, লতা-পাতা, পাখি, হাতি ইত্যাদির ডিজাইন বেশি করা হয়। সেই সাথে পাখার পরিধির সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় রংবেরঙের ঝালর, সেলাই করে নকশা তোলা ছাড়াও বিভিন্ন রঙের সুতার সমন্বয়ে টানা দিয়ে চক্র পদ্ম, বিভিন্ন চৌক বা বিচিত্র ধরনের ডিজাইন করা হয়। ডিজাইনগুলো জ্যামিতিক ফর্মে ফুটিয়ে তোলা হয়। ডিজাইনে ভেদে নামে ভিন্নতা রয়েছে, যেমন–নবকোডা, শঙ্খলতা, শতফল, নিশান কাটা, সিঙ্গারা, হাঁটুভাঙ্গা 'দ' প্রভৃতি। কাপড়ের উপর উল ও সুতা দিয়ে সেলাই করেও সুদৃশ্য পাখা তৈরি হয়। পাখাকে আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে রেশম সুতা, জরির সুতা, ইত্যাদি ও ব্যবহৃত হয় কখনো কখনো। পাখার মাঝে মাঝে বসানো হয় গোল গোল ছোট বুটি।

(চিত্র-৩ : সুতার নকশি পাখা, প্রাপ্তিস্থান : ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

ময়ূরের পাখনা দিয়েও নকশিপাখা তৈরি করা হয়। প্রাচীন কালে রাজা-বাদশারা এই পাখা ব্যবহার করতেন। ময়ূরের পালক দিয়ে তখন বৃহদাকার পাখা তৈরি করে বাতাস করা হতো। এখন ছোট আকারে ময়ূরের পালক দিয়ে শৌখিন নকশি পাখা তৈরি করা হয়। সিলেটে রুপার সুতা ও হাতির দাঁতের টুকরো দিয়ে অনবদ্য নকশি পাখা উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে দেখা গেছে জানা যায় (শাওন আকন্দ, ২০১৩ : ১৪৭)। চুলের ফিতা দিয়েও তৈরি করা হয় নকশি পাখা পুরোনো কিংবা নতুন ফিতা দুই-তিন ভাঁজ করে পাখায় মোটিফ তোলা হয় এর আঞ্চলিক নাম 'পুকুরিয়া জো'। দুই মাত্রার নকশা করা যায় এ পাখায়। প্রথম পর্যায় বিভিন্ন রঙের ফিতা দিয়ে চাটাইয়ের মতো বুনন প্রক্রিয়ায় নকশা করা হয়। ২য় পর্যায়ে একে জমিনরূপে ধরে তার উপর রঙিন ফিতা দিয়ে খোপ খোপ আকারে বোনা হয়। সুপারি গাছের আঁশ ও খোল থেকেও নকশি পাখা তৈরি হয়। এক্ষেত্রে গাছ কেটে ভিজিয়ে রেখে আঁশ বের করে নেওয়া হয়। পরে সুত ও আঁশ রং করে গোলাকার পাখা তৈরি করা হয়।

বেতের নকশি পাখা :

বরিশালে বেত দিয়ে বিশেষ চারকোনাকার পাখা বোনা হয় যা অন্যান্য অঞ্চলের পাখা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যময়। স্বরূপকাঠি জেলায় এই পাখার বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। পাখার উপকরণ বিচিত্র নকশা ও রং দেখেই আলাদা করে বুঝা যাবে যে এটি বরিশালের স্বরূপকাঠি অঞ্চলের পাখা।

এই পাখা তৈরির প্রধান উপকরণ মুর্তা নামক এক প্রকার গুল্মজাতীয় নল উদ্ভিদ। শীতলপাটির বেতও এই নল থেকে বেত তৈরি করে বোনা হয়। বরিশাল অঞ্চলের মানুষ এই গুল্মজাতীয় নলকে পাইত্রা বলে। পাইত্রার গাছ কেটে উপরের আবরণ সবুজ অংশ চেঁছে ফেলে দিতে হয়। তারপর পানিতে ভিজিয়ে রেখে ছাল আলাদা করে তা থেকে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বেতি বা বাতা বের করতে হয়। বেতি বের করে সিদ্ধ করে অথবা না সিদ্ধ করেও শুকানো হয়, পরে বেতি পানি দিয়ে ভিজিয়ে সারা বছর বুননের মাধ্যমে নকশি পাখা তৈরি করা হয়।

সাধারণত চৈত্র, বৈশাখ মাসে বেত গাছ কেটে উপরোক্ত পদ্ধতিতে বেত প্রস্তুত করা হয। নারীরা বর্ষাকালে ঘরে বসে পাখা বোনার কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। এই বেত দিয়ে শুধু পাখাই তৈরি করেন না তারা পাটি, চালুন, ডালা প্রভৃতিও বানিয়ে থাকেন।

বেত শুকানোর পর রং করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পূর্বে ভেষজ রং ব্যবহার হলেও বর্তমানে প্লাস্টিক পেইন্ট ব্যবহার করে পাখাশিল্পীরা। প্রথমে তিনটি বা পাঁচটি বেত নিয়ে আড়াআড়িভাবে নিয়ে কেন্দ্র থেকে বোনা শুরু হয়। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে চারদিকে বুনে আট থেকে বারো বা ষোলো ইঞ্চি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য, ছয় থেকে বারো ইঞ্চি পর্যন্ত প্রস্থ হয়ে থাকে। তারপর দৈর্ঘ্যের দিকে বাঁশের হাতলযুক্ত করে শক্তভাবে প্লাস্টিক বেত বা সুতা দিয়ে বাঁধা হয়। রং অনুসারে বেতগুলোকে সাজিয়ে জ্যামিতিক বা বিভিন্ন মৌটিফের নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। লাল, নীল, কাল, সবুজ, হলুদ সবধরনের রঙের ব্যবহার হয়ে থাকে এই পাখায়। কখনো ঢেউয়ের ফর্ম আবার বকুল ফুল, চালতা ফুল, কাকইর ফুল, চতুর্ভুজের রিপিটেশন কিংবা সিঁড়ির মতো জ্যামিতিক ফর্ম লক্ষণীয়। এই পাখার বিশেষ দিকটি হচ্ছে এর একটি পাশে নকশা অপর পাশটি উল্টো দিক, যদিও নকশা দেখা যায় উভয় দিকেই কাপড়ের মতো উল্টো দিকও রয়েছে এ পাখায়। চারদিকে কোনো আলাদা কাপড়ের বর্ডার না থাকলেও বোনার ধরনে তা মিলিয়ে বোনা হয় ফলে চারধার সুন্দরভাবে মিলিয়ে সমান হয়ে কোনা তৈরি হয়। বৃত্তাকার করতে চাইলে চারকোনা পাখা কেটে গোলকার করে কাপড় দিয়ে সেলাই করা যায় তবে এর প্রচলন খুব কম।

(চিত্র-৪ : পাইত্রা বেতের পাখা, প্রাপ্তিস্থান : মাহমুদকাঠি, নেছারাবাদ, স্বরূপকাঠি, বরিশাল।)

ব্যবহারিক প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের সঙ্গে সমন্বয় করে যুগ যুগ ধরে বরিশালের হাতপাখার কারুশিল্পীরা পাখা তৈরি করছেন। সাধারণত নারীরা বংশপরম্পরায় এই পাখা বুনছেন এবং পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহ করছেন। অনেকের সংসার চলে পাখা তৈরি করে।

নকশি হাতপাখার বাণিজ্যিক দিক ও সম্ভাবনা : বৈদ্যুতিক পাখার প্রচলনের কারণে হাতপাখার প্রয়োজনীয়তা অনেকটা কমে গিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে বর্তমানে গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। তবে হাতপাখার ব্যবহার একবারে শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের দেশে আবহাওয়ার প্রয়োজনেই হাতপাখার ব্যবহার বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু লোকশিল্প ও কারুশিল্পীদের জীবনমান খুব ভালো নয় তারা সামান্যই আয় করে থাকেন এই শিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার কারণে।

নকশিপাখা সেলাইয়ের শিল্পী গ্রামের মেয়েরা। গ্রামের মেয়েদের তৈরি বস্তু, জিনিস নকশিপাখা প্রয়োজনের এক শিল্প। অন্যান্য কারুশিল্পের মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নকশিপাখার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিল না। কারণ নকশিপাখা ব্যবসায়ীক কেনাবেচায় প্রাচীনকাল থেকে এমনকি ৭০-এর দশক পর্যন্ত প্রবেশ করেনি। অন্তঃপুরের নারী তার কাজের অবসরে বিশেষ করে বর্ষাকালে একান্তই নিজ সংসারে শিশু, প্রিয়জনের বা

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য নকশিপাখা তৈরি করত। ফলে গ্রামীণ লোকজীবনে, লোকমেলায়, হাটে, বাজারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে নকশিপাখা কখনো কেনাবেচা হয়নি। কেবল পরিবারের প্রয়োজনেই নারীরা নকশিপাখা তৈরি করেছে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে নারী পরিবারের সদস্যদের জন্য পাখা তৈরি করলেও প্রতিটি পাখা কিন্তু নকশিপাখায় পরিণত করেনি। অতি আপন মর্যাদায়, ভালোবাসার, স্নেহের জনকে নারী হৃদয়ের সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিকে উজার করে দেয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে নকশিপাখাকে বেছে নিয়েছিল। এজন্যই নকশিপাখায় কখনো কখনো শিল্পী যাকে নকশিপাখা উপহার দেন তার নাম রঙিন সুতায় লেখেন। এছাড়া নকশিপাখা ভালোবাসার, মর্যাদার, স্নেহের উপহারের বস্তু হিসেবে বাংলার সমাজে প্রতিষ্ঠিত। নকশিপাখা বাংলাদেশের অন্যান্য কারুশিল্পের মতো কুটিরশিল্প পর্যায়েও কখনো বিস্তার লাভ করেনি। নকশিপাখা বাংলার নারীর শিল্পবোধ ও চেতনার ফসল। বোধকরি একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে নকশিপাখা আমাদের লোকসমাজের নারীদের অনবদ্য শিল্প সৃষ্টি, প্রতিটি নকশিপাখা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের, শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতির ও চেতনার।

নকশিপাখায় লোকজীবন ধারার বৈশিষ্ট্য সাংস্কৃতিক উপাদান-নারীর সৌন্দর্য অনুভূতি ও শিল্পবোধই অধিক ক্রিয়াশীল। ফলে নকশিপাখা ব্যবসায়ীক পণ্য হিসেবে বাংলার লোকসমাজে কখনো চিহ্নিত হয়নি। নকশিপাখা ছিল একান্তই অন্তঃপুরের, নকশিপাখা তৈরির উপকরণের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের প্রচলিত কৌশল এই লোক-কারুশিল্পটিকে ব্যবসায়ীক থেকে দূরে রেখেছিল। ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাও কমে গেছে, ফলে শিল্পীদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বংশপরম্পরায় গড়ে উঠা এই কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হারিয়ে যাচ্ছে. নকশিপাখার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার। শিল্পীদের টিকিয়ে রাখার জন্য নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

বরিশালের স্বরূপকাঠির নেছারাবাদ থানার মাহামুদকাঠি অঞ্চলের আছিয়া বেগম বয়স ষাটোর্ধ্ব তিনি জানান তারা পারিবারিকভাবে হাতপাখা বানাচ্ছেন ছোটবেলা থেকেই। পাখা তৈরির মাধ্যমে তার সংসার চলে, আয় হয় খুব সামান্যই, তার দু সন্তান আছে, স্বামী নেই। তার কাছ থেকেই তার মেয়ে মুর্শিদা ও পাখা বানানোর পেশায় নিয়োজিত আছেন। একটি পাখা নকশা বেঁধে ৩০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করে থাকেন। এসব পাখা গ্রামের হাটে বিক্রি করা হয় আবার বাড়ি থেকেও খুচরাভাবে

আশপাশের ক্রেতা সাধারণ নিয়ে থাকেন। এই নকশিপাখার নকশা ও স্থায়িত্ব ধরে রাখার জন্য শিল্পীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পাইকারিভাবে বাজারজাত করা হলে শিল্পীরা যেমন–স্বাবলম্বী হবে পাখার গুনগত মান ও বৃদ্ধি পাবে। নকশিপাখার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগে গ্রহণ করা যেতে পারে :

১। পাখা বুননের ক্ষেত্রে যারা বেশি কর্মদক্ষ তাদেরকে বিভিন্ন ফাউন্ডেশন ও সংস্থার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে গ্রামের নারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ফলে পুরোনো লোকশিল্পী ও নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান অথবা আয়ের উৎস তৈরি হবে এবং তারা স্বাবলম্বী হবে।

২। বিভাগীয় শহর ও রাজধানীতে তাদের পণ্য সরবরাহের বাজার জাত ও বিপণনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা প্রয়োজন।

৩। লোকশিল্পীরা যেন তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান সেজন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে পাশাপাশি সরাসরি পাখাশিল্পীদের পাখা শহরে যেন নিজেরা বিক্রি করতে পারেন এ উদ্দেশ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনে তাদের যোগাযোগ সহজতর করা যেতে পারে।

৪। হাতপাখা একটি প্রাচীন ঐতিহ্য, একটি সাংস্কৃতিক সম্পদ, এই পাখা তৈরির কাজটি যে একটি সম্মানজনক পেশা এ বিষয়ে পাখা তৈরি শিল্পীদেরকে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ধারণা দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত থেকে পাখা তৈরির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনকে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ ঐতিহ্য সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ফাউন্ডেশন করছে।

৫। শিল্পীরা প্লাস্টিক পেইন্ট ব্যবহার করে থাকেন অথচ এক সময় প্রাকৃতিক ভেষজ রং ব্যবহার করত শিল্পীরা যার গুণগত মান অপরিসীম। শিল্পীদের সচেতন করে পূর্বের রং প্রয়োগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

লোক ও কারুশিল্পের বিশেষজ্ঞ ও অনুরাগীরা প্রায়শই এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে থাকেন এবং ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প আজ লুপ্তপ্রায় বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু শতাব্দীর পরিক্রমায় পুরুষানুক্রমে শুধু মৌখিকভাবে হস্তান্তরিত

যে দক্ষ ও নিপুণ সৃষ্টি কৌশলের মাধ্যমে এবং জাতীয় ও স্থানীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট গৌরবময় ঐতিহ্য আজও দেশে যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে সকল মহলের এখন থেকেই কাজ করে যেতে হবে।

শহরে বিলাস শিল্পের মোহ ছেড়ে বাংলার পল্লির বিশেষ করে নারীদের শিল্পকলা কৌশলের বিকাশ এক সময় ছিল যা এখন কমে যাচ্ছে তা পুনরায় ফিরিয়ে আনা দরকার। বাংলার গ্রামের এই সহজ সরল, প্রাণবান ও শক্তিশালী পাখাশিল্প আমাদের আধুনিক নাগরিক শিল্পের বিলাসিতা ও চাকচিক্যময় প্রণালির থেকে অনেক উন্নতমানের এবং বিশুদ্ধ লোকশিল্প। ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রেখেই আমরা পাখাশিল্পের সংরক্ষণ উন্নয়ন ও বিপণন করতে পারি। এ ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই। যার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ বিশেষ করে লোকশিল্প গবেষক ও লোকশিল্পের সংগ্রাহক ও ফাউন্ডেশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। বাংলার লোকশিল্প যুগে যুগে সব সময় সব শিল্পের অফুরন্ত আধার ও উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতের শিল্পীদেরও এই উৎসের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।

পাখাশিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য শিল্পীদের সহায়তায় গঠিত একটি বিশেষ সেল গঠন অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে বর্তমান করোনা মহামারি ও তার পরবর্তী সময়ে কীভাবে হাতপাখা শিল্পীদের প্রণোদনা প্রদান করা যায় ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের পেশায় টিকিয়ে রাখার সর্বাত্মক সহায়তার নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে; তবেই হাতপাখা শিল্প টিকে থাকবে।

তথ্যসূত্র :

১। সম্পাদক : লালারুখ সেলিম, চারু ও কারুকলা,
প্রকাশক : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

২। সম্পাদক : ওয়াকিল আহমদ, ফোকলোর, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

৩। ওয়াকিল আহমদ, বাংলার চারু ও কারুকলা লোকশিল্প, গতিধারা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

৪। রফিকুল আলম, উপমহাদেশের শিল্পকলা, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

৫। মোস্তফা তারিকুল আহসান, বাংলাদেশের ফোকলোর তত্ত্ব ও অধ্যয়ন, ঘরোয়া বুক কর্নার, ফেব্রুয়ারি ২০২০।

৬। শাওন আকন্দ, বাংলাদেশের লোকশিল্পের রূপরেখা, জার্নিম্যান-জলরং যৌথ প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

৭। এবনে গোলাম সামাদ, মানুষ ও তার শিল্পকলা, ম্যাগনাম ওপাস, জুন ২০০৬।

৮। সম্পাদক : রবীন্দ্র গোপ, বাংলাদেশের কারুশিল্পী ও শিল্পকর্ম, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, জুন ২০১৪।

৯। সম্পাদক : দুলাল চৌধুরী, পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ পুস্তক বিপণি, ২০১৩।

১০। ওয়াকিল আহমেদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, অক্টোবর ১৯৭৪।

১১। সাক্ষাৎকার : বরিশাল অঞ্চলের নারী পাখাশিল্পী।

বাংলাদেশের শোলাশিল্প : নকশা ও ঐতিহ্য সন্ধান

জাকিয়া আহমেদ ঝুমা*

সারসংক্ষেপ : *বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় লোকশিল্পের ভান্ডারে অন্যতম একটি উপাদান শোলাশিল্প। শোলা এক প্রকার উদ্ভিদ-যা থেকে শিল্পকর্ম প্রস্তুত করা হয়। আর্থসামাজিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এক সময় এই শিল্পের ব্যবহার অধিক ছিল, কিন্তু বর্তমানে উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা, বিদেশি পণ্যের বাজার দখল এবং সাধারণ্যে পরিচিতির অভাবে এর ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে শোলাশিল্পকে সংরক্ষণ ও সুরক্ষার তাগিদ অনুভব করা যায়। এই লক্ষ্যে উপকরণ, ব্যবহারিক ক্ষেত্র, করণকৌশল, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা ইত্যাদি অনুধাবনের প্রয়োজন। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই নিবন্ধে শোলাশিল্পের ঐতিহ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ঐতিহ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে শোলাশিল্পের বিভিন্ন দিক যেমন–লোকশিল্প হিসেবে শোলাশিল্প, কারুশিল্প হিসেবে শোলাশিল্প, শোলাশিল্পের ধর্মীয় গুরুত্ব, খেলনা হিসেবে শোলাশিল্প ইত্যাদি বিষয়সমূহ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।*

১. ভূমিকা

সভ্যতা বিকাশের পূর্বে মানুষ যখন গুহায় বসবাস করত তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা ধরনের শিল্পচর্চা করে আসছে। সভ্যতার উপাদান হিসেবে স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পকর্ম, বিশ্বাসভিত্তিক প্রথা, অলংকরণ ও সজ্জিতকরণ, কমিউনিকেশন, এসব কারণে মানুষ শিল্প সৃষ্টি করত। যে কোনো শিল্পীর কাছে তার শিল্পকর্মই শ্রেষ্ঠ। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে নানা রকম কারুকার্যময় লোকশিল্প। আবহমান বাংলার লোকশিল্প টিকে আছে তার নিজস্ব স্বকীয়তা ও কারুকার্যময় আকর্ষণীয় নকশা এবং

*প্রভাষক, শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, গ্রীনরোড, ঢাকা।

রঙের কারণে। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে, সভ্যতায়, নকশা তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানব জাতির দৈনন্দিন জীবনের উপকরণে সংযুক্ত হয়েছে। লোকশিল্পের অন্তর্গত শোলাশিল্প এমন একটি শিল্প যা তার মাধ্যমগত ও বৈচিত্র্যময় নকশার কারণে এবং মালাকারদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার জন্য আজও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে আছে। গ্রামীণ স্বল্পশিক্ষিত লোকশিল্পীদের সহজ সাবলীল জ্ঞান ও দক্ষতাকে পুঁজি করেই নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এই শিল্প অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। শোলা দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করা একটি সৃষ্টিশীল কাজ, যার আছে নিজস্ব নান্দনিক সৌন্দর্য। সবচেয়ে বড় কথা শোলাশিল্প একটি পরিবেশবান্ধব শিল্প, যা তার রং ও নকশার বৈশিষ্ট্যের কারণে খুব সহজেই যে কারো নজর কাড়ে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যে আদিম শিল্পের স্বাক্ষর রেখেছিল–আদিম কৃষি সমাজ বর্তমানেও তা বহন করে চলেছে। লোকায়ত সমাজের দৈনন্দিন প্রয়োজন, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে সৃষ্টি করে চলেছে লোকশিল্প, যা ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের সর্বত্রই। আদিপর্বে বাংলার এই শিল্পধারা ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত শিল্পীদের অবস্থার কথা অনেকাংশে আজও অজানা রয়ে গেছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লোকশিল্প গবেষক তোফায়েল আহমেদের ভাষায়, "লোকশিল্প সাধারণ লোকের জন্য সাধারণ লোকের সৃষ্টি"[১]। গ্রামীণ সনাতন কৃষি-নির্ভর স্বল্প আয়ের মানুষের শিল্প লোকশিল্প। লোকশিল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ শোলাশিল্প। শোলাশিল্প আমাদের বাংলার ঐতিহ্য। বাংলাদেশের এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

শোলা এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ। বাংলাদেশের খাল-বিল, পানিতে আবাদ করা ধানখেত, পাটখেত, অগভীর পুকুরের ধারে নিজে থেকেই শোলা জন্মে। এই শোলা দিয়ে শোলাশিল্পীরা নানা ধরনের লোকজ খেলনাসহ বিভিন্ন শৌখিন শিল্পসামগ্রী তৈরি করেন। এখনো গ্রামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে অনেক শোলাশিল্পী। যারা শোলার শিল্পকর্ম প্রস্তুত করে তাদেরকে মালাকার বলা হয়ে থাকে।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে–বাংলাদেশের শোলাশিল্পের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করা। এছাড়া আরও কিছু উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- লোকশিল্পের একটা বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে শোলাশিল্প। তাই এই বিষয়ে একটি গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন।

- বিভিন্ন লোকশিল্পের সাথে শোলাশিল্পের গঠনগত মিল নির্ণয় করা।
- শোলাশিল্প কেন বিলুপ্তির পথে তার কারণ খুঁজে বের করা।
- শোলাশিল্পের স্থায়িত্ব কম–এই বিষয় অনুসন্ধান করা।

গবেষণার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শোলাশিল্পকে বেছে নেয়ার কিছু যৌক্তিক কারণ হচ্ছে–আমাদের সংস্কৃতি থেকে শোলাশিল্প বিলুপ্ত হওয়া এবং এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের কোনো ধারণা না থাকা। শোলাশিল্প বিলুপ্ত হবার কারণ–উচ্চমূল্য এবং মেলা বা হাটবাজারে স্বল্পমূল্যে প্লাস্টিক ও বিদেশি জিনিসের সহজলভ্যতা। লোকশিল্পের মধ্যে নকশিপাখা, ছিকা, শখের হাঁড়ি, কারুকাজ খচিত তামা, কাঁসা ইত্যাদি সব বিষয়েই সাধারণ মানুষের কিছু ধারণা থাকলেও শোলাশিল্প সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা কম। আর সে কারণেই শোলাশিল্পের মৌলিক গুণাবলি ও এর আকর্ষণীয় শৈল্পিক গুরুত্ব প্রকাশের জন্যই এ বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে।

১.১ শোলাশিল্পের আদিকথা

প্রাচীনকালে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে শিল্পকলা। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সভ্যতার অনেক উপাদানই ধ্বংস হয়ে গেছে, টিকে আছে শুধু শিল্পকর্ম। হাজার বছরের শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–শিল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি, যুগে যুগে তা পরিবর্তিত হয়েছে। আদিম যুগে মানুষ শিল্প সৃষ্টি করত এক ধরনের টোটেম, টাবু ও জাদু বিশ্বাস থেকে। শিকারি যুগে মানুষ নানা ধরনের জীবজন্তুর ছবি আঁকত শিকারে সফল হওয়ার জন্য। সুতরাং বলা যায় যে, শিল্প ছিল আদিম মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের হাতিয়ার। পরবর্তীকালে বুদ্ধিবৃত্তির কিছুটা উন্নত স্তরে মানব সমাজে ধর্মের আবির্ভাব ঘটল এবং সেসময় থেকেই শিল্প ধর্মাশ্রয়ী হয়ে উঠল। পরবর্তীসময়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পৃথিবী ধর্মভিত্তিক শিল্প দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকল। পৃথিবীর সর্বত্রই তখন ধর্মভিত্তিক শিল্পের জয়জয়কার। সেই সময় শিল্প কখনো হিন্দু আর্ট, কখনো মুসলিম আর্ট, কখনো বুদ্ধিস্ট আর্ট কখনো-বা খ্রিষ্টান আর্টকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শিল্পকলার একটা বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে লোকশিল্প। বাংলাদেশের লোকজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই লোকশিল্প। কিছু কিছু লোকশিল্পও শুরুতে ধর্মকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে সামাজিক বিকাশ ঘটার সাথে সাথে লোকশিল্প ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের লোকশিল্পের ভুবনে অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে শোলাশিল্প। শোলাশিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

হিন্দু পুরাণে বর্ণিত আছে–স্বয়ং শিব হিমালয়-কন্যা পার্বতীকে বিবাহ করার সময় বিবাহোৎসবে ধবধবে সাদা মুকুট ও মালা পরার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু প্রভু বিশ্বকর্মা যিনি সনাতন ধর্মমতে কারুশিল্পীদের স্রষ্টা তিনি জানতেন না যে, কী উপাদানে এই শুভ্র ধবল মুকুট ও মালা তৈরি করা যাবে। তাই শিব তার মাথার একগুচ্ছ চুল তুলে পুকুরের পানিতে ফেলে দেন। এরপর সেখান থেকে পানিতে গুল্ম জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মে যা ভাত শোলা নামে পরিচিত। এরপর বিশ্বকর্মা আবার দ্বিধান্বিত হলেন এই ভেবে যে, তিনি নরম, হালকা ও ভঙ্গুর উপাদান দিয়ে কীভাবে মুকুট ও মালা তৈরি করবেন। কারণ বিশ্বকর্মা শুধু পাথর বা কাঠের মতো শক্ত দ্রব্যে কাজ করতে পারদর্শী। তখন আবার শিব তার হাতের বাহু থেকে একগুচ্ছ চুল তুলে তা পানিতে ফেলে দেন এবং পরে পানি থেকে একজন সুদর্শন যুবক উঠে আসে। শিব তাকে বিবাহ উৎসবের মুকুট ও মালা তৈরি করার হুকুম করেন। তখন সেই যুবককে মালাকার বলে সম্বোধন করা হয়েছিল। সেসময় থেকেই শোলাশিল্পের সাথে জড়িত শিল্পীদের মালাকার উপাধি দেওয়া হয়। মালাকাররা বংশানুক্রমে শোলা দিয়ে বৈচিত্র্যময় টোপর, দেবদেবীর অলংকার, চালচিত্র, পূজামণ্ডপের সাজসজ্জা, মালা, গহনা, খেলনা ও গৃহসজ্জার নানা দ্রব্য তৈরি করে। সূত্রধর ও কর্মকাররা বিশ্বকর্মার উপাসক হলেও মালাকাররা শিবের উপাসক। এদের ধারণা শিবের ইচ্ছায় তাদের আবির্ভাব ঘটেছে, তাই শিবই তাদের উপাস্য দেবতা[২]।

বাংলাদেশে মালাকার সম্প্রদায়ই হলো শোলাশিল্পের প্রধান কারিগর। প্রাচীনকালে মালাকার সম্প্রদায় কাচা ফুল দিয়ে সাজসজ্জার কাজ করতেন। কিন্তু কাচা ফুল দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ার কারণে পরবতীকালে জমিদারগণ সাজসজ্জার জন্য মালাকারদের এমন কিছু নির্বাচন করতে বলেন যা অধিক দীর্ঘস্থায়ী। এর পরেই মালাকাররা

শোলাশিল্পের আবিষ্কার ঘটায়। শোলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যই সাজসজ্জা এবং লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের উপকরণ হিসেবে শোলার কাজ ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ব্রহ্মবৈর্বতপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ভবদেব ভট্টের প্রায়ন্তিত্ত প্রকরণ গ্রন্থে শিল্পীদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে সহজে তাদের স্থান অনুমান করা যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত তৎকালীন যুগের আর সমস্ত বর্ণকে স্থান দিয়েছে শূদ্রবর্ণের পর্যায়ে। শূদ্র সংকর উপবর্ণের তিনটি উপবিভাগ রয়েছে, যে উপবিভাগে তাদের বৃত্তি ও পেশায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই বিভাজনের ফলে উত্তম সংকর পর্যায়ে স্থান পেয়েছে তন্তুবায়, কর্মকার, কুম্ভকার, কাংসকার, শাঙ্খিক বা শঙ্খকার এবং মালাকার। মধ্যম সংকর পর্যায়ে তক্ষক ও চর্মকার। ব্রহ্মবৈর্বতপুরাণেও এই ধরনের বর্ণবিন্যাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আবার সৎশূদ্র, অসৎশূদ্র ও অন্ত্যজ অজলচল পর্যায়ে এই তিনভাগের বর্ণবিন্যাস দেখা যায়। এইখানে সৎশূদ্র পর্যায়ে স্বর্ণকার, মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, তন্তুকায় বা কুবিন্দক, কুম্ভকার, কাংসকার, সূত্রধর, চিত্রকররা স্থান পেয়েছে। অসৎশূদ্র পর্যায়ে রয়েছে স্বর্ণকার, সূত্রধর, চিত্রকর ও চর্মকার। সেখানে বলা হয়েছে ডোম, নিষাদ প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষরা গ্রামের বাইরে বাস করত। এদের জীবিকা ছিল বাঁশের তাঁত, চাঙারি প্রভৃতি নির্মাণ। সামাজিক অনুশাসনে এরাই ছিল নিম্নস্তরের মানুষ[৩]।

২. শোলার জন্ম বৃত্তান্ত ও পরিচয়

শোলাজাতীয় উদ্ভিদ দিয়ে শোলার শিল্পকর্ম তৈরি করা হয়। এক প্রকার জলজ উদ্ভিদের নাম শোলা। জল কথাটির অর্থ 'সলিল'। আর এই সলিল থেকে শোলার উৎপত্তি হয়–সলিল>সলিলা>সলা>সোলা (শোলা)[৪]। সাধারণত বেশি পানিতে আবাদ করা ধানখেত, পাটখেত, খাল-বিল, মজা পুকুর এবং জলাশয়ের তলদেশে পরগাছার মতো জন্মানো কোমল উদ্ভিদই শোলা। এর ইংরেজি নাম 'স্পঞ্জ উড', উদ্ভিদবিজ্ঞানে এর নাম Aspera Indigenous[৫]। আমাদের দেশে ইংরেজ শাসন আমলে শোলা দিয়ে নানা ধরনের বাহারি টুপি তৈরি করা হতো বলে এটাকে Hat Plantও বলা হতো[৬]। পানির উপরে শোলা গাছের পাতা ও ফুল ভেসে থাকে। পাতা দেখতে অনেকটা তেঁতুল পাতার মতো। মাগুরার শোলাশিল্পী নিমাই মালাকার জানায়, শোলাগাছ উচ্চতায় ৪-৫

ফুট এবং কাণ্ডের ব্যাস আড়াই ইঞ্চির বেশি হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শোলাগাছের গোড়া চিকন ও মাঝের অংশ মোটা হয়। তবে মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। শোলা সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাট কাটার মতো পানির নিচ থেকে শোলা কাটা হয়।

বর্ষার শুরুতে শোলার বিজ পেকে যায়, আশ্বিন-কার্তিক মাসে এই বিজ ফেটে মাটিতে ঝরে পড়ে এবং ভেজা মাটিতে নতুন চারা গজায়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পানি বাড়ার সাথে সাথে পানির নিচে শোলার কাণ্ড বেড়ে ওঠে এবং শাখা-প্রশাখা উপরে ভেসে ওঠে। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই তিন মাসে পরিণত শোলা বিল থেকে সংগ্রহ করা হয়। পানির নিচের অংশের শোলা দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি হয় আর উপরের অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শোলা একটি কাণ্ডসর্বস্ব গাছ। কান্ডের বাইরের আবরণ মেটে রঙের এবং শেকড়ে জড়ানো আর ভেতরটা সাদা ধবধবে। শোলা দেখতে অনেকটা দুধের মতো সাদা এবং ফুলের মতো হালকা ও মোলায়েম। শ্বেত-শুভ্র ও জলজ বস্তু হওয়ায় এটি পবিত্রতার প্রতীকও বটে[৭]। বাংলাদেশে দুই ধরনের শোলা জন্মে–(ক) কাঠ শোলা, (খ) ভাত শোলা। কাঠ শোলা বেশ শক্ত। এই শোলা দিয়ে শিল্পকর্ম প্রস্তুত সম্ভব নয় বলে জানান মাগুরার শোলাশিল্পী নিমাই মালাকার। এই শোলা জেলেদের মাছ ধরার কাজে শক্ত ছিপি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে ভাত শোলা ফুলের মতো নরম ও মোলায়েম হওয়ায় অনেক অঞ্চলে এই শোলাকে ফুল শোলাও বলা হয়। এটা খুব নরম তাই এই শোলা দিয়ে শোলার সকল পণ্য প্রস্তুত করা হয়।

২.১ শোলা নির্মিত শিল্পকর্ম ও ব্যবহৃত উপকরণ

শোলাশিল্পের প্রধান উপকরণ বা কাচামাল হচ্ছে ভাত শোলা। শোলার শিল্প তৈরি করতে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় খুব সামান্যই। যার সাহায্যে শোলাশিল্পীরা তাদের দক্ষ হাতে সুনিপুণভাবে শিল্পকর্ম প্রস্তুত করেন। যন্ত্রপাতির মধ্যে কাত বা কাইত অন্যতম। ঢাকার শাঁখারি বাজারের শোলাশিল্পীরা এটাকে বড় চাকু বলে। এই কাত বা চাকু শোলা টুকরা করা এবং পাতলা কাপড়ের মতো পরত করতে সাহায্য করে। কাত ছাড়াও কাজের সুবিধার্থে শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের ধারালো চাকু ব্যবহার করে

থাকে। বিভিন্ন মাপের এইসব ধারালো চাকু পরিপক্ব সুপারি গাছের বড় ফালির উপরে বালু ছিটিয়ে ধার করা হয়।

এছাড়াও আনুষঙ্গিক উপকরণ হিসাবে প্রয়োজন–রঙিন কাগজ, বাঁশের টুকরা, পাটের দড়ি, কড সুতা, কাগজ, ঝাড়ুর শলা, পাটকাঠি, সালমা-চুমকি, পুতি, আঠা ইত্যাদি। অনেক দিন আগে তেঁতুল বীজের আঠা ব্যবহার করত মালাকার সম্প্রদায়। কিন্তু বর্তমানে ময়দা জ্বাল করে তার সাথে তুঁত মিশিয়ে আঠা প্রস্তুত করেন তারা। এছাড়াও বাজারের আইকা আঠাও ব্যবহার করেন তারা।

চিত্র-১
শোলার শিল্পকর্ম প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত ছুরি
(শিল্পী : গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, খড়িখালি, ঝিনাইদহ)

২.১.১ তেঁতুল বীজের আঠা প্রস্তুত প্রণালী :

তেঁতুল বীজ ভালোভাবে পরিষ্কার করে তিন দিন ধরে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর পানি থেকে তুলে ভালোভাবে শুকাতে হয় এবং আগুনে চূড়ান্তভাবে তাপ দেওয়া হয় লোহা বা মাটির পাত্রে। ভাজা বীজ ঢেঁকিতে কুটে খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে গুঁড়ো করতে হয়। পুনরায় গুঁড়ো শাঁস এক সপ্তাহ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এক সপ্তাহ পর পানি ছেঁকে আবার রোদে শুকাতে হয়। শুকানো হলে তা ঢাকনাযুক্ত মাটির পাত্রে মুখ বন্ধ করে রাখা হয়। এরপর প্রয়োজনমতো অল্প অল্প তেঁতুল বীজের গুঁড়ো নিয়ে পানির সাথে মিশিয়ে তা আঠা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই আঠা শুধু

জোড়া দেওয়ার কাজেই ব্যবহার হয় না বরং এই আঠা ব্যবহারে শোলার শিল্পকর্ম বিভিন্ন ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ থেকে রক্ষা পায়।

২.২ শোলার শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত প্রণালি :

বাংলাদেশে সাধারণত শোলার তিন ধরনের কাজ হয়ে থাকে–

(ক) খোসা ছাড়িয়ে শোলার সাদা অংশ কেটে ফুল, পুতুল, খেলনা, মুকুট ইত্যাদি তৈরি;

(খ) খোসা ছাড়িয়ে শোলাকে পাতলা পাতলা তক্তার মতো করে জুড়ে অথবা তার উপর কাগজ লাগিয়ে কারান্ডি চিত্র আঁকা;

(গ) শোলার পাতলা অংশের উপর পোড়া মাটির ছাঁচ দিয়ে অ্যামবোস করা।

এই গবেষণাটি করতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা ঘুরে শোলাশিল্পের করণকৌশল সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে। শোলাশিল্পীদের সাক্ষাৎকারে তাদের কাছ থেকে শোলাশিল্পের করণকৌশল সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমে শোলার খোসা ছাড়িয়ে শিল্পকর্মের আকার-আকৃতি অনুসারে শোলার কাণ্ডগুলোকে বিভিন্ন মাপে কেটে নেওয়া হয়। এরপর শোলার কাটা অংশ থেকে লোহার ধারালো ছুরি বা কাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শোলা থেকে কাপড়ের মতো পাতলা অংশ বা কাপ তুলে নিতে হয়। এই কাপ দিয়ে নানা ধরনের শিল্পকর্ম প্রস্তুত করা সম্ভব।

চিত্র-২
শোলার ফুল তৈরির প্রক্রিয়া
(শিল্পী : গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, খড়িখালি, ঝিনাইদহ)

চিত্র-৩
শোলার ফুল তৈরির প্রক্রিয়া
(শিল্পী : গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, খড়িখালি, ঝিনাইদহ)

ঝিনাইদহের গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই কাপ দিয়ে ফুল তৈরি করে দেখালেন। এই ফুল গৃহসজ্জাসহ নারীর সাজসজ্জায় বেশ জনপ্রিয়। পাতলা করে কাটা প্যাঁচানো শোলার কাপ জড়িয়ে জড়িয়ে পুনরায় কাণ্ডের মতো করে মাঝে সুতা দিয়ে বেঁধে দুটি অংশ সরু করে কেটে নেওয়া হয়। সুতা দিয়ে বাঁধা অংশটি খুলে ঐ একই জায়গায় কয়েক পরত কড সুতা জড়িয়ে সুতার এক প্রান্ত ডান হাত ও এক প্রান্ত ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে চেপে ধরে (মাঝখানে থাকে প্যাঁচানো কাপ বাঁধা) খুব সজোরে টেনে ফুটিয়ে তোলা হয় শোলার কদম ফুল।

চিত্র-৪
শোলার ফুল তৈরির প্রক্রিয়া
শিল্পী : গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, খড়িখালি, ঝিনাইদহ

চিত্র-৫
শোলার ফুল তৈরির প্রক্রিয়া
শিল্পী : গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, খড়িখালি, ঝিনাইদহ

এই প্রক্রিয়ায় ফুল তৈরি করলে খুব শক্তি বা ব্যালেন্স প্রয়োজন হয়। মাগুরার শালিখার শংকর মালাকার ঘরের খোলা বারান্দার বাঁশের সাথে সুতার এক প্রান্ত বেঁধে অপর প্রান্ত হাতে ধরে সজোরে টেনে ফুল তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ার ফুল তৈরি সহজ ও খুব বেশি শক্তিরও প্রয়োজন হয় না। এই প্রক্রিয়ায় কদম ফুল ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের ফুল তৈরি করা যায়।

২.৩ শোলা শিল্পের রং ও নকশার বিশ্লেষণ

বিখ্যাত শিল্পী Henry Matis বলেছেন, “If drawing if of the spirit and colour of the senses, you must draw first, to cultivate the spirit and to be able to lead colour into spiritual paths.”[৮]

অতএব বলা যায়, বাস্তব গঠনকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যই শিল্পী রং ব্যবহার করেন। মূলত রং দেখতে গিয়েই আমরা গঠনকে দেখি। তাই রং-ই হলো শিল্পের প্রাণ। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকার লোকশিল্পীরাই উজ্জ্বল রং ব্যবহার করতেন। শুধু শোলার শিল্পকর্মে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা হয় ব্যাপারটা তা নয়। লোকশিল্পের সকল ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল রঙের প্রধান্য বেশি।

চিত্র-৬
শোলার কাকাতুয়া
(শিল্পী : দেবদাস মালাকার, শিল্পীর নিজস্ব সংরক্ষণ)

উজ্জ্বল ও চোখ ধাঁধানো রং ব্যবহারের ফলে লোকশিল্প খুব সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। যদিও প্রাচীন যুগে অনেক শিল্পকর্মেই রং ব্যবহার করা হতো না। সাদা হচ্ছে শুভ্রতার প্রতীক। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শোলার শিল্পকর্মে শোলার নিজস্ব সাদা রংকেই প্রধান্য দেওয়া হয়। যেমন–দেবীর সাজসজ্জা, টোপর, কপালী, কদম ফুল, ময়ূর ইত্যাদি শোলার শিল্পীকর্ম শিল্পীরা শোলার নিজস্ব সাদা রং রেখেই প্রস্তুত করেন।

শোলা শিল্পে গোলাপী, সবুজ ও হলুদ রঙের ব্যবহারও বেশ লক্ষ করা যায়। নীল রঙের ব্যবহার হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায়। শুকানো শোলার রং এর জলীয় অংশ তাৎক্ষণিকভাবে শুকিয়ে যাওয়ার ফলে একটা পেলব রঙের আমেজ সৃষ্টি হয় (Soft tonality of extraordinary Character)। রঙের লালিত্য আর নমনীয়তা এ শিল্পের প্রধান আকর্ষণ।

প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী রঙের উপকরণগুলো হলো–দোয়াতের কালি (লাল, নীল, কালো, সবুজ), আলতা, সিম পাতার রস, কুমড়ো ফুলের রস, কাচা হলুদ, ভূষাকালি,

চকপাউডার, তেঁতুল বিচির আঠা, সাগুর আঠা ইত্যাদি। রং ব্যবহারের জন্য ছাগলের লোম বা পাটের আঁশ কাঠির সাথে বেঁধে তুলি প্রস্তুত করা হতো। তবে শোলার শিল্পকর্মে সাধারণত পাউডার-রং ব্যবহার করা হয়। পানিতে গুলানো পাউডার রঙে শিল্পকর্মগুলো প্রয়োজনমতো ডুবিয়ে রং করা হয়।

২.৩.১ নকশা :

যে কোনো শিল্পকে অলংকরণের উদ্দেশে নকশা আরওপিত হয়। নকশায় নানা রকম মোটিফ ব্যবহার হয়ে থাকে। কখনো জ্যামিতিক, কখনো ফুল-লতাপাতা, কখনো জীবন যাপনের উপাদানসমূহ। কখনো-বা প্রাকৃতিক উপাদান আবার কখনো ছন্দময়তায় ভরপুর গতিশীল রেখা দ্বারা সৃষ্ট। দেশ, সংস্কৃতি, ধর্ম, স্থান, কাল ভেদে নকশার উপাদানে আসে ভিন্নতা, তেমনি বাংলাদেশের লোকশিল্পের অন্তর্গত শোলাশিল্পে ব্যবহৃত নকশায়ও রয়েছে স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্যময়তা।

চিত্র-৭
ঘোড়ার গাড়ি
(শিল্পী : গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, খড়িখালি, ঝিনাইদহ)

শোলাশিল্প ক্ষুদ্র এবং বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে বলে এ শিল্প সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশের প্রভাবমুক্ত। আর এ কারণেই এই শিল্পের নকশা ও মোটিফগুলোর মৌলিকত্ব ও সরলতা আজও টিকে আছে। বিভিন্নভাবে শোলার শিল্পকর্মে নকশা ব্যবহার করা হয়। রং দিয়ে নকশা করা হয়ে থাকে। শোলা কেটে কেটে নকশা তৈরি হয়ে থাকে। ছাঁচ দিয়েও নকশা করা হয়। শোলার পাতলা পরত বা কাপ ছাঁচের উপর ফেলে নকশার ছাপ তুলে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কলকা, ফুল-

লতাপাতা প্রধান্য বেশি পায়। ছাঁচ থেকে ছাপ তোলার পর শোলাশিল্পী খুবই পাতলা ও নমনীয় চাকু দিয়ে ছাপ তোলা নকশা খোদাই করে বের করেন।

শোলাশিল্পকর্মে লতার ব্যবহার অধিক লক্ষণীয়। নানা রকম লতা ও ফুলের ব্যবহার হয়ে থাকে এই শিল্পে। বাংলার মসজিদে, মন্দিরে, আলপনায়, নকশিকাঁথায়, সরা ও শখের হাঁড়ির গায়ে ব্যবহৃত ফুল-লতাপাতা দিয়ে যে অলংকরণ করা হয় শোলার শিল্পকর্মেও সেই ফুল-লতাপাতার ব্যবহার হয়, অপরদিকে প্রতিমা সাজাতেও এই লতার ছড়াছড়ি যেমন–'পদ্মলতা', 'কলমীলতা', 'শুষনীলতা', 'চন্দ্রলতা', 'শঙ্খলতা'[৯], এছাড়াও পশুপাখি আর জ্যামিতিক নকশার সমন্বয়ে শোলাশিল্পীরা তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর দক্ষ কৌশলের মাধ্যমে শোলাশিল্পকে করে তুলেছেন অপরূপ সুন্দর ও একান্ত স্বকীয়।

চিত্র-৮
প্রতিমার মুখ
(শিল্পী : তপন কুমার মালাকার, আত্রাই, নওগাঁ)

৩.১ শোলাশিল্পের বিকাশ ও ঐতিহ্য সন্ধান

লোকশিল্পের ঐতিহ্য বা Tradition বাংলাদেশের বিশাল একটা স্থান জুড়ে রয়েছে। ঐতিহ্যের আভিধানিক অর্থ বলতে আমরা বুঝি ইতিহাস পরম্পরাগত কথা[১০]। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের মধ্যে শোলাশিল্প প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে মানুষের আবেগকে দোলা দিয়ে আসছে এই শিল্প। "অতীতকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ধারণ করতে সক্ষম বলে এই সমাজে শিল্পীদের তৈরি শিল্প

ঐতিহ্যবাহী"[১১]। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে সব লোকশিল্প কম বেশি ঐতিহ্যবাহী তবে সব ঐতিহ্যবাহী শিল্প লোকশিল্প নয়। এ বিষয়ে অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন–"Folk art is always traditional but all traditional arts are not Folk art"[১২]। বিভিন্ন দেশের লোকশিল্পী বিভিন্ন রকম আর তাই কোনো দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায় ঐ দেশের লোকশিল্প দেখে।

যেহেতু ঐতিহ্যের আভিধানিক অর্থ ইতিহাস পরম্পরাগত কথা, তাই বলা যায় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা বলতে পারি, মালাকার সম্প্রাদায় তাদের নিজস্ব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিক, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বংশপরম্পরাগত যে পেশা থেকে এ সমস্ত শিল্পপণ্য উৎপাদন করে তা নিঃসন্দেহে ঐতিহ্য-নির্ভর।

বাংলাদেশের লোকশিল্পের ভুবনে শোলাশিল্প আবহমানকাল ধরে তার ঐতিহ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এদেশে শোলাশিল্পের রয়েছে বিচিত্র এক জগৎ। বর্তমানে শোলাশিল্পের অবস্থান চোখে পড়ার মতো। প্রাচীন কাল থেকেই এদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মালাকার শ্রেণি অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য নিজেদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন থেকেই নিজের মনের অনুপ্রেরণায় শোলার শিল্পকর্ম তৈরি করতেন। ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে আকর্ষণীয় রূপ লাভ করছে।

অতীতে বিশেষ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার লক্ষ করা যেত, কিন্তু বর্তমানে শোলাশিল্প এতটাই বিকাশ লাভ করেছে যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় এমনকি গৃহসজ্জাসহ শিশু খেলনা হিসেবেও স্থান দখল করে নিচ্ছে। খেলনা হিসেবে শোলার তৈরি বানর, শোলার কুমির বেশ জনপ্রিয় ও পরিচিত। তবে শোলার শৌখিন পণ্য ও উপহার সামগ্রী তৈরি করতে পারলে এই শিল্প আরও বিকাশ লাভ করবে এবং এর বাণিজ্যিক দিকও প্রসারিত হবে।

এ প্রসঙ্গে শংকর মালাকার জানান, শোলাশিল্পের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম হচ্ছে 'টোপর'। বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত একপ্রকার ধর্মীয় মস্তকাবরণী। সাধারণত বিবাহ উপলক্ষ্যে বরকে টোপর পরতে হয়। বিবাহ উপলক্ষ্যে টোপর পরিধান একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী প্রথা। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী টোপর সৌভাগ্য এনে দেয়। কনের

বাড়ি থেকে টোপর পাঠানো হয় বরের বাড়িতে। টোপর নিয়ে হিন্দু পুরাণে যে কাহিনি আছে তা ইতোমধ্যে আমরা শোলাশিল্পের আদিকথার মধ্যে বর্ণনা করেছি। বিবাহ অনুষ্ঠানে টোপর শুধু তার সৌন্দর্যের কারণেই পরা হয় না বরং টোপর পরিধানের বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে এবং তা পরা বরের আবশ্যিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। এই কারণে টোপর নিয়ে হিন্দু সমাজে নানাবিধ সংস্কারও রয়েছে। টোপর খুব সাবধানে ব্যবহার করা হয়। টোপর ভেঙে যাওয়া বা পুড়ে যাওয়া দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলে ধরা হয়[১৩]।

চিত্র-৯
টোপর ও কপালী
(শিল্পী : শংকর সরকার, শাঁখারি বাজার, ঢাকা)

টোপর বা শোলা নির্মিত যে কোনো সামগ্রী নষ্ট হয়ে গেলে তাকে জলাশয়ের গর্ভে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। লোকবিশ্বাস, এতে ভাঙা জিনিসটি নিয়ে কেউ ব্যবহারকারীর ক্ষতি করতে পারে না[১৪]।

বিবাহ ছাড়াও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানেও টোপরের প্রচলন রয়েছে। অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে শিশুকে বরের সাজে সাজানো হয়। এবং বরের মতো তার মাথায় টোপর পরানো হয়। এই টোপর শোলার নির্মিত হলেও স্বাভাবিক কারণেই বিবাহের টোপরের তুলনায় আকারে ছোট হয়।

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত টোপর নির্মাণে শোলা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শোলা নির্মিত টোপর দেখতে ধবধবে সাদা কিন্তু বর্তমানে যুগের চাহিদা অনুযায়ী টোপরে শোলার সাথে জরি, চুমকি, পাথর, পুতি ইত্যাদি যুক্ত করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শোলার টোপর নানা রঙে রাঙানোও হয়।

৩.২ শোলাশিল্পের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা

শোলাশিল্পের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা আলোচনা করার পূর্বে 'শিল্প' সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। শিল্প বিষয়টি এতটাই ব্যাপক যে তাকে দু-এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা কষ্টসাধ্য। হাজার বছরের শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আদিমকাল থেকেই শিল্পের চর্চা হয়ে এসেছে এবং ক্রমান্বয়ে বিশ্বময় শিল্পসমৃদ্ধ হয়েছে যুগ যুগ ধরে। শুধু তাই নয় সভ্যতাকেও সমৃদ্ধ হতে সহায়তা করেছে। তাই বলা যায় যে সভ্যতার ইতিহাস আর শিল্পের ইতিহাস সমার্থক। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মতে, "শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এর সীমানা সতত পরিবর্তনশীল, বিশাল।" তিনি আরও বলেছেন, "যাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না তাকে সংজ্ঞায়িত করার নিরর্থক একটা প্রচেষ্টা চলে নন্দন তত্ত্বে[১৫]। লংগিনাস বলেছেন, "শিল্প হচ্ছে শিল্পীর আত্মার গভীর ধ্যান-ধারণার প্রতিচ্ছবি।" আবার গ্রিক দার্শনিক প্লেটো শিল্পকে আখ্যা দিয়েছেন "অনুকরণের অনুকরণ" হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ শিল্পের ক্ষেত্রে "কল্পনাকেই প্রধান্য দিয়েছেন। কল্পনার ছোঁয়া পেয়েই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ ঘটনা অসাধারণ হয়ে ওঠে। শিল্প সুন্দর হয় তখনই যখন শিল্পের ট্রুথ বহিঃজগৎকে ছেড়ে শিল্পীর প্রকাশভঙ্গিকে আশ্রয় করে, তথ্যকে ছেড়ে রূপকে আশ্রয় করে, প্রকাশভঙ্গী যখন রমণীয় হয়ে ওঠে শিল্পীর সহজ লীলায়[১৬]। শিল্পের স্বরূপ সম্পর্কে হাবার্ড রিড তার *Meaning of Art* গ্রন্থে বলেছেন, শিল্প হচ্ছে "কিছু আনন্দদায়ক আঙ্গিক নির্মাণের প্রচেষ্টা। অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতে চেয়েছেন, শিল্প হচ্ছে "জড় ধর্মের অতিরিক্ত ধর্ম, যার যোগ মানুষের আত্মার সঙ্গে।"

দর্শনের যে শাখাটি শিল্প নিয়ে আলোচনা করে বা শিল্পের তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করে তাকেই নন্দনতত্ত্ব বলা যেতে পারে। নন্দন অর্থ সৌন্দর্য। তবে সৌন্দর্য বিষয়টি কী, কাকে, সৌন্দর্য বলা হবে কিংবা সৌন্দর্যের স্বরূপই-বা কী, এ বিষয়ে সরাসরি কোনো উত্তর দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। শিল্পী আব্দুস সাত্তার প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান গ্রন্থে সুন্দর বিষয়টিকে বাতাসের সাথে তুলনা করেছেন। "বাতাস যেমন–দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। সুন্দরও তেমন অনুভবের বিষয়।"[১৭] প্লেটো তাঁর 'সিম্পোজিয়াম' গ্রন্থে সৌন্দর্যের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, লিও

বাতিস্তা আলবের্তি'র মতে, "সৌন্দর্য হচ্ছে এক ধরনের ছন্দময় সমগ্র বিন্যাস, যার একটি উপাদানও পরিবর্তিত হলে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।"

আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁর 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' গ্রন্থটি শুরু করেছেন সুন্দরের ব্যাখ্যা ও কিছু সংজ্ঞা দিয়ে। তিনি বলেছেন, "সৌন্দর্য একটি বিশেষ সামঞ্জস্য বা পরিচয়ের বোধ। বিশ্লেষত্মক এবং বিশিষ্ট বোধ বলিয়া ইহার স্বরূপ লক্ষ্মণ সম্ভব নহে।"[১৮]

আমরা যখন ব্যতিক্রমী কিছু দেখি বা সুন্দর কোনো কিছু আমাদের সামনে উপস্থিত হয় তখন নিঃসন্দেহে আমাদের সাধারণ অনুভূতির বাইরে এক ধরনের উচ্চাঙ্গের ভাব তৈরি হয়–এই যে ভাব, তার সাথে নন্দনতত্ত্ব বা নান্দনিকতার সম্পর্ক। এই দুইয়ের সম্মিলিত রূপই সৌন্দর্য। নান্দনিকতা শুধু আমাদের কাছে শিল্পের গুণাবলিই তুলে ধরে না কিংবা শিল্প-সম্পর্কিত দার্শনিক সত্যই তুলে ধরে না, পাশাপাশি শিল্পকে উপভোগ করার একটি প্রশস্ত পথেও আমাদের প্রবেশ করিয়ে দেয়। অলংকরণ বা শিল্পকলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দর ও মনোহর কিছু সৃষ্টি করা। এজন্য মনোহর বা নান্দনিক বোধই হলো শিল্পবোধ বা (Asthetic Sense)[১৯]।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, শোলাশিল্প অত্যন্ত নান্দনিক একটি লোকশিল্প। টোপর, কপালী, পাখা, মনসার মেড়, লক্ষ্মীর ছাতা, জোড়া পাখি, কুমির, বানর, ময়ূর, চান্দা, ঘোড়া, মুখোশ, মহরমের ছেরাশির্ণী প্রতিটি শোলার শিল্পকর্ম নান্দনিক গুণে গুণান্বিত। একেবারে শোলার নিজস্ব সাদা রঙের সাদাসিধে কাজেও শোলাশিল্পীদের নান্দনিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সাদার উপর সাদা শোলা দিয়ে নকশা করেন শোলাশিল্পীরা। কখনো-বা নষ্ট হয়ে যাওয়া লালচে শোলাও কাজে লাগায় নকশার ক্ষেত্রে। তাদের সহজ সরলী নকশা, কাঠামোগত দিক থেকে সরলীকরণ, উজ্জ্বল মৌলিক রঙের ব্যবহার সবকিছুই শোলাশিল্পীদের নান্দনিক রুচির পরিচয় বহন করেন।

৪. সুপারিশমালা :

১) বাংলাদেশে শোলার চাষ হয় না। তাই শোলার দুষ্প্রাপ্যতা রোধে কারিগরদের শোলা চাষে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া।

২) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের অধীনে বিভিন্ন গ্রাম/ কারুপল্লিতে শোলাশিল্পীদের স্থায়ী স্টল বরাদ্দ দেওয়া;
২.১. শোলাশিল্পীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
২.২. তরুণ প্রজন্মকে এই পেশায় আগ্রহী করে তোলার জন্য বিভিন্ন সেমিনার/সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;
২.৩. সরকারিভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে শোলাশিল্পীদের দক্ষতা বাড়ানো।

৩) শোলার রং ও শোলার শিল্পকর্ম স্থায়ীকরণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৩.১. শোলাশিল্পের ও শিল্পীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে গবেষণার মাধ্যমে তা দূর করার উদ্যোগ নেওয়া।

৪) শোলার উৎপাদিত পণ্য বিদেশে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৪.১. শোলাশিল্পীদের দেশীয় শিল্পমেলার পাশাপাশি বিদেশে বিভিন্ন শিল্পমেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া;
৪.২. বহির্বিশ্বে শোলাশিল্পের তেমন পরিচিতি নেই। তাই এ শিল্পের প্রচার করার ব্যবস্থা করা।

৪.১ গবেষণার সীমাবদ্ধতা :

- শোলা নিয়ে রচিত গ্রন্থের স্বল্পতা এবং এ সম্পর্কিত তথ্যের অভাব;
- বিদ্যমান অর্থ স্বল্পতা;
- এই গবেষণার শিরোনাম "বাংলাদেশের শোলাশিল্পের নকশা ও তার ঐতিহ্য সন্ধান"-এর বিস্তৃতি সারা বাংলাদেশ হওয়ায় যেসব জায়গায় শোলার উল্লেখযোগ্য কাজ হয় সেসব জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ধরনের গবেষণায় মাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে আরও সমৃদ্ধ কাজ করার সুযোগ রয়েছে বলে এ গবেষক মনে করে।

৫. উপসংহার :

বিশ্বের প্রতিটি জাতির একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে যা তার নিজস্ব পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বশিক্ষিত প্রান্তিক জনসাধারণের ঐতিহ্যবাহী আবহমান সংস্কৃতি হলো বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি। একটি দেশ বা জাতির লোকসমাজ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে জীবন-যাত্রার উপযোগী যা কিছু লাভ করে তা ওই দেশ বা জাতির লোকসংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় শোলাশিল্প একান্তভাবেই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে চলেছে।

শোলার সাজে বাংলার শিল্পীদের যে নান্দনিকতা, যে কৌশল, নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, শিল্পচাতুর্য রয়েছে তা আধুনিক সাজসজ্জাতে নেই বললেই চলে। তবে এ কথা সত্য যে চিরকালীন লোকশিল্প কখনো বিলুপ্ত হয় না, শুধু তার রূপ পরিবর্তন হয়। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের লোকশিল্প। হারিয়ে যাওয়া মালাকারদের হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু তারপরও মূল্যবান এই শিল্পের ঐতিহ্য ধরে রাখতে হলে এখনো যারা এ পেশায় নিয়োজিত আছেন তাদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাস্তবমুখী বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আধুনিক যুগে স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর থার্মোকল, শোলাশিল্পের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। কৃত্রিম শোলা এখন প্রাকৃতিক শোলার স্থান নিতে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাকৃতিক শোলার সহজ ও বৈচিত্র্যময়ী সৌন্দর্য, রূপবিন্যাস, অলংকরণের ভিন্নতা ও সূক্ষতা এমনভাবে বাঙালির মনে গেঁথে আছে যা আজও কেউ ভোলেনি। সভ্যতার বিকাশে বিনিময় ও বাজার ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে এই শিল্পের বিকাশ ও প্রথাগত ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি। লোকালয় ও আচার-অনুষ্ঠান প্রথাতে পরিবর্তন আসায় এ শিল্পের প্রসার ব্যাহত হচ্ছে। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক অনেক কারুশিল্পই মাধ্যমগত কারণে হারিয়ে গেলেও শোলার শিল্পকর্ম টিকে আছে এর উপকরণ ও নকশার বৈচিত্র্যের কারণে এবং মালাকারদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার জোরে। মূল্যবান এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এর বিকাশ সাধন করাও প্রয়োজন। নচেৎ এই শিল্প টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এটি শুধু আবেগ অনুভূতির ব্যাপার নয়, এটি সভ্যতা বিকাশের প্রশ্নও বটে। বাংলাদেশের লোকশিল্পের অন্তর্গত এই শোলাশিল্প

তার ঐতিহ্যের স্বমহিমায় জেগে উঠুক। মালাকার শ্রেণির লোকশিল্পীরা অমরত্ব লাভ করুক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত নান্দনিকতার পরিচয় নিয়ে–এ কামনাই করি।

তথ্যনির্দেশ

১. তোফায়েল আহমেদ, লোকশিল্প, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ : ১৭

২. এ কে এম মুজ্জাম্মিল হক, যশোরের কারুশিল্পের বাহারি দিক এবং ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশের কারুশিল্পী ও শিল্পকর্ম, রবীন্দ্র গোপ (সম্পাদিত) সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ : ২০১৪, পৃ. ৩০৭

৩. নীহারঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), কলিকাতা : দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, ১৪০২ বাংলা, পৃ : ২১১

৪. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, বাংলার লোকশিল্প, কোলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০৪, পৃ. ১৩৫

৫. নীরু শামসুন্নাহার, বাংলাদেশের শোলা-শিল্প, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পত্রিকা, প্রকাশ চন্দ্র দাস (সম্পাদিত), ঢাকা : , প্রথম বর্ষ, ২০১৩, পৃ. ৬৪

৬. এ কে এম মুজ্জাম্মিল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

৭. নীরু শামসুন্নাহার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪, ৬৫

৮. ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, (নকশাকলা), দিনাজপুর : মো. হাবিবুর রহমান (প্রকাশক), ২০০৮, পৃ. ২

৯. হীরেন্দ্র নাথ মিত্র (ব্রজমিত্র), বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প, কোলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০০৭, পৃ. ২০৪

১০. এ কে এম মুজ্জাম্মিল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

১১. এ কে এম মুজ্জাম্মিল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

১২. এ কে এম মুজ্জাম্মিল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭-৩১৮

১৩. সাক্ষাৎকার : শংকর মালাকার (মাগুরা, শালিখা, ২০১৬)

১৪. সাক্ষাৎকার : শংকর সরকার (শাঁখারি বাজার, ঢাকা, ২০১৬)

১৫. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, নন্দনতত্ত্ব, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮, পৃ. ৪৫

১৬. সুধীর কুমার নন্দী, নন্দনতত্ত্ব, পৃ. ৩৯

১৭. ড. আবদুস সাত্তার, প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩

১৮. কামাল আহমদ, শিল্পকলার ইতিহাস, পৃ. ৩

১৯. ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

২০. মতলুব আলী, শিল্পী ও শিল্পকলা, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪

২১. সৈয়দ আলী আহসান, শিল্প বোধ ও শিল্প চৈতন্য, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৩

২২. শাহরিয়ার হোসেন শাবিন, বাংলাদেশের লোকজ খেলনা, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১০

২৩. গোপাল হালদার, বাঙালির সংস্কৃতির রূপান্তর, প্রকাশক : মুক্তধারা, ঢাকা

২৪. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, বাংলাদেশের লোকশিল্প, ঢাকা : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩

২৫. নিসার হোসেন, লোকচিত্র কলা, চারু ও কারুকলা, লালা রুখ সেলিম (সম্পাদিত) ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

২৬. সাক্ষাৎকার : নিমাই মালাকার (মাগুরা, শালিখা, ২০১৬)

২৭. সাক্ষাৎকার : নিশা রানী মালাকার (মাগুরা, শালিখা, ২০১৬)

Prospects and Challenges of Offset Printing Industry from the Viewpoint of Graphic Designers in Bangladesh

Mohammad *Ferdous Khan Shawon**

Abstract

Offset is used to describe a method of printing in which an inked image is put onto a metal plate, then onto a rubber blanket and only then onto a paper surface. Offset printing is a sophisticated printing technology that has gained wider currency across the world and this equipment is commonly applied today. It maintains quality while producing printed materials like books, magazines, newspapers, business cards, letterheads, posters, leaflets, calendars, catalogues and such similar stuff. According to data collected from different sources, an estimated 6,500 offset printing presses are currently operating in Bangladesh, with mostly based in Dhaka. Most of the offset printing houses are located in Dhaka city's Naya Paltan, Bangla Bazar, Fakirapool, Kataban and Nilkhet neighbourhoods. As many as 300,000 people are directly involved with this vital work of printing different materials. Graphic designers are the heart of the press as they are inextricably linked with printing activities. Offset printing presses have to follow certain steps and processes to get the work done perfectly. In this skeletal but seminal study, the researcher has endeavoured with due diligence to identify the challenges and explore the prospects of the offset printing industry.

Keywords : *prospects, challenges, offset printing, printing press, graphic designer*

*Part-time Teacher, Department of Graphic Design, University of Dhaka.

1.0 INTRODUCTION

Offset printing technology is an integrated part of graphic design as different graphic design projects are executed in the offset printing industry like business card, letterhead, book, magazine, poster, leaflet, flyer, calendar and catalogue, among multiple others. Quality printing is a major and burning issue of graphic design by the people working backstage. Graphic designers can create good designs but some of them cannot produce good outputs due to a distinct lack of knowledge in materials and printing technology. Sometimes, an offset printing press cannot churn out the desired output for imperfect graphic designers. In this study paper, the

researcher has identified the prospects and challenges of the offset printing presses in Bangladesh from the viewpoint of the graphic designers.

Offset is a commonly used printing technique in which an inked image is transferred ("offset") from a plate onto a rubber blanket, then onto a printing surface. Many modern offset presses use computer-to-plate (CTP) imaging technology as opposed to the older computer-to-film work technique, which further increases their quality (Yadav et. al 2018).

2.0 OBJECTIVE OF THE RESEARCH

The primary objective of this research paper is to identify the challenges the offset printing industry faces and the prospects it has from the standpoint of the graphic designers in Bangladesh.

2.1 *Research Question*

What are the challenges and prospects of the offset printing industry from the viewpoint of the graphic designers in Bangladesh?

3.0 METHODOLOGY

This researcher has conducted the course on 'Press and Printing Process' at university level since 2015. He has visited different offset printing presses in Dhaka like Paper Studio, Annyna Printers, Barsha Printing Press, and Alvi Press and Publications. There are primarily two types of offset printing machines–sheet-fed and web press. But here, the researcher has only considered the sheet-fed offset machine for his study. This research paper has employed a mixed method of both qualitative and quantitative methods. Surveys, interviews, close observations and analysis have been conducted in this regard. There is a lack of necessary literature on this topic. Data and information have been collected from different journals, books, dissertations and relevant websites. Data and information have also been garnered from reliable sources. A survey has been conducted among the graphic designers who are associated with the offset printing industry in Bangladesh. Besides, interviews have been taken from the offset printing press owners, engineers, experts and industry insiders.

4.0 BACKGROUND OF THE RESEARCH

In the Indian subcontinent, the first printing machine in recorded history was established in Goa by the Christian missionaries. The printing machine came to Bengal in the year 1777 while the first Bengali types were introduced by Charles Wilkins. The book entitled 'A Grammar of Bengali Language' by Nathaniel Brassley Halhed

was published in 1778 as it was printed out from a private press named 'Saint Andrew's Press'. Previously, the movable types were used in various books to print out. James Augustus Hicky was such a promoter for branding that he had christened a newspaper after his name. It was 'Hicky's Bengal Gazette', the first newspaper published in Bengal as well as in India. From the middle of the 19th century to the next 50 years, the Bengali printed industry expanded a lot. The printing houses printed out different books, newspapers, different leaflets and similar stuff. (Niti 2020).

5.0 OFFSET PRINTING INDUSTRY IN BANGLADESH

In Bangladesh, computer technology was introduced in the publication trade in the year 1982 when different types of keyboard were also introduced for Bengali type composition. Technologist Saif-ud-Doha-Shahid designed Bengali typefaces for Apple Macintosh in 1984. In 1986, Mainul Islam changed the keyboard design. The first edition of Bengali typing software 'Bijoy Keyboard' was invented and patented by Mustafa Jabbar in 1988. Bijoy was thought of as a significant invention in the publication trade. Later, he developed Bengali keyboards for IBM computer also (Islam 2022 : 33; Khan 2008).

According to the Bangladesh Mudran Shilpa Samity [Printing Industries Association of Bangladesh], as many as 1,350 organisations are the members of this flagship association of printers. Another 5,000 printing organisations are working throughout the country. The annual investment in the printing industry spans between Tk 12,000 to Tk 15,000 crore, and the annual profit is around 15 percent (Roy 2020).

Such a staggering investment outlay indicates the liveliness and hectic economic activity in the printing industry. Despite all these prospects, the industry has been facing many problems. The offset printing presses need to import raw printing materials like paper, board, ink and lubricant by paying high customs duties. The overpriced printing machinery being employed in Bangladesh mostly comes from other countries. Despite huge potential, according to sources at the association, there is yet no provision of getting institutional (bank) credit for establishing printing factories (Roy 2020).

Many trade analysts, economic sages, industry experts and owners of the printing houses strongly think that Bangladesh has the potential to become the second highest foreign exchange earning sector as they see the prospects of the national economy on all indicators, including the new wave of investment in the printing business.

Hasina Newaaz, proprietor and CEO of Orchid Printers, one of the largest printing houses in Bangladesh, said, “We have the capacity to do that. There are very few countries in the world that can offer cheap products. This is something we can do. However, it will require huge capital. Here, the government has a role to play in helping set up world-class printing houses. Sixty-one percent duty on imported materials is a huge blow for the industry. The government should reduce it drastically. We are lagging behind as we have not adopted the latest technologies (Rahman 2011).”

The annual value of printing merchandise, commodities and services rendered by the printing industry of Bangladesh is around Tk 4,000 crore. Out of that, printing goods worth around Tk 160 crore are exported every year. The growth rate of this sector increases 10 percent per year (Roy 2020).

In today's offset printing industry, computer-to-plate (CTP) technology is employed sometimes. CTP technology reduces the costs and steps in offset printing technology. We can see even 8-colour printing technology in today's offset printing industry in Bangladesh. Different automated technologies are also used in different printing-related work like adding glue or book bindings (Islam 2022 : 33).

F. Tabassum et. al. conferred in a conference paper that offset printing presses in Bangladesh generate waste and air emission. It also included that offset printing presses generate a huge amount of solid and liquid wastes like empty containers, used film packages, damaged plates, developed films, test production, scrap papers, liquid waste from printing operations, lubricating oils, waste ink, clean-up solvents, photographic chemicals, acids, alkaline and different types of plate. It also showcased there that printing operations produce volatile organic compounds, emissions from the usages of cleaning solvents and inks, as well as alcohol and other wetting agents used in printing. A large offset press can be the source of Sulphur Dioxide emissions (Tabassum et. al 2017).

6.0 DEFINITION OF OFFSET PRINTING PRESS

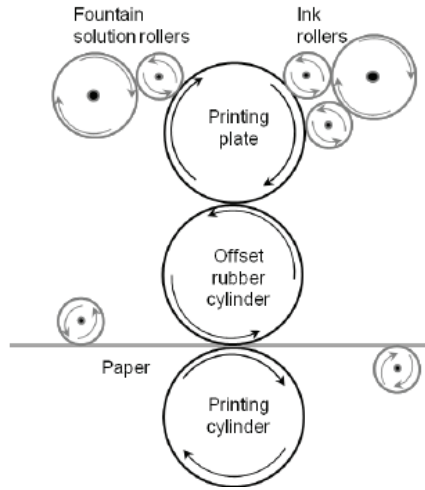

Figure : 1

Simple Diagram of Offset Printing Machine

Source : Gómez et al. (2014). "Effect of Paper Surface Properties on Coated Paper Wettability with Different Fountain Solutions". Bioresources 9(3), 4227

https : //www.researchgate.net/publication/269985163_Effect_of_Paper_Surface_Properties_on_Coated_Paper_Wettability_with_Different_Fountain_Solutions (Retrieved on August 1, 2022)

Offset printing is a method of printing commonly used for books, magazines, newspapers and alternative high-volume printing jobs. The technique requires that the image or text be burned onto a metal plate that is placed around a cylinder. In offset printing, the sections of the metal plate with no text or images are coated with a substance that prevents ink adhering. Large sections of paper are

then moved through several rollers, including the roller with the ink-coated metal plate. Each plate may contain all or part of the final printed images ("Offset Printing" 2019).

6.1 *Sheet-fed Offset Press*

In sheet-fed offset, "the printing is carried out on a single sheet of paper as they are fed to the press one at a time." Sheet-fed presses use mechanical registration to relate each sheet to one another to ensure that they are reproduced with the same imagery in the same position on every sheet running through the press (Yadav et. al 2018 : 129).

7.0 DIFFERENT STEPS OF THE OFFSET PRINTING PRESS

The offset printing process can be divided into three primary stages. Usually, the graphic designers actively participate in pre-press activities like graphic design, page make-up, form making and preparation of dummy.

7.1 *Pre-press Process*

The term 'Pre-press Process' refers to the process of creating a print layout and performing all the steps that lead to the final print project (Jacoby n.d.). This is an important stage before the final work goes to the press.

7.1.1 ***Graphic Design :*** In this initial stage, a graphic designer actively participates in this section of graphical work and he/she designs the printed materials.

7.1.2 ***Page Makeup :*** A graphic designer actively takes part in work like book design, magazine design and catalogue design. In recent years, graphic designers use different types of computer-aided programmes.

7.1.3 ***Proofreading :*** A proofreading is a very careful correction of manuscripts with full concentration of mind to avoid errors and slip-ups. A professional proofreader uses different proofreading marks to rectify the writing.

7.1.4 ***Film :*** Positive film is used in positive platemaking and conventional printing plate production. It is used as the original with the blackened sections of the film corresponding to the ink-accepting surface elements on the plate ("Negative and Positive Film" n.d.).

7.1.5 ***Plate :*** A printing plate must have the ability to transfer an image to paper, cardboard or other substrates. It is usually made from metal, plastic, rubber, paper and other materials. An image is put on a printing plate with a photochemical, photomechanical or laser-engraving process ("Offset Printing Plates" n. d).

7.2 *In Machine*

In this process, the printing machine takes prints from the plate, then transfers it into a rubber blanket and finally prints on the papers or boards.

7.3 *Post-press Process*

Post-press process covers everything that takes place after your pages have been printed on parent sheets. This is also an important stage after the final work is done.

7.3.1 ***Cutting :*** Printed materials are cut after the printing.

7.3.2 ***Binding :*** The binding of a book describes the material that is used to make the upper (front) and lower (back) covers. Books are bound in all manner of materials, including various papers, cloths, hides and even metals, to increase aesthetic appeal or durability ("Guide to understanding bindings" 2021).

7.3.3 ***Lamination :*** Lamination is also an important process as it protects the printed materials from smudging, water and dirt.

8.0 OFFSET PRINTING MATERIALS

8.1 *Paper*

Offset printing presses use different types of paper–art paper, colour paper, white printing paper, newsprint, duplex board, mount board and hardboard, among others.

8.2 *Ink*

Offset printing presses follow the CMYK (Cyan, Magenta, Yellow and Black) colour model.

Chairman of Printing Industries Association of Bangladesh Shahid Serneabat said, "There are 15,000 printing presses across the country that use ink worth Taka 2,000 crore per year. Imported ink contributes to nearly every field (Karim 2021)."

9.0 OBSERVATION AND ANALYSIS

It has been observed that Dhaka city's Naya Paltan, Purana Paltan, Bangla Bazar, Fakirapool, Kataban and Nilkhet are the hubs of offset printing houses. This researcher has witnessed that most of

the presses in Purana Paltan and Bangla Bazar are cramped, clumsy, filthy and the environment inside the presses is stuffy and unhealthy.

Most of the machines used in the printing presses in Bangladesh are imported from Germany. But Japanese machines are also being used in the printing industry here.

People were suspicious at first about the quality of the work of a Japanese machine, Hasina Newaaz said. "But introduction of a Japanese machine in the Bangladeshi market revolutionised the country's printing business (Rahman 2011)."

Most of the offset printing presses in Bangladesh have installed Heidelberg and Roland offset printing machines from Germany. On the other hand, Komori printing machines from Japan are also being used in the industry here.

It has been observed that many printing houses are using old model machines from the 1990s for a lack of skilled workforce in the industry, and a press man should work in the industry at least five years to achieve his professional attributes.

Renowned artist and graphic designer of Bangladesh Hashem Khan said, "A graphic designer should have knowledge on printing technology. A printing press was set up in the Department of Graphic Design, University of Dhaka as a part of curriculum previously. It was supervised by artist Qayyum Chowdhury and others. But the press got shut down suddenly due to the lack of human resources. But later, the field visits were conducted on different occasions so that the students can learn different printing related techniques associated with designs. Currently, the printing industry developed a lot with the advent of offset printing technology in Bangladesh (Khan 2022)."

The printing industry in Bangladesh employs an estimated 300,000 people. The people working in the industry do not have adequate formal institutional learning (Roy 2020).

An engineer of the Paper Studio stated that a person died a couple of years ago due to an industrial accident while using a paper cutting machine. Educating the workforce and awareness-building can prevent such occupational hazards and workplace accidents, and ensure safety in the industry.

Many printing-related activities like colour mixing, creasing and binding are done manually even today. It has also been noticed that child labour are randomly used as factory fodder in the industry for paper creasing, binding and other types of jobs.

It has been learned that many graphic designers did not get the desired output from the presses (Mamun 2022).

10.0 CHALLENGES

The following challenges have been identified according to the survey, observation and analysis of literature review :

- Negative impact of press inks on environment and health
- Quality of printing, paper and colours
- Lengthy process of offset printing press
- Understanding colour measurement, spot colour management and usage of water during printing
- Lack of skilled technical persons in the industry
- Fair rate charge

- Lack of modern technology
- Expenses of materials
- Lack of training institutes in Bangladesh for offset printing press
- Industrial accidents/occupational hazards
- Desired colour output for designers
- Lack of good knowledge in costing calculation
- Unhealthy working environment
- Waste generation and air emission

11.0 PROSPECTS

- Offset printing industry is growing with a substantial contribution to the national economy of Bangladesh.
- The application of new technology in the offset printing industry will help it flourish further.
- The printing industry has ample scope to become the second-largest revenue earner for Bangladesh with the cheapest labour cost in the world.

12.0 RECOMMENDATIONS

- More institutes should be set up for training.
- Press & Printing Technology Department should be established at public and private universities.
- Awareness should be grown among graphic designers.

- Training, workshop and seminar can be arranged routinely by advertising agencies, offset printing houses and academia.
- Regulatory watchdog should be more active to monitor workplace safety and environment issues.
- The billion-dollar printing sector should be declared as an industry by the government.
- A special area should be allocated to the offset printing industry.
- The government should review the import duty on printing materials.
- Industry-academia collaboration should be at play for employment and business excellence.

13.0 LIMITATIONS OF THE STUDY

The researcher has limited the study primarily among the graphic designers as the respondents of the study. For limited resources, he has opted only Dhaka city for his research area. But a countrywide big-budget study can be done in the future.

14.0 CONCLUSION

The researcher has reached an inference from the above discussion, observation and analysis that the industry is currently facing manifold challenges. From the context of the graphic designers, fair rate chart, costing calculation and desired colour output are the top challenges. Dhaka University has set up the Department of Printing & Publication Studies. What is more, there is a dedicated Government Graphic Arts Institute in Dhaka city's Mohammadpur

area which offers 'Diploma in Press & Printing Technology' Degree. Currently, degrees in graphic design are offered at different tertiary-level public-private institutions in Bangladesh, including University of Dhaka, University of Rajshahi, Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, Shanto-Mariam University of Creative Technology, and University of Development Alternative. Printing technology-related courses are also offered in the curriculum of the Department of Graphic Design at University of Dhaka. Hence, a specialised degree in press and printing should be introduced at different universities to meet the growing demand for skilled workforce in this field. To sum up, the government should also adopt multiple measures for the welfare of this booming industry. More research should be conducted on this topic.

References

"Guide to understanding bindings" 2021(Retrieved on July 17, 2022) https : //www.abebooks.com/books/rarebooks/collecting-guide/understanding-rare-books/understanding-bindings.shtml

Hossain, M. A. M. M. Hasan and M. R. Hasan, "Job attitude and adoption of Advanced Printing Technology in Modern & Outmoded printing presses in Bangladesh," 2015 Fifth International Conference on Digital Information Processing and Communications (ICDIPC), 2015, pp. 165-172, doi : 10.1109/ICDIPC.2015.7323024. (Retrieved on July 7, 2022)
https : //ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7323024?casa_token=cLP0qqBWBzAAAAAA : w1hLrBd9JqlmAiZuHcGpb0jTUFsclnn8wn-UVP1BI-5jAlGoTU3ruAMepMYihnX7368gBnaDfK4pAv0

Islam, Mohshina. 2022. “Bangla Prokashonar udob o Bikash : Oitihasik Porjalochona.” Bangla Academy Potrikka, Year : 65, Vol : 4. Dhaka : Bangla Academy.

Jacoby, Taylor , “Digital Printing” , n.d. (Retrieved on July 17, 2022) https : //soloprinting.com/blog/what-is-prepress/

Karim, Rezaul. August 27, 2022. “Tk 3,000cr ink market growing, yet mostly depends on import” The Business Standard. (Retrieved on July 15, 2022) https : //www.tbsnews.net/dropped/industry/tk3000cr-ink-market-growing-yet-mostly-depends-import-293758

Khan, Jashim Uddin. February 5, 2008. “Inventor of Bangla computer keyboard wins legal battle”, The Daily Star. (Retrieved on July 1, 2022) https : //www.thedailystar.net/news-detail-22020

“Negative & Positive Film”, n.d. (Retrieved on June 8, 2022) https : //www.graphicsproductiongroup.ca/film.html

Niti, Naznin Sultana. 2020. Lipi, Pandulipi, Boi o Mudron Shilper Itikotha. Dhaka : Pathok Samabesh.

“Offset Printing Plates”, n.d. (Retrieved on June 18, 2022) https : //offsetprintingtechnology.com/sub-categories/offset-printing-plates/

Rahman, MD Fazlur. July 13, 2011. “Printing : The Next big things for Bangladesh.” The Daily Star. (Retrieved on July 17, 2022) https : //www.thedailystar.net/news-detail-193962

Roy, Sudhangshu Sekhar. February 13, 2020. “Resilient printing industry won’t die out anytime soon”, The Business Standard. (Retrieved on July 15, 2022)
https : //www.tbsnews.net/economy/industry/resilient-printing-industry-wont-die-out-anytime-soon-44275

Tabassum, F. Q H Bari, M.M Rahman, M.M Mahmud and A R Raj, ‘Printing Press Solid Waste Recycling in Dhaka City’, Proceedings of the Waste Safe-2017- 5th International Conference on Solid Waste Management in South Asian Countries. (Retrieved on June 17, 2022)
https : //www.researchgate.net/profile/Dr-Md-Mahmudur-Rahman/publication/314256921_PRINTING_PRESS_SOLID_WASTE_RECYCLING_IN_DHAKA_CITY/links/58be310ea6fdcc2d14eb5738/PRINTING-PRESS-SOLID-WASTE-RECYCLING-IN-DHAKA-CITY.pdf

Yadav, S., Yadav, B., & Singh, R. (2018). An Overview of Sheet-fed Offset Press for Optimum Consumption of Printing Substrate. International Journal of Engineering Sciences & Research Technology, 7(2), 128-132. (Retrieved on June 18, 2022)
https : //www.academia.edu/35850880/AN_OVERVIEW_OF_SHEET_FED_OFFSET_PRESSES_FOR_OPTIMUM_CONSUMPTION_OF_PRINTING_SUBSTRATE